পরিব্রাজকের বক্তৃতা।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে সনাতন আর্য্যধর্ম্ম পুনঃ প্রচারের প্রথম
ও প্রধান প্রবর্ত্তক, ভারতের অদ্বিতীয় ধর্ম্মবক্তা

বাগ্মীবর

পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী মহোদয়

প্রদত্ত

বক্তৃতাবলী।

আনন্দমণ্ডলী-কর্ত্তৃক প্রকাশিত

কলিকাতা,

বহুবাজার, শ্রীনাথ দাসের লেন, ১১ নং ভবনস্থ
বি, কে, দাস এবং কোম্পানির যন্ত্রে
শ্রীঅমৃতলাল ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

Registered.

মূল্য ১৲ টাকা।

ওঁ

যোগেশ্বরি ত্বাং শিরসা নমামি।

মা !

বক্তৃতা তোমারই সৎকথামৃত ও পরিব্রাজক তোমারই শ্রীচরণাশ্রিত। "পরিব্রাজকের বক্তৃতা" তাই আজ তোমারই শ্রীচরণে উৎসর্গীকৃত ও সমর্পিত হইল।

সাধু ও অসাধু সকলেরই প্রতি মা কৃপা-দৃষ্টি কর।

তাহাতে তাঁহার বক্তৃতার কঙ্কাল মাত্র চিত্রিত হইয়াছে। ভারত-বিখ্যাত বক্তার মুখের মধুর ভাষা ইহাতে আদৌ ন্যস্ত হয় নাই, ভাবও অধিকাংশ স্থলে অপরিস্ফুট হইয়াছে। কিন্তু আমাদের প্রকাশিত এই "পরিব্রাজকের বক্তৃতায়" বক্তার নিজ-মুখ-বিনির্গলিত ভাষা ও ভাব যত দূর সম্ভব সংরক্ষিত হইয়াছে। পূজ্যপাদ পরিব্রাজক মহাশয়ের স্বাক্ষরিত পত্রই ইহার প্রমাণ। ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত 'বক্তৃতা' পুস্তকে "স্বামীজীর" যে যে বক্তৃতা প্রকাশিত হইয়াছে, সেগুলি বিস্তারপূর্ব্বক, এবং অন্যান্য অনেক অপ্রকাশিত বক্তৃতা এই "পরিব্রাজকের বক্তৃতা" মধ্যে প্রকাশিত হইল. ও পরে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।

"পরিব্রাজকের বক্তৃতাগুলি" যে জ্বলন্ত ও জীবন্ত উদ্দীপনাপূর্ণ, জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রণোদিত, ও ভক্তিভাব-বিনোদিত. তাহা পুস্তকের কিয়দংশ পাঠেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন। "পরিব্রাজকের বক্তৃতা" পাঠে সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেরই মনঃপ্রাণ ধর্ম্মোৎসাহে পরিপূরিত ও ভগবৎ-প্রেমে বিগলিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আশা করি বাঙ্গালী জাতি ও হিন্দু সমাজের আদরের ও গৌরবের সামগ্রী এই পুস্তক প্রত্যেক বাঙ্গালীর গৃহে ও পুস্তকালয়ে যত্নসহ সংরক্ষিত ও পঠিত হইবে।

☞ "পরিব্রাজকের বক্তৃতার" স্বত্ব, স্বামিত্ব, ও উপস্বত্ব কাশী-যোগাশ্রমে বিরাজমানা "মা যোগেশ্বরীর" ভোগ-রাগ ও সেবাদির জন্য নিবেদিত হইল। ইতি।

প্রকাশকগণ।

পরিব্রাজক মহাশয়ের পত্র।

প্রেমাস্পদ শ্রীমদ্ আনন্দমণ্ডলী-ভুক্ত ভগবদনুরক্ত ভক্তগণ

সচ্চিদানন্দ নিকেতনেষু—

ভক্তিমদ্‌বর্গ !

তোমরা "পরিব্রাজকের বক্তৃতা" প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ দেখিয়া সুখী হইলাম, এবং ইহার "স্বত্ব, স্বামিত্ব," প্রভৃতি যে মা যোগেশ্বরীর শ্রীচরণে অর্পণ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছ, ইহাতে আরও সুখী হইলাম। গৃহে বসিয়া সকলে সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মের গুহ্য রহস্য-রাশি পাঠ করিবার অবকাশ পাইবেন, তাহার ব্যবস্থায় তোমরা প্রবৃত্ত হইয়াছ দেখিয়া অধিকতর আনন্দিত হইলাম। বক্তৃতার পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিলাম আমার বক্তৃতার ভাষা ও ভাব প্রায়ই সংরক্ষিত হইয়াছে। আবশ্যক বোধে স্থানে স্থানে সংশোধন করিয়া দিলাম। সনাতন ধর্ম্মের বিমল ছটায় সকলের হৃদয় আলোকিত হউক, ইহাই ভগবৎ সমীপে প্রার্থনা। মা চিরদিন তোমাদের সৎ সঙ্কল্প সুসিদ্ধ করুন। ইতি।

কাশী-যোগাশ্রম,
তাং ২০এ জ্যৈষ্ঠ
সং ১৮১৬।

দীনাতিদীন
শ্রীকৃষ্ণানন্দ।

পরিব্রাজকের বক্তৃতা।

ভারতের মূর্চ্ছাভঙ্গ। *

যং ব্রহ্মাবরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতস্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ
ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥

আপনার কথা বিস্মৃত হইয়া, আপনার তত্ত্ব বিচার না করিয়া, আপনার কল্যাণের পথ ভুলিয়া গিয়া, যে ব্যক্তি অন্য নানা বিষয়ের পর্য্যালোচনা করে, বিবিধ বিচিত্র বিষয়ের গবেষণায় তৎপর হয়, এবং অন্যের কথা লইয়া কাল কাটায়, তাহার জন্য জীবন অনর্থক ব্যয়িত হইয়া যায়। তবে আপনার জন্য যে অন্যের বিষয় সমালোচনা করে, সে কতক পরিমাণে অবশ্যই কল্যাণ

* কলিকাতা "আলবার্ট হলে," শকাব্দা ১৮০১ পৌষ মাসে, পরিব্রাজক মহাশয় এই সু-সারময়ী বক্তৃতাটী করিয়াছিলেন। কলিকাতা রাজধানীতে এই তাঁহার প্রথম বক্তৃতা। এই বক্তৃতা শুনিবার জন্য "আলবার্ট হল" অতিশয় লোকাকীর্ণ হইয়াছিল। গৃহে স্থান না পাওয়ায় অনেকে পথে দাঁড়াইয়া ও অশ্ব-শকটের উপর বসিয়া বক্তৃতা শুনিয়া কর্ণ পবিত্র করিয়াছিলেন। বিলম্বে আসায় অনেক ভদ্র লোককে হতাশভাবে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে অধিকাংশই শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন।

লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু অন্যত্র অন্বেষণ না করিয়া নিজ নিকেতনেই যাহার সমস্ত আশা পরিপূর্ণ হইয়া থাকে, তাহার অন্যত্র যাইবার প্রয়োজন কি? তাহার পর-পদ-পরিসেবনে লাভ কি? যে আপনার গৃহে বসিয়া জীবনের অভীষ্ট-সাধনের সমস্ত উপাদান, সমস্ত সামগ্রী প্রাপ্ত হয়, তাহার অপেক্ষা ভাগ্যবান আর কে আছে? যে ভারতের উত্তর ভাগে গগনমণ্ডল ভেদ করিয়া, হৃদয়-কন্দরে অমূল্য রত্নমালা ধারণ করিয়া, নির্ম্মল নীর-প্রবাহে নদ-নদী নিঃসারিত করিয়া, হিমাচল অটলভাবে দণ্ডায়মান; যে ভারতের পূর্ব্ব পশ্চিমে মহা-রোল-কল্লোল-তরঙ্গ-ভঙ্গ-মালায় আস্ফালন পূর্ব্বক পার্ষদ-রূপে উপসাগরদ্বয় বিরাজমান; রত্নাকর মহাসাগর যে ভারতের নামে স্বয়ং নাম ধারণ করিয়াছে, ও দক্ষিণ ভাগে উত্তাল তরঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে যে ভারতের পদ প্রক্ষালন করিয়া দিতেছে; স্বাভাবিক 'শৃঙ্গারমালা' যে ভারতকে সৃষ্টির আদি কাল হইতে এ পর্য্যন্ত লোক-চিত্ত-বিনোদ-বিহার-ভূমি করিয়া রাখিয়াছে; শিক্ষা ও সভ্যতার কিরণমালা যে ভারতের মুখ-মণ্ডলকে প্রথম উজ্জ্বল ও উদ্ভাসিত করিয়াছে; শক্তি ও সামর্থ্য বলে যে ভারত জগদ্-গুরু বলিয়া ইতিহাসে অভিহিত হইয়াছে; আজ সেই ভারতবাসী আপনার তত্ত্ব ভুলিয়া, আপনার দেশ, আপনার জাতীয়তা, আপনার কুল-মান-মর্য্যা-দাকে তাচ্ছিল্য করিয়া, আপনার শিক্ষা ও দীক্ষা, আপ-নার অভ্যুদয় ও মহত্ত্ব, আপনার অতুল ঐশ্বর্য্য, আপনার

অতুল বলবীর্য্য, আপনার স্বর্গীয় ধৈর্য্য ও শৌর্য্য, আপনার তপোবীর্য্য-সম্ভূত জ্ঞান-গাম্ভীর্য্য বিস্মৃত হইয়া, পরের কথায় আপনাকে কাঙ্গাল জানিয়া, পরের কথায় আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা হীনবীর্য্য জানিয়া, পরের কথায় আপনাকে অমানুষ বোধ করিয়া, পরের কথায় আপনাকে অসভ্য ও অশিক্ষিত জ্ঞান করিয়া, পরের কথায় আপনাকে ধর্ম্মহীন, কর্ম্মহীন, বনের পশু অপেক্ষাও জ্ঞানহীন বিশ্বাস করিয়া, নিজ উন্নতির জন্য সমুদ্র-পারে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে! আপনাকে না জানিয়া হতভাগ্য ভারত আজ দুঃখের পরাকাষ্ঠার পদসেবা করিতেছে! নিজের ঘর থাকিতে বাবুই পক্ষীর ন্যায় বর্ষার ধারায় ভিজিয়া মরিতেছে! না জানি, বিধাতার কোন্ বজ্র-তাড়নায় হতচেতন হইয়া ভারত এই বিভীষিকা দেখিতেছে!

বাহ্য প্রকৃতি অন্তঃ-প্রকৃতির ধাত্রী। ত্রিগুণময়ী-প্রকৃতি-সম্ভূত দেহ ইন্দ্রিয় মনঃ প্রাণ লাভ করিয়া, মানব, যে স্থানের উপাদানে, যে স্থানের ভৌতিক প্রকৃতি-গুণে, যে স্থানের ক্ষিত্যপ্‌তেজমরুদগগনে, লালিত পালিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়, তথাকার বাহ্য প্রকৃতি তাহার শরীর ও মনকে নিজ অনুকূল করিয়া নির্ম্মাণ করে। মানব তথাকার প্রকৃতির হাব-ভাব-কটাক্ষে বশীভূত হইয়া, সেই প্রকৃতির অঞ্চল ধারণ করিয়া, তাহারই ইঙ্গিতে উঠিতে বসিতে, তাহারই ভাষায় বলিতে কহিতে, তাহারই ধারায় দেখিতে শুনিতে, তাহারই ভাবে ভাবিতে বুঝিতে, তাহারই রসে ডুবিতে মজিতে, তাহারই

তালে চলিতে ফিরিতে, তাহারই আজ্ঞায় জাগিতে শুইতে, শিক্ষা করিয়া থাকে। স্থানীয় জল বায়ু তাপাদির বিশেষ বিশেষ শক্তি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি ও প্রকৃতি সংগঠন করিয়া দেয়। পৃথিবীর হিম-প্রধান দেশে যাঁহারা জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহাদের যেমন চর্ম্ম, কেশ, ও চক্ষুরাদির বর্ণ হয়, উষ্ণ-প্রধান ভুখণ্ডজাত মানবগণের তাদৃশ বর্ণ হয় না। উভয় জাতির আকৃতি-গত বিভিন্নতা, ভাষাগত বিভিন্নতা, ভাবগত বিভিন্নতা, এ সমস্তই ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি-সম্ভূত; ইহা স্বভাবসিদ্ধ ও অনিবার্য্য। আফ্রিকাতে যেমন ফুট্-ফুটে গৌরবর্ণ একটী মানব জন্মান কঠিন, পৃথিবীর উত্তর খণ্ডে তেমনি একজন কৃষ্ণকায় মনুষ্য জন্মানও অসম্ভব। পৃথিবীর যে দেশেরই ভৌতিক প্রকৃতি বিচার করিয়া দেখি, সেই দেশেই বাহ্য প্রকৃতির এক একটী অঙ্গ বিশেষ প্রবল বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ভগবানের বিচিত্র বিহার-ভূমি ভারতবর্ষে সেরূপ দৃষ্ট হয় না। কি জানি, ভগবান কিরূপ তুলাদণ্ডে তৌল করিয়া তাঁহার অনন্ত শক্তি-রাশির অনন্ত বিকাশ-ভাণ্ডার সাম্যাবস্থায় এই ভূমিতে স্তরে স্তরে থরে থরে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। অন্যান্য দেশের কোথাও কেবল কৃষ্ণ বর্ণ, কোথাও বা কেবল গৌর বর্ণ, কপিশ বর্ণ আদির মেলা বসিয়াছে, কিন্তু ভারতে কৃষ্ণ বর্ণ, শ্যাম বর্ণ, উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণ, গৌর বর্ণ, অতি গৌর বর্ণ, অথবা পৃথিবীর কোষে যত বর্ণমালা আছে, সকল বর্ণেরই ঢেউ খেলিয়া ভারত-মহিমাকে অবর্ণনীয়

করিয়া তুলিয়াছে। ভারত যেমন সৃষ্টি-বৈচিত্রের পূর্ণ লীলা-ভূমি, এমন আর পৃথিবীতে দ্বিতীয় দেখিতে পাওয়া যায় না। উত্তুঙ্গ-শৃঙ্গ-নিকুঞ্জ-সহিত ভারতের পর্ব্বত-মালার নিকট ভূমণ্ডলের সমস্ত শৈল-শিখর মস্তক অবনত করিয়া রহিয়াছে। গন্ধপুষ্পে সুশোভিত, বিচিত্র সৌরভে আমোদিত, ভারতের কুঞ্জ-কানন-কদম্ব নাট্য-নায়িকা-বেশে ত্রিজগতের মন ভুলাইতে যেমন সক্ষম, পৃথিবীর কোন বন, উপবন তাদৃশ রূপের ছটা লইয়া তাহাদের পরিচর্য্যার আসনও গ্রহণ করিতে পারে না। ভারতের ভূভাগ যত প্রকারের উদ্ভিদ ও শস্য প্রসব করিতে সমর্থ, পৃথিবীর কোন একটী এমন দেশ পাওয়া যায় না, যে তাহার প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হয়। অতি শীতে পৃথিবীর কত দেশ চির দিন থর থর কাঁপিতেছে, অতি তাপের জ্বালা-মালায় কত দেশ বিদগ্ধ হইয়া যাইতেছে; কিন্তু ভারতের বিচিত্র প্রকৃতিতে সকল ঋতুই—গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, ও বসন্ত, সখ্য-ভাবে সকলে হাত ধরাধরি করিয়া নিয়ম পূর্ব্বক যথা সময়ে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে। এ দেশ সকল দেশের আদর্শ-ভূমি; অথবা ভারত ক্ষেত্রকে লোক-নিবাসের পূর্ণ আদর্শ-স্থল বলিলেও হয়। যদি মরুভূমির বিকট লীলা দেখিতে ইচ্ছা হয়, তবে বিকানীর দেশে হিঙ্গলাজের পথে গমন কর; যদি ইউরোপীয় সদা জলকণাসিক্ত শীত বাত-প্রবাহে বিহার করিতে সাধ হয়, তবে আসাম, চিরাপুঞ্জী প্রভৃতিতে চলিয়া যাও; যদি শিশির উপভোগে বিলাত-বাসের বাসনা মিটাইতে চাও, তবে

দার্জ্জিলিং, শিমলা, নৈনিতাল প্রভৃতি শৈল-শিখরে আরোহণ কর; যদি স্বভাবের আমোদময়ী শোভা দেখিতে সাধ হয়, তবে কাংড়া উপত্যকা, কাশ্মীর উপত্যকা প্রভৃতিতে বিচরণ কর; যদি জলে জলে সর্ব্বদা নৌকাপথে বেড়াইতে হয়, তবে পূর্ব্ব বঙ্গে গমন কর; যদি স্থলে ও শৈলে বেড়াইতে আকাঙ্ক্ষা হয়, তবে পঞ্জাব সীমায় অগ্রসর হও; যদি শীত-বস্ত্র আদৌ ব্যবহার করিতে ইচ্ছা না হয়, তবে মাদ্রাজ বিভাগে বাস কর। ভারত-প্রকৃতির শিল্প-শালায় তুমি যাহা চাহিবে, তাহাই পাইবে। একই স্থানে বসিয়া যদি পৃথিবীর সকল স্থানের শোভা সমৃদ্ধি সুখ সম্ভোগ করিতে হয়, তবে এক ভারতে বসিয়াই তাঁহা ভোগ করিয়া লও। সকল রসই ভারত-প্রকৃতির পদ সেবা করিয়া ঝির ঝির ধীর ধীর ধারায় বহিয়া যাইতেছে। যিনি যে সুরসের রসিক হউন না কেন, ভারতের বিচিত্র রসময়ী প্রকৃতি তাঁহার সাধ মিটাইতে সমর্থ। সভ্য মহোদয়গণ! জন্মাবধি এক জন যদি ধূলি-ধূসরিত অনুর্ব্বরা ক্ষেত্রে রক্ষিত ও অতি বাতাতপ-বিশিষ্ট দেশে লালিত পালিত হয়; আর এক জন যদি চারি দিকে পুষ্পিত উপবন-পরিশোভিত, মৃদু-মধুর-বিহঙ্গ-সঙ্গীত-পরিপূরিত, সুগন্ধি ধীর সমীর-প্রবাহিত, সুললিত ঝর ঝর নির্ঝর-নিনাদে আকুলিত, দিব্য সুরম্য দেশে নিবাস করিতে থাকে; তবে এ দুই ব্যক্তির প্রকৃতি কি সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইবে না? এক জন জড়-প্রকৃতি, উগ্র-স্বভাব, অশান্ত-চিত্ত, স্থূল-বুদ্ধি, অপরিণামদর্শী, চরিত্র-বিহীন, এবং রুক্ষ-স্বভাব হইবে। আর

এক জন ভাবোচ্ছ্বাসময়ী, কবিতাশক্তি-বিশিষ্ট, ধীর-গম্ভীর-প্রকৃতি, উল্লাস ও উদ্যমযুক্ত, নবানুরাগে সদা প্রমোদিত, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শক্তি-রাজ্যের গুপ্ত গৃহে প্রবেশক্ষম, প্রসন্নচেতা, বিচিত্র রচনাবলীর অদৃশ্য রচয়িতার তত্ত্বানুসন্ধিৎসু হইবে। ভারতবর্ষের প্রকৃতিই প্রথম হইতেই ভারতে মহাকবি, ধর্ম্ম-পরায়ণ, জ্ঞান-বিজ্ঞান-বেত্তা, যোগী, ও মননশীল মহাপুরুষ-দিগকে প্রসব করিয়াছে। যেরূপ ক্ষেত্র, সেইরূপ বীজই অঙ্কুরিত হইয়াছে। ভারতের প্রকৃতির ছটা ভারতনিবাসীকে অন্য দেশবাসী অপেক্ষা অধিক বিচিত্রতাময়ী সজ্জায় সুশোভিত করিয়াছে। সকল বিষয়েরই আদিম তত্ত্বের মূল-বীজ ভারতেই বিস্ফুরিত হইয়াছে। ভারতনিবাসীই আদিম মনুষ্য, আদিম শিক্ষিত, আদিম সভ্য, আদিম কবি, আদিম বিজ্ঞানবিদ্, আদিম ধার্ম্মিক, আদিম জ্ঞানী, আদিম যোগী, আদিম মননশীল, এবং আদিম ভগবদ্-ভক্ত। আদিম শাস্ত্র, আদিম ভাষা, ভারতবর্ষেই প্রথম সুপ্রচারিত হয়।

পৃথিবীতে আল্পস্, অণ্টাই প্রভৃতি প্রোত্তুঙ্গ-শৃঙ্গ-রাশি-যুক্ত বিশাল পর্ব্বতমালা বিদ্যমান আছে সত্য; ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি শ্বাপদ-সমূহ তথায় বিচরণ করিয়া থাকে সত্য; কিন্তু হিমগিরির ন্যায়, বিন্ধ্যাচলের ন্যায়, এমন শৈল কোথায় দেখিয়াছ, যাহার গুহায় গুহায়, কন্দরে কন্দরে, ভগবদ্ভাব-সাগরে ডুবিয়া তেজঃপুঞ্জ-কলেবর ধ্যান-স্তিমিত-নেত্র মহাযোগীগণ নিবাস করিয়া থাকেন? সকল দেশেই বন, উপবন, মহারণ্য প্রভৃতি আছে; কিন্তু কোন্ দেশের, কোন্ বনের তরুতলে নিবাস করিয়া হিংস্র জীবগণের

বিষম আক্রমণকে তুচ্ছ ও উপেক্ষা করিয়া নির্ভীক হৃদয়ে পিঙ্গল-জটামণ্ডল-মণ্ডিত শীতাতপ-সহনশীল মহাযোগী, মহামুনি, মহর্ষি-মণ্ডলী কঠোর তপস্যায় নিরত রহিয়াছেন? কোন্ বনের পর্ণ-কুটীরে বসিয়া ঋষিগণ দর্শন, পুরাণ আদি অশেষ শাস্ত্ররাশি প্রণয়ন করিয়া লোক-জগতের হৃদয়-দ্বার উদ্ঘাটন করিবার যন্ত্রমন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন? কোন্ বন এমন দেখিয়াছ, যে বনের নিবাসী উদাসী ঋষিগণের বাক্-প্রতাপে বীর ধুরন্ধর অতুল সম্পত্তিশালী রাজন্যবর্গ প্রজাপুঞ্জ-সহিত নিয়মিত ও সুশাসিত হইয়াছেন? নদ নদী তো অনেক দেখিয়াছ, যেখানে হাঙ্গর, কুম্ভীর, নক্র, মীন, কূর্ম্মের অপ্রতুল নাই; এমন প্রবাহিণী অনেক দেখিয়াছ, যাহার বক্ষ বিদারণ পূর্ব্বক দ্রুতবেগবাহী জলযান নিজ বিশাল গর্ভে বহু বাণিজ্য-সামগ্রী লইয়া কত দেশকে ধন-সম্পত্তিশালী করিয়াছে; টেমস্, টাইগ্রীস্, ইউফ্রেটীস্, আমেজন আদি অনেক নদীর তো নাম শুনিয়াছ; কিন্তু গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র আদির ন্যায়, এমন পবিত্র নদী ও নদের নাম কি কখন শুনিয়াছ, যাহার তটে তটে, ঘাটে ঘাটে, ও সন্নিকটে বসিয়া তপস্তেজপূর্ণ মুনিগণ তপস্যা করিতেন, এবং ভূদেব ব্রাহ্মণগণ উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত স্বরে গগনমণ্ডল বিকম্পিত করিয়া ব্রহ্মবাণী বেদধ্বনি করিতেন? এমন নদী নদ কি কাহারও দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, যাহার তরঙ্গমালা, ভক্তগণকর্ত্তৃক ভগবচ্চরণে প্রদত্ত সচন্দন কুসুমরাশি মস্তকে ধারণ করিয়া, নৃত্য করিতে করিতে, মহাসাগরের অভিমুখে ধাবিত হইতেছে? ভারতের জল, ভারতের

দল, ভারতের পুষ্প, ভারতের ধূলি, বলিতে কি, ভারতের প্রকৃতির সকল পদার্থই যেন বিশ্ব-রচয়িতার নির্ম্মল চরণ স্পর্শ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। ভারতের জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, ভারতের হৃদয়-দেবতাকে সেবা করিবার জন্য ভারত-নিবাসীকে আশ্রয় করিয়া আছে। ভারতের ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এতৎ কালত্রয় ভারতের হৃদয়-দেবতার অশেষ গুণগানে অতিবাহিত হইবার জন্য নৃত্য করিতেছে। আজ সেই ভারতের জ্বলন্ত জীবনী-শক্তি, জানি না, কাহার প্রচণ্ড বজ্র-তাড়নায় ভীত, চকিত, চমকিত, ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে!

যে যে অনুকূল হেতু বিদ্যমান থাকিলে দেশের সৌভাগ্য-শ্রী সম্বর্দ্ধিত হয়, ভারতবর্ষে তাহার কিছুই অপ্রতুল ছিল না। জগন্মাতা অনাদ্যা প্রকৃতি যাহার অনুকূল, তাহার আবার অভাব কিসের? সর্ব্বার্থ-সম্পাদিকা প্রকৃতির ভারতবর্ষের প্রতি বিশেষ সদয় দৃষ্টিপাতের কথা স্বীকার করিতে আধুনিক সভ্যতালোকে অঙ্গীভূত অনেকেই প্রস্তুত হইবেন না। হয় তো তাঁহারা বলিবেন, সর্ব্বত্র সমদর্শী পরমেশ্বর কি কোন দেশ ভাল, কোন দেশ মন্দ, করিতে পারেন? তিনি কি কখন কাহাকে শ্রেষ্ঠ বা কাহাকেও অশ্রেষ্ঠ করিয়া থাকেন? তাঁহাতে বৈষম্য-দৃষ্টি আদৌ নাই। তিনি কি কোন প্রকার পক্ষপাত করিতে পারেন? সভ্য মহোদয়গণ! এই আপাত-মনোহর কথাগুলি চিন্তাশীল-মস্তিষ্ক-প্রসূত নহে। ভগবানের রাজ্যে বৈষম্য নাই সত্য, কিন্তু বিচিত্রতা আছে। তাঁহার সৃষ্টি-কৌশলে বিরুদ্ধতা নাই

সত্য, কিন্তু বিভিন্নতা আছে। তিনি অপক্ষপাতী সম-দর্শী বলিয়া কি, তৃণ ও বটবৃক্ষে সমত্ব বিধান করিতে হইবে? তিনি অপক্ষপাতী বলিয়া কি, মশক ও হস্তীতে একাকার ধারণ করিবে? খদ্যোত ও সূর্য্যের দীপ্তি-বিকাশে অতুল তারতম্য দেখিয়া মনে করিব কি, তিনি পক্ষপাতী? বল্মীক ও হিমালয়ে বৈসাদৃশ্য আছে বলিয়া কি, তিনি পক্ষপাতী হইবেন? তাঁহাকে পক্ষপাতী বল, চাই তাঁহাকে বৈষম্যদর্শী বল, চাই তুমি বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার প্রতি শত শত দোষারোপ কর, তথাচ আমি নির্ভীক হৃদয়ে বলিব, অতি সাহসে নির্ভর করিয়া বলিব, উল্লাস ও উৎসাহে উন্মত্ত হইয়া বলিব, প্রকৃতির প্রত্যক্ষ ব্যাপার দর্শন করিয়া, বৃথা ভ্রমের স্তর উল্লঙ্ঘন করিয়া, আমি বলিব, যেমন লক্ষ লক্ষ মানবীর মধ্যে দুই একজনই সম্রাজ্ঞী হইয়া থাকেন, তেমনি মর্ত্ত্যমণ্ডলে ভারত-ভূমি সর্ব্বাপেক্ষা সৌভাগ্য-শালিনী অনন্ত-শক্তিময়ী বিশুদ্ধা প্রকৃতির ক্রোড়ে লালিত হইয়া উন্নতি ও মহত্ত্বের প্রসূতি হইয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয়াধ্যায়ে লিখিত আছে :—

"গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি
ধন্যাস্তু তে ভারতভূমিভাগে।
স্বর্গাপবর্গাস্পদমার্গভূতে
ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরত্বাৎ॥"

স্বর্গের দেবত্ব অপেক্ষাও ভারতে মনুষ্য-দেহ লাভ করা শ্রেয়ঃ; কেন না, সুকৃতিগণই এইখানে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বর্গাপবর্গ লাভ করিয়া থাকেন।

ধনসম্পত্তি ব্যতীত সমাজের বল-বৃদ্ধি হয় না। পৃথিবী শস্যশালিনী না হইলে এই ধনসম্পত্তিও সুগম ও সুলভ হয় না। জগৎ-প্রসূতি প্রকৃতির কৃপায় ভারতের অধিকাংশ স্থলই স্বভাবতঃ উর্ব্বরা। অন্য দেশে বহু পরিশ্রম করিয়া, বিশেষরূপ যত্ন করিয়া, যে ফললাভ হইয়া থাকে, সামান্য যত্ন করিলেই, ভূমির প্রকৃতি-গুণে ভারতবাসীগণ সেই ফললাভ করিয়া থাকেন। ভারতের প্রচুর শস্য-উৎপাদন জন্যই ভারতবর্ষবাসী নিশ্চিন্ত চিত্তে নিজ নিকেতনে বসিয়া সমস্ত প্রকার উন্নতির পথ পরিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন। সাগর, উপসাগর, মহাসাগর পার হইয়া দূরদেশবর্ত্তী বণিকগণ তত্তদ্দেশজাত সামগ্রী লইয়া ভারতজাত শস্যাদির বিনিময়ে বাণিজ্য করিতে আসিতেন। ভারতবাসীগণ ঘরে বসিয়া সকল দেশের সকল সামগ্রীই পাইতেন। প্রকৃতিগত বুদ্ধির বিচক্ষণতার জন্য ভারতবাসীর চিন্তাশীল মস্তিষ্ক হইতে নানাবিধ শিল্প-নৈপুণ্যও প্রকাশিত হইয়াছিল; ইহাও বিপুল ধনাগমের উৎকৃষ্ট উপায়। তাহা ছাড়া ভারতভূমির অভ্যন্তরবর্ত্তী খনিরাশি হইতে লৌহ, স্বর্ণ, মণি, মাণিক্য প্রভৃতি, এবং ভারতের নিকটবর্ত্তী সমুদ্রগর্ভে বহুমূল্য মতি মুক্তা উৎপন্ন হওয়ায়, ভারতবর্ষ অতুল ঐশ্বর্য্যের অদ্বিতীয় ভাণ্ডার হইয়াছিল। ভারতের ঐশ্বর্য্য-গৌরবের সৌরভ পাইয়াই দিগ্দেশের ধন-লোলুপ বীরাঙ্গনা ও বীরবর্গের চিত্ত অনেক সময়েই ভারতের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। মহারাজ্ঞী সেমিরামিস্ ভারতের ঐশ্বর্য্যস্তূপ স্পর্শ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।

মহাপ্রতাপী সাইরস্ ও ডেরায়স্ ঐশ্বর্য্যলোভে উন্মত্ত হইয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। মহাবীর আলেক্‌জাণ্ডারেরও চিত্ত ভারতীয় ধনে আকৃষ্ট হইয়া দল বল সহিত তাঁহাকে ভারতে আনিয়াছিল। জঙ্গিস্, তৈমুর আদি সুপ্রসিদ্ধ বীর-কেশরীগণ ভারতের ধন-হরণার্থে ভারতে না আসিয়া থাকিতে পারেন নাই। এইরূপ যবন ও ম্লেচ্ছ বীরবর্গের মনে যখনই ধনপিপাসার বৃদ্ধি হইয়াছে, তখনই বারংবার ভারতবর্ষের ধন-কোষ তাঁহাদের দুর্নিবার্য্য তৃষ্ণার শান্তি করিয়াছে। পৃথি-বীতে এমন পরাক্রান্ত বীর অল্পই জন্মিয়াছেন, যিনি ধনলোভে ভারতের চরণ চুম্বন না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিয়াছেন। পৃথিবীর যে কোন রাজ-কোষের ভিতর প্রবেশ করিবে, সেই-খানেই দেখিতে পাইবে, ভারতীয় মণি মাণিক্য, ভারতীয় স্বর্ণ রৌপ্য, সেই রাজ-কোষ অলঙ্কৃত করিয়াছে। পুরাতন মিশর, পুরাতন ফিনিষিয়া, পুরাতন গ্রীস্, পুরাতন আরব, ভারতে বাণিজ্য করিয়াই বিপুল বিভব উপার্জ্জন করিয়াছিল।

সুরুচি ও বিচিত্রতার বুদ্ধি যখন নির্ম্মল ও সূক্ষ্ম হয়, সেই সময়েই শিল্প-নৈপুণ্যের বিশেষ বিকাশ হইয়া থাকে। কাহারও আদর্শ না দেখিয়া, কাহারও কাছে না শিখিয়া, ভারত-বাসীগণ শিল্পবিদ্যার যেরূপ উন্নতি করিয়াছিলেন, সেরূপ অন্য কোন দেশে দেখিতে পাওয়া যায় না। যাঁহারা অযোধ্যা-নগরীর বর্ণনা, মথুরাপুরীর শোভা সজ্জা, ইন্দ্রপ্রস্থের রাজ-সভা প্রভৃতির নির্ম্মাণ-কৌশলের কথা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা ভারতীয় স্থাপত্য ও কারুকার্য্যের প্রশংসা শত মুখে না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। বৌদ্ধ-শাসন কালেও

অজন্ত, কর্লি, ইলোরা, এলিফেন্টা আদির শিল্প-কীর্ত্তি-কলাপ এখনও ভারতের প্রাচীন পারদর্শীতা ও ক্ষমতার পরিচয় দিতেছে। আমাদের দুর্ভাগ্যদোষে আমাদের লক্ষ্মী-শ্রী লুক্কায়িত হইতেছে বলিয়া, প্রাচীন ভারতবাসীগণকেও অনেকে অসভ্য ও অশিক্ষিত বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকে; ইহা অল্প দুঃখের কথা নহে!

চিত্র-বিদ্যাতেও ভারতের সামান্য নিপুণতা ছিলনা। জনক-দুহিতা সীতার বিবাহ-সভার চিত্রখানি যখন শ্রীরাম-চন্দ্রের রাজসভায় আনিত হইয়াছিল, তখন সভাস্থ ও অন্তঃপুরস্থ সকলে সকলের অবিকল চিত্র দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। বারংবার রাজ্যবিপ্লবে চিত্র-বিদ্যার চিহ্ন মাত্র এখন আর দৃষ্ট হয় না।

সামরিক বিদ্যাতে প্রাচীন ভারতবর্ষ বর্ত্তমান সভ্যতা-ভিমানী সকল জাতি অপেক্ষা উন্নতি লাভ করিয়াছিল। পদা-তিক, অশ্বারোহী, রথী, ও হস্তীপৃষ্ঠে যোদ্ধৃবর্গ যথানিয়মে অপূর্ব্ব যুদ্ধ-কৌশল প্রদর্শন করিতেন। তখনকার ব্যূহ রচনার সঙ্কেত বর্ত্তমান ব্যূহনির্ম্মাণ-কৌশল অপেক্ষা অতি উৎকৃষ্ট ছিল। অনেকের সংস্কার এই যে, প্রাচীন ভারতীয় বীরবর্গ শর শরাসন মাত্র, অথবা অসিচর্ম্ম, খড়্গ গদা, আদি লইয়াই যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন; কিন্তু এখনকার ন্যায়, তোপ ও বন্দুকের নিকট তাঁহাদিগের যুদ্ধবিদ্যা লজ্জা পাইয়া থাকে। যাঁহারা রামায়ণ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা এরূপ ভ্রমে পতিত হয়েন না। রাম-রাবণের মহাসংগ্রামে শ্রীরামচন্দ্রের পক্ষ হইতে যে সকল অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তন্মধ্যে তোপেরও

বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। তখন তোপের নাম ছিল শতঘ্নী, অর্থাৎ যাহা দ্বারা বহুলোক একবারে নিহত হয়, এবং গোলার নাম ছিল গুড়ক ; যথা ঃ—

"পরিগৃহ্য শতঘ্নীশ্চ সচক্রাঃ সগুড়োপলাঃ।
চিক্ষিপুর্ভুজবেগেন লঙ্কামধ্যে মহাস্বনাঃ॥"

চক্রযুক্ত গোলাপূরিত শতঘ্নী গ্রহণ করিয়া ভুজবেগে নিক্ষেপ করিলেন, উহা বিষম নিনাদে লঙ্কামধ্যে চলিয়া গেল। যখন ইঞ্জিনিয়ার সার্ আর্থার কট্‌লি সাহেবের তত্ত্বাবধানে পশ্চিমোত্তর প্রদেশে গঙ্গা-খাত (Ganges-canal) খনন করা হইতেছিল, তখন একটী প্রাচীন ভগ্নাবশেষ নগরের (কট্‌লি সাহেব অনুমান করিয়াছিলেন প্রাচীন হস্তিনাপুর) ১৭ ফিট্ ভূমির নিম্নে অনেক গুলি ধাতু-নির্ম্মিত ও প্রস্তর-নির্ম্মিত সামগ্রী পাওয়া গিয়াছিল, তন্মধ্যে একটী সামগ্রী ঠিক একটী ছোট কামানের ন্যায় ছিল। বারুদের নাম ছিল ঊর্ব্বাগ্নি, ইহা ঊর্ব্বনামা ঋষিকর্ত্তৃক আবিষ্কৃত। কৃষ্ণ ও শল্যের যুদ্ধ-বর্ণন কালে নীতিচিন্তামণিতে লিখিত আছে ঃ—

"ঊর্ব্বাগ্নিং প্রোথিতং কৃত্বা শতঘ্নীগুড়কৈর্বৃতং।"

অর্থাৎ এই যুদ্ধে ঊর্ব্বাগ্নি (বারুদ), গুড়ক (গোলা) প্রোথিত ও পূর্ণ করিয়া শতঘ্নী ব্যবহার করা হইয়াছিল। এই সকল নিদর্শন দেখিয়া, সভ্য মহোদয়গণ! কেমন করিয়া বলিব, প্রাচীন ভারতে বর্ত্তমান যুদ্ধ-বিদ্যার পূর্ব্ব বিকাশ হয় নাই? তাঁহাদিগের বিমানারোহণে গতি, রৌদ্রবান, অগ্নিবাণ, বরুণবান, শক্তিশেল প্রভৃতির কথা স্মরণ করিয়া যদি তাঁহাদিগকে বর্ত্তমান যুদ্ধার্থিবর্গের নিম্ন শ্রেণী-ভুক্ত করা হয়,

তাহা হইলে আমাদিগের ন্যায় কাপুরুষ, কপট, কৃতঘ্ন কে আছে?

জ্যোতির্বিদ্যায় ভারতবর্ষবাসীবর্গ যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, ততদূর অগ্রসর হইতে বর্ত্তমান সভ্য জগতের এখনও অনেক বিলম্ব আছে। জ্যোতিঃশাস্ত্রের আচার্য্যবর্গের মধ্যে কে পূর্ব্ববর্ত্তী, কে পরবর্ত্তী, অনুসন্ধিৎসুবর্গের মধ্যে তাহার ঐকমত্য দেখিতে পাওয়া যায়না। কাহারও মতে পরাশর, কাহারও মতে সূর্য্যসিদ্ধান্ত, কাহারও মতে ব্রহ্মসিদ্ধান্ত, প্রথম জন্মগ্রহণ করিয়া জ্যোতির্ম্মণ্ডলের গভীর তত্ত্ব-সমূহ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। শম্ভুপ্রকাশ গ্রন্থের মতে প্রথমে সোমসিদ্ধান্ত, তৎপরে সূর্য্যসিদ্ধান্ত, ও তদনন্তর বরাহ-মিহির, জ্যোতির্ব্বিদ্ মণ্ডলীর কুল আলোকিত করিয়া, ভারতের অশেষ গৌরব-বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ৫০০ খ্রীষ্টাব্দে আর্য্যভট্ট, এবং ১১১৪ খ্রীঃ অব্দে ভাস্করাচার্য্য, ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান কালে রাজকীয় সাহায্য লইয়া কত কত জ্যোতির্বেত্তা চারুচিকণ যন্ত্রমণ্ডল সহ চন্দ্রসূর্য্য, নক্ষত্রাদির গতিবিধি আবিষ্কার করিবার জন্য যত্ন করিতেছেন। কিন্তু ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদগ্রগণ্য আচার্য্যগণ সম্রাটের সাহায্য না পাইলেও, নিজ নিজ মার্জ্জিত মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম বুদ্ধি-বিচার-শক্তির সাহচর্য্যে দূরাদ্দূরতর গগনমণ্ডল-মধ্যচারী গ্রহ নক্ষত্রবৃত্তাদির যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, এখনও তত্তাবৎ কপিশকেশাবৃত মস্তক মধ্যে প্রতিভাত হইতে অনেক বিলম্ব আছে। সুমেরু-কুমেরু, চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণ, নক্ষত্রবৃত্ত, রাশিচক্র, জোয়ার-ভাটাদির তত্ত্বনিরূপণ করিবার প্রযত্ন করিয়া

ভারতীয় আর্য্যজাতি প্রথমতঃ সিদ্ধমনোরথ হইয়াছিলেন জোয়ার-ভাটা সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে এইরূপ উক্ত হইয়াছে ঃ—

"স্থালীস্থমগ্নিসংযোগাৎ দদ্রেকি সলিলং যথা।
তথেন্দু বৃদ্ধৌ সলিলমম্ভোধৌ মুনি সত্তমাঃ॥
নন্যূনা নাতিরিক্তাশ্চ বর্দ্ধন্ত্যাপো হ্রসন্তিচ।
উদয়াস্ত মনেষ্বিন্দো পক্ষয়ো শুক্ল কৃষ্ণয়ো॥
দশোত্তরাণি পঞ্চৈব অঙ্গুলাণাং শতানি বৈ। *
অপাং বৃদ্ধিক্ষয়ৌ দৃষ্টো সামুদ্রিনাং মহামুনেঃ॥"

জোয়ার-ভাটায় বস্তুতঃ সমুদ্রের জলের বৃদ্ধি ও হ্রাস হয় না। হাঁড়িতে জল চড়াইয়া সরা ঢাকা দিয়া অগ্নিতাপ দিলে জল যেমন ফাঁপিয়া উপরের দিকে উঠে, সেইরূপ শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষে চন্দ্রের কলার বৃদ্ধি ও হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র-জলের বৃদ্ধি ও হ্রাস বোধ হইয়া থাকে।

বার-তিথির ব্যবস্থাচক্র তাঁহারাই প্রথম আবিষ্কার করেন। রবি (Sun), সোম (Moon), মঙ্গল (Mars), বুধ (Mercury), বৃহস্পতি (Jupiter), শুক্র (Venus), শনি (Saturn), আদির বিষয় শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া আর্য্য জাতিই প্রথম লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। যে দিন, দিন রাত্রি সমান হয়, তাহা টলেমি (Ptolemy) জন্মিবার বহুদিন পূর্ব্বে আর্য্যজ্যোতির্ব্বিদ্ মহাত্মাগণ নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। কেপার্নিকস (Copernicus) আসিয়া পৃথিবীর দৈনিক গতি আবিষ্কার পূর্ব্বক যখন জ্যোতির্ব্বিদ্ মণ্ডলী মধ্যে প্রতিপত্তি লাভ করিলেন, তাহার বহুদিন পূর্ব্বে আর্য্য-জাতি এ কথার নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন।

* ৫১০ অঙ্গুলি অথবা 21¼ cubits.

অনেকের এইরূপ ধারণা আছে যে, প্রাচীন আর্য্যজাতি পৃথিবীকে ত্রিকোণ বলিয়া জানিতেন। আজ ইংরাজ জাতির কৃপাতেই আমরা পৃথিবীকে কমলালেবুর ন্যায় গোলাকার জানিয়াছি। কিন্তু ভারতে বিলাতী আলোক আসিবার বহুদিন পূর্ব্বে সূর্য্যসিদ্ধান্ত বলিয়া গিয়াছেন ঃ—

"সর্ব্বতঃ পর্ব্বতারামগ্রামচৈত্যচয়ৈশ্চিতঃ।
কদম্বকেশরগ্রন্থিকেশরঃ প্রসবৈরিব॥"

কদম্ব যেমন কেশর-সমূহে পরিবেষ্টিত, সেইরূপ পৃথিবী-পিণ্ড সর্ব্বদিকেই গ্রাম, বৃক্ষ, পর্ব্বত, নদনদী, সমুদ্র আদির দ্বারা বেষ্টিত। কমলালেবুর দৃষ্টান্ত অপেক্ষা কি, কেশর-বেষ্টিত কদম্বের দৃষ্টান্তটী ভুগোলত্বের অধিক পরিচায়ক নহে? নক্ষত্রকল্পে লিখিত আছে ঃ—

"কপিত্থফলবদ্বিশ্বং দক্ষিণোত্তরয়োঃ সমং।"

পৃথিবী কপিত্থফলের ন্যায় গোলাকার এবং উত্তর দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা। এই ভূগোলতত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্য আজ কাল যে গোলক (globe) নিদর্শন দ্বারা বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাও প্রাচীন আর্য্যপদ্ধতির অনুকরণ মাত্র। আচার্য্য সূর্য্যসিদ্ধান্ত পদার্থদীপিকাতে লিখিয়াছেন ঃ—

"অভীষ্টং পৃথিবীগোলং কারয়িত্বা তু দারবং।
তদ্বং খগোলকং কৃত্বা গুরুঃ শিষ্যান্ প্রবোধয়েৎ॥"

দারুময় ভূগোল ও খগোল রচনা করিয়া গুরু শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিবেন।

পৃথিবীর যে গতি আছে, অনভিজ্ঞ আমরা, তাহাই ইংরাজদিগের নিকট শিখিয়াছি বলিয়া, আবার গৌরব করিয়া থাকি; কিন্তু রাজা বিক্রমাদিত্যের জীবিত সময়ের

পূর্ব্বে, গ্রীস্‌দেশীয় পণ্ডিত পিথাগোরাসের বহু পূর্ব্বে, ইটালিদেশীয় পণ্ডিত কোপর্নিকসের বুদ্ধি-বিকাশের অতি পূর্ব্বে আর্য্যভট্ট বলিয়া গিয়াছেন :—

"চলা পৃথ্বী স্থিরা ভাতি।

পৃথিবী চলিতেছে, কিন্তু বোধ হইতেছে যেন, স্থির রহিয়াছে।

"ভপঞ্জর স্থিরো ভূরেবাবৃত্ত্যাবৃত্ত প্রতি দৈবসিকৌ।
উদয়াস্তময়ৌ সম্পাদয়তি নক্ষত্রগ্রহাণাম্‌॥"

ভপঞ্জর অর্থাৎ নক্ষত্রমণ্ডল-রাশিচক্র স্থির রহিয়াছে, পৃথিবী বারংবার আবৃত্তি বা পরিভ্রমণ দ্বারা গ্রহ ও নক্ষত্রদিগের প্রাত্যহিক উদয়াস্ত সম্পাদন করিতেছে। বস্তুতঃ আর্য্যভট্টের সিদ্ধান্তবারিনির্ঝর গ্রীস্‌ দেশের ভিতর দিয়া অন্তর্ধারায় প্রবাহিত হইয়া বিলাতে দেখা দিয়াছে। পৃথিবীর গতি-সম্বন্ধীয় মত সুসিদ্ধ কি অসিদ্ধ, তাহা আমরা বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইব না। মহামহোপাধ্যায় সূর্য্যসিদ্ধান্ত, লল্ল, শ্রীপতি প্রভৃতি আচার্য্যগণ কিন্তু এ মতের প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন।

এই গতি-বিচার দিয়া সূর্য্যের উদয়াস্ত সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন দেশে যে সময়ের তারতম্য হইয়া থাকে, তাহাও আমরা ইংরাজীতে শিখিবার পূর্ব্বে সিদ্ধান্তশিরোমণির গোলাধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে ; যথা :—

"লঙ্কাপুরেঽর্কস্য যদোদয়ঃ স্যাৎ
তদা দিনার্দ্ধং যমকোটিপুর্য্যাং।
অধস্তদা সিদ্ধপুরেঽস্তকালঃ
স্যাদ্রোমকে রাত্রিদলং তদৈব॥"

লঙ্কায় যখন সূর্য্যের উদয় হয়, তখন যমকোটিপুরীতে দ্বিপ্রহর বেলা, লঙ্কার অধোভাগে সিদ্ধপুরে সূর্য্যের অস্তকাল, ও রোমদেশে রাত্রি।

"ভদ্রাশ্বোপরিগঃ সূর্য্যো ভারতেঽভ্যোদয়ং রবেঃ।
রাত্র্যর্দ্ধং কেতুমালাখ্যে কুরবেঽস্তমনং তদা॥"

সূর্য্য যখন ভদ্রাশ্ববর্ষে উর্দ্ধস্থ হন, তখন ভারতবর্ষে উদয়-কাল মাত্র আরম্ভ হয়; কেতুমালবর্ষে যখন অর্দ্ধ রাত্রি, কুরুবর্ষে তখন সূর্য্য অস্তমিত হন।

শাস্ত্রানভিজ্ঞ অনেক ব্যক্তিই বলিয়া থাকেন যে, সর্পের মাথার উপর পৃথিবী অবস্থিতি করিতেছে, ইহাই আর্য্য-জাতির চির দিনের ধারণা। পৃথিবী যে শূন্য মণ্ডলে আছে, ইহা আমরা ইংরাজী শিক্ষার কৃপায় জানিতে পারিয়াছি। আর্য্যশাস্ত্র পাঠ করিলে এই ভ্রম কুসংস্কার বিদূরিত হইবে। সূর্য্যসিদ্ধান্ত বলিয়াছেন ঃ—

"ভূগোলোব্যোম্নি তিষ্ঠতি।"

গোলাকার পৃথ্বী শূন্য মণ্ডলে অবস্থিতি করিতেছে। ভাস্করা-চার্য্য সিদ্ধান্তশিরোমণিতে লিখিয়াছেন ঃ—

"নান্যাধারং স্বশক্ত্যা বিয়তিচ নিয়তং
তিষ্ঠতীহাস্য পৃষ্ঠে।
নিষ্ঠং বিশ্বঞ্চ শশ্বৎ সদনুজমনুজা-
দিত্যদৈত্যং সমস্তাৎ॥"

পৃথিবী বিনা আধারে স্বীয় শক্তি দ্বারা আকাশ-মণ্ডলে অব-স্থিতি করিতেছে। ইহারই পৃষ্ঠে চতুর্দ্দিকে দেব, দানব, মানবাদি সমস্ত নিবাস করিতেছে।

আজ কালের শিক্ষিত জগৎ বক্ষ বিস্ফারণ করিয়া বলিয়া

থাকেন যে, সার্ আইজাক নিউটন জন্মগ্রহণ করিয়াই পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির গূঢ় প্রহেলিকা উদ্ভেদন পূর্ব্বক জগৎকে প্রথম জাগ্রত করিয়াছেন। বলিতে হাসি পায় যে, আর্য্যজাতি এ তত্ত্ব নিউটনের বিনা শিক্ষায় স্বয়মেব আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ভাস্করাচার্য্যকৃত গোলাধ্যায়ে লিখিত আছে ঃ—

"আকৃষ্টশক্তিশ্চ মহী তয়া যৎ
খস্থং গুরুঃ স্বাভিমুখং স্বশক্ত্যা
আকৃষ্যতে তৎ পততীতি ভাতি
সমে সমন্তাৎ ক্বপতত্বিয়ং খে॥"

পৃথ্বী আকর্ষণ-শক্তি-বিশিষ্টা, কারণ কোন গুরুভার বস্তু আকাশে নিক্ষেপ করিলে পৃথিবী স্বীয় শক্তির দ্বারা তাহাকে নিজাভিমুখে আকর্ষণ করে ; কিন্তু পতন হয়, এরূপ অনুমান হয়, চারিদিকেই সমান আকাশ, অতএব পৃথিবী ভিন্ন কোথায় পড়িবে ? আর্য্যভট্টও বলিয়াছেন ঃ—

"আকৃষ্টশক্তিশ্চ মহী যৎ তয়া প্রক্ষিপ্যন্তে তৎ তয়া ধার্য্যতে।"

পৃথিবী আকর্ষণ-শক্তি-বিশিষ্ট ; কেন না, যাহা প্রক্ষিপ্ত হয়, আকর্ষণ-শক্তি দ্বারা পৃথিবী তাহাই ধারণ করে।

পুরাণাদির গুহ্য মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া, অনেকে রাহুকে একটা রাক্ষস মনে করেন। এই রাক্ষস চন্দ্র সূর্য্যকে মধ্যে মধ্যে গ্রাস করে, তাহাতেই গ্রহণ হয়। পৃথিব্যাদির ছায়ায় যে গ্রহণ হইয়া থাকে, তাহা আর্য্যজাতি অবগত ছিলেন না। আমরা ইংরাজী পড়িয়াই তাহা জানিতে পারিয়াছি। শাস্ত্র-চক্ষুবর্জ্জিত অন্ধ আমরা, না দেখিয়া, না শুনিয়া, সর্ব্বজ্ঞ আর্য্য-ঋষি মহোদয়গণকে কতই তিরস্কার করিয়া থাকি। ব্রহ্ম-

পুরাণে লিখিত আছে, ব্রহ্মা রাহুকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন ঃ—

"পর্ব্বকালেতু সংপ্রাপ্তে চন্দ্রার্কৌ ছাদয়িষ্যসি।
ভূমিছায়াগতশ্চন্দ্রং চন্দ্রগোঽর্কং কদাচন॥"

তুমি পর্ব্বকালে (পূর্ণিমা ও প্রতিপদের সন্ধি এবং অমাবস্যা ও প্রতিপদের সন্ধি) চন্দ্রসূর্য্যকে আচ্ছাদন করিবে, অর্থাৎ পৃথিবীর ছায়ারূপ হইয়া চন্দ্রকে এবং চন্দ্রগত হইয়া সূর্য্যকে আচ্ছাদন করিবে। সূর্য্যসিদ্ধান্ত বলিয়াছেন ঃ—

"ছাদকো ভাস্করস্যেন্দুরধস্থোঘনবদ্ভবেৎ।
ভূচ্ছায়াং প্রাঙ্মুখশ্চন্দ্রো বিশত্যর্থো ভবেদসৌ॥"

মেঘের ন্যায় চন্দ্র সূর্য্যের অধঃস্থ হইয়া সূর্য্যকে (সূর্য্যগ্রহণে) আচ্ছাদন করে, এবং চন্দ্র (গ্রহণকালে) ভূচ্ছায়াতে প্রবেশ করে। অমরকোষ অভিধান পড়িলেই প্রতীতি হইবে যে, রাহু, তম, ভূচ্ছায়া এক পর্য্যায়ের শব্দ। ইহা ছাড়া গ্রহ নক্ষত্রের লগ্ন প্রভাবাদি কালে পৃথিবী মধ্যে জীব ও উদ্ভিদ প্রভৃতিতে শক্তি সঞ্চারিত হইয়া, কখন কিরূপ ফলের উদয় হইয়া থাকে ; গ্রহ নক্ষত্রাদির গতি দেখিয়া রাজ্যবিপ্লব, মহামারী, অতি রোগব্যাপ্তি, দুর্ভিক্ষ, সুভিক্ষ আদির কিরূপে সঞ্চার হয় ; নক্ষত্র বিশেষে, লগ্ন বিশেষে, জন্মগ্রহণ করিলে, মানবের সমস্ত জীবনের মধ্যে কি কি ঘটনা ঘটিবে ; এতাবৎ জন্ম-পত্রিকাতে লিপিবদ্ধ করিতে আর্য্যজ্যোতির্বিদ্গণ যেরূপ পারদর্শী ছিলেন, সেরূপ পৃথিবীর অন্যাংশে এ পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয় নাই। সুমার্জ্জিত বুদ্ধি, বিদ্যা, পরাক্রম লইয়া ভারতবর্ষ সভ্য জগতের শিরোমণি হইয়া কেমন সুন্দর আদর্শ-লিপি চিত্র করিতেছিল ; না জানি,

কোথাকার কি কুবাতাস লাগিয়া, অকস্মাৎ সেই ভারতবর্ষ দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য—হতচেতন—মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল!

অনুসন্ধান দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, এক হইতে দশ পর্য্যন্ত গণনা করিতে, এবং এক এক শূন্য যোগে দশ গুণ সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে ভারতবর্ষেই প্রথম ব্যবস্থা হয়। গণিত, বীজগণিত আদি শাস্ত্র, ভারত হইতে আরবে, তথা হইতে পারস্য, গ্রীস্ প্রভৃতিতে, এবং তথা হইতে পৃথিবীর দিগ্দিগন্তে প্রচারিত হইয়াছে।

চিকিৎসা-বিদ্যাতেও ভারতবর্ষ আদি গুরু। অশ্বিনীকুমার, ধন্বন্তরি, সুশ্রুত প্রভৃতি অদ্বিতীয় পুরুষগণ আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যাবিশারদ ছিলেন। পদার্থবিজ্ঞানে তাঁহারা বিপুল উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। অস্ত্র-চিকিৎসা সম্বন্ধে সুশ্রুত যত অগ্রসর হইয়াছিলেন, ইংরাজী অস্ত্র-চিকিৎসা সম্ভবতঃ এখনও তত দূর যাইতে পারে নাই। ডাক্তার রয়েলি বিশেষ বিচার করিয়া দেখিয়াছেন যে, ভারতীয় শারীর-বিদ্যা-বিশারদ অস্ত্র-চিকিৎসকগণ ১২৭ খানি অস্ত্র ব্যবহার করিতেন। আমরা নিজ গৃহের এই বিদ্যা ক্রমশঃ হারাইতে বসিয়াছি। রাজকীয় চিকিৎসার বিকট চীৎকারে এই উৎকৃষ্ট বিদ্যা মহা মূর্চ্ছাদশা প্রাপ্ত হইয়াছে। রাজার প্রতিকূল দৃষ্টিতে স্বদেশবাসিগণের অনুরাগ ও শুশ্রূষার অভাবে এই বিদ্যার পুনর্জীবন লাভের বড় আশঙ্কা বোধ হইতেছে। বিদ্যাবান্ সদ্বৈদ্যগণের কৃপা-দৃষ্টি থাকিলে, আমাদিগকে নিতান্ত নিরাশ হইতে হইবে না।

আর্য্যজাতি সঙ্গীত-বিদ্যার উন্নতি সাধনেও যথেষ্ট যত্ন করিয়াছিলেন। স্বর-শক্তির গুহ্য তত্ত্ব আর্য্যজাতি যেমন

বুঝিয়াছিলেন, এখন পর্য্যন্ত পৃথিবীর কোন জাতি তত খানি বুঝিতে পারেন নাই। মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য শব্দ-নাদ শরীর-যন্ত্রের যেখান হইতে যাহা উদ্‌গত হইতে পারে, আর্য্যজাতি তাহার বিশেষ তথ্য অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। তাই তাঁহাদিগের দেব-ভাষা—সংস্কৃত ভাষার পূর্ণতা সাধনে পঞ্চাশটী বর্ণ আবিষ্কৃত ও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উচ্চারণ-গুণে, স্বর-বিন্যাস-গুণে, এক শব্দই মনের নানা ভাব-ব্যঞ্জক হইয়া থাকে। ভারতবর্ষ ভাব ও কবিত্বের দেশ; ভাবুক ও কবি এ দেশে যত জন্মিয়াছেন, এরূপ আর কোন দেশে দেখিতে পাওয়া যায় না। ভরত, হনুমান, দামোদর, সোম, পবন, নারায়ণ প্রভৃতি সঙ্গীত-গ্রন্থের প্রধান প্রধান লেখক ছিলেন। যখন দেশে কোন প্রকার রাজ্যবিপ্লব, দুর্ভিক্ষ, শোকতাপাদিজনক ঘটনাবলীর প্রাচুর্য্য না থাকে; যখন লোক সকলকে দুর্ভাবনা ও কায়ক্লেশে বিব্রত হইতে না হয়; অর্থাৎ যখন লোক-সমূহ কুশল পূর্ব্বক জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকে; সেই সময়েই সঙ্গীত-বিদ্যার বিশেষ চর্চ্চা ও উন্নতি হয়। ভারতের দিন দিন অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত মূর্চ্ছনারও মূর্চ্ছা-দশা আসিয়া পড়িয়াছে! বেদই ভারতের অপৌরুষেয় মহা শাস্ত্র। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় এই বেদ-রাশির মধ্যে যে সামবেদকে নিজ বিভূতি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই সামবেদ সঙ্গীত-বিদ্যার পূর্ণ পরিচয়। সঙ্গীত-বিদ্যার পূর্ণ প্রাদুর্ভাবে, গন্ধর্ব্ব-বিদ্যার পূর্ণ প্রচারে দেব-লোক পর্য্যন্ত আমোদিত হইত। দেবর্ষি নারদের বীণা-তন্ত্রী-বাদ্যসহ হরিগুণ-সঙ্গীতে ত্রিলোক বিমোহিত হইত।

মহাবিদ্যারূপিণী সাক্ষাৎ সরস্বতী স্বয়ং বীণাপাণি হইয়া, মদন-মদ-মর্দ্দন দেবাদিদেব মহাদেব স্বয়ং সঙ্গীত-যন্ত্র ধারণ পূর্ব্বক আপনার ভাবে আপনি নিমগ্ন হইয়া, সঙ্গীত বিদ্যার যথোচিত মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। শব্দকে—স্বরকে আদি-মন্ত্র জানিয়া, প্রাচীন আর্য্যমহর্ষিগণ ইহার পূর্ণ বিস্তারের জন্য যথোচিত যত্ন করিয়াছিলেন, এবং ভূলোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক এই অনাদিসিদ্ধ মহানাদে পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন।

ভাষার যে সকল শক্তি থাকিলে, জাতীয় ভাবের পূর্ণতা-সম্পাদন করিতে পারে, আর্য্যজাতির সংস্কৃত ভাষায় তাহা সম্পূর্ণরূপ বিদ্যমান আছে। ভাষার গুণে শ্রোতা ও বক্তা উভয়েরই হৃদয়ে শক্তি সঞ্চারিত হইয়া থাকে। সংস্কৃত ভাষা-গত বিচিত্র শক্তি-প্রভাবে শিশু-প্রকৃতি, স্ত্রী-প্রকৃতি, ও পুং-প্রকৃতি স্বতন্ত্র ও সুচারু ভাবে সংগঠিত হইয়া থাকে। সংস্কৃত ভাষার সাহিত্য, ইতিহাস, ব্যাকরণ আদি সমস্তই যথাযথ প্রকৃতি-গঠনের অনুকূল। কবিত্ব ও ভাষার কোমলা-বরণে আচ্ছাদিত হইয়া, আর্য্যশাস্ত্র মধ্যে অত্যন্ত দুজ্ঞের্য় ও দুর্ব্বোধ্য বিষয়-রাশি লিপিবদ্ধ থাকায়, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই তাহা হৃদ্‌গত করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।

আজ কাল সামান্য সামান্য বিষয়ও লিখিত ও পুস্তকা-কারে প্রকাশিত হইয়া থাকে; কিন্তু তখনকার অতি নিগূঢ় বিষয় সকলও লোক-সমাজের এত অভ্যস্ত হইয়া থাকিত, মুখে মুখে তাঁহারা এত শিক্ষা করিতেন যে, তত কথা পুস্তকে লিখিয়া রাখিবার আবশ্যকতা মনে করিতেন না। লোক-সমাজের উন্নত মনস্কতার অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে যে কত

শত নিগূঢ় তত্ত্ব, আকাশের শব্দ আকাশে লয় হওয়ার ন্যায়, বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহার সীমা করা যায় না। লোক সকলের স্মরণশক্তি অতি তীব্র থাকায়, অনেক কথাই লিপি-বদ্ধ করিবার আবশ্যক হইত না। শ্রুতি, পুরাণ প্রভৃতি সকলই বহুকাল মুখে মুখে প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছিল, লোকের মেধাশক্তির খর্ব্বতা হইতে দেখিয়া আচার্য্যগণ ক্রমে সে সকল শৃঙ্খলাপূর্ব্বক লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ভার-তীয় মস্তিষ্কের নিভৃত-চিন্তা-প্রসূত কত প্রয়োজনীয় বিষয়েই যে আমরা বঞ্চিত হইয়াছি, তাহা বলিতে পারা যায় না। তাঁহাদের মুখের কথা মুখেই রহিয়া গিয়াছে, আমাদের ন্যায় দুর্ভাগ্যগণের কর্ণে প্রবেশ করিল না। সে কালের ধরণের একটী পণ্ডিতের কথা এখন মনে পড়িতেছে। তিনি শাস্ত্রের নানা শাখায় সুপণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু নিঃস্বতা প্রযুক্ত সর্ব্বদা ক্লেশ ভোগ করায়, তাঁহাকে একজন স্কুল-সমূহের তত্ত্বাবধায়ক বলিলেন যে, আপনি নর্ম্মাল স্কুলের নিয়মিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে, আমি আপনাকে কোন একটী স্কুলের প্রধান পণ্ডিত করিয়া দিতে পারি। তাহাতে আপনি যে মাসিক বেতন পাইবেন, তাহাতে আপনার সংসার চলিতে পারিবে। বুদ্ধিমান্ মেধাবী পণ্ডিত পরীক্ষার পুস্তক গুলি জানিয়া লইলেন, ও স্বল্পকাল মধ্যে সমস্ত অভ্যাস করিয়া পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইলেন, এবং তাহার সার্টি-ফিকেটও পাইলেন। পণ্ডিত মহাশয় সার্টিফিকেট লিখিত কয়েক পঙ্‌ক্তি মুখস্থ করিয়া লইলেন এবং কাগজ খানি কোথায় রাখিবেন ভাবিয়া ফেলিয়া দিলেন। কিছু দিন পরে

স্কুল-ইন্‌স্পেক্টরের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তিনি একটী কর্ম্ম প্রার্থনা করিলেন। ইন্‌স্পেক্টর বাবু তাঁহার সার্টিফিকেট চাহিলেন। পণ্ডিত মহাশয় সার্টিফিকেটে লিখিত কয়েক পঙ্‌ক্তি যাহা মুখস্থ ছিল, তাহা আবৃত্তি করিয়া দিলেন। ইন্‌স্পেক্টর বাবু সেই মুল-সার্টিফিকেট খানি দেখিতে চাহিলে, পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, আমার ঘরে যে পুঁথি পত্র আছে, তাহাই বাঁধিবার কাপড় ও রাখিবার স্থান পাই না, আপনার সেই একটু কাগজ আবার কোথায় রাখিব? তাহাতে যাহা লিখিত আছে, তাহা ত আমার মুখস্থই আছে। আপনার যতবার শুনিতে হয়, শুনিয়া লউন। ইংরাজী ব্যবস্থায় অনভিজ্ঞ, সরল, সাধু-হৃদয় পণ্ডিত মহাশয়ের কথা শুনিয়া ইন্‌স্পেক্টর বাবু একটু হাসিলেন, ও নিজে অফিশ হইতে তাঁহার সার্টিফিকেটের প্রতিলিপি আনাইয়া তাঁহাকে যত্ন করিয়া রাখিতে বলিলেন, এবং তাঁহাকে একটী পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত করিলেন। আমাদের ন্যায় সামান্য ব্যক্তিগণ যে সকল বিষয়কে অতি গুরুতর বলিয়া মনে করেন, প্রাচীন আর্য্যজাতি তাহা অপেক্ষাও বহুতর ও নিগূঢ়তর বিষয় সকলে মনোনিবেশ করিয়া এ গুলির প্রতি তত যত্নবান হইতে পারেন নাই। ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন, "গুণ হয়ে দোষ হৈল বিদ্যার বিদ্যায়"। আর্য্যজাতির অতি গুণই আমাদিগের পক্ষে এখন বিগুণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তখন তাঁহারা যাহা তুচ্ছ বোধে ফেলিয়া দিতেন, এখন আমরা তাহা কুড়াইয়া পাইলে কৃতার্থ হইয়া যাই।

বিজ্ঞান-শাস্ত্রেও তাঁহারা যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখাইয়াছি-

লেন। ভারতে বারংবার রাজ্যবিপ্লব হওয়ায়, বিশেষতঃ স্থূলদর্শী গূঢ়তত্ত্বানভিজ্ঞ ম্লেচ্ছ ও যবনবর্গের বিপুল উচ্ছৃ-ঙ্খলাপূর্ণ অত্যাচারে অনেক গ্রন্থেরই অন্তদশা হইয়াছে। বিজ্ঞান-শাস্ত্রে কারণবিজ্ঞান, প্রক্রিয়াবিজ্ঞান, ও ফলবিজ্ঞান প্রধানতঃ এই তিনটী বিভাগ পরিলক্ষিত হয়। অন্ন প্রস্তুত করিতে হইলে, কি কি উপকরণ চাই, ও সেই উপকরণ গুলির আবশ্যকতা কি, ইহা কারণবিজ্ঞানের অন্তর্গত। সেই উপকরণ গুলি কিরূপে ও কোন্ ক্রম অনুসারে ব্যবহার করিলে অন্ন প্রস্তুত হইবে, ইহা প্রক্রিয়াবিজ্ঞানের অন্তর্গত। অন্ন প্রস্তুত হইলে তাহা কিরূপে ভোজন করিতে হয়, ও কিরূপে তদ্দ্বারা ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়, এবং ঐ ভুক্ত অন্ন শরীরের মধ্যে কি কি অবস্থায় পরিণত হইবে, এইরূপ জ্ঞানলাভ করা ফলবিজ্ঞানের অন্তর্গত। অগ্নি, জল, তণ্ডুল, হাঁড়ি প্রভৃতি অন্ন-পাকের প্রধান উপকরণ গুলি যাঁহারা নিরূপণ করিয়াছেন, তাঁহারা কার্য্যকারণ-তত্ত্বের নিগূঢ়-মর্ম্মজ্ঞ, বিজ্ঞ, ও বিচক্ষণ। কারণবিজ্ঞান-বেত্তাগণের উপদেশে তত্তাবতের যথাবিধি ব্যবহারের দ্বারা প্রক্রিয়াবান্ পুরুষগণ কার্য্যের পরিণামের দিকে অগ্রসর হইয়া থাকেন; তদনন্তর সকলে ফলভাগ-ভোগী হয়েন। ভোজন করিলে ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়, ইহা যত লোক অবগত আছে; কিরূপে পাক করিতে হয়, তাহা তত লোকে জানে না। আবার কিরূপে পাক করিতে হয়, তাহা যত লোকে জানে; জল, অগ্নি, তণ্ডুলাদির শক্তি তত লোকে বিদিত নহে। সংসারে কারণতত্ত্ববিদ্ লোকের সংখ্যা অতি অল্প, প্রক্রিয়াবান্ পুরুষের সংখ্যা তদপেক্ষা

অধিক, এবং ফলভোগী লোকের সংখ্যা অত্যধিক বলিতে হইবে। প্রক্রিয়াবিজ্ঞান যত অধিক পরিমাণে প্রচলিত ও লোকের অভ্যস্ত হইয়া যায়, কারণবিজ্ঞানের প্রতি লোকের ততই অল্পদৃষ্টি, অনাস্থা, ও অযত্ন হয়। ব্যবহারোপজীবী লোকের যত প্রচুরতা হয়, ততই কারণতত্ত্ব-বেত্তাগণের সংখ্যা হ্রাস হইয়া যায়। সুতরাং মূল-শাস্ত্র গুলির প্রতি লোকের আর বড় আদর থাকেনা। বিজ্ঞানের অতি চর্চ্চা ও অত্যুন্নতি কালে কারণবিজ্ঞানতত্ত্ব প্রায় পুস্তকের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিয়া যায়। ক্রমে অনাদরদোষে উক্ত পুস্তকগুলিও বিনষ্ট হয়। ভারতে বিজ্ঞান-শাস্ত্রের এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে।

আজ কাল বিদ্যুদ্-বিজ্ঞানের বিপুল চর্চ্চা দেখিয়া মনে করিয়া থাকি, আর্য্যজাতি এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন; কিন্তু বুদ্ধিমানগণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন যে, জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষে, প্রত্যক্ষে, ও অপ্রত্যক্ষে আর্য্যবিদ্বদ্বর্গ সৌদামিনীর সহিত যত মাখামাখি করিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে বিদ্যুতের সহিত এখনও তত ঘনিষ্ঠতা হয় নাই। দশানন যে দুর্জ্জয় শক্তিশেলে সুমিত্রানন্দনকে জড়ীভূত ও স্পন্দন-বর্জ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা ঐ বৈদ্যুতিকী শক্তির প্রসাদে। এখন যে সামান্য "ইলেক্‌ট্রিক্ ব্যাটারির" স্পর্শে হস্তপদাদি অসাড় ও নিস্পন্দ হইয়া যায়, সেই জাতীয় শক্তিজাল-সমবায়ে ঐ শক্তিশেল বিনির্ম্মিত হইত। "শক্তি-শেল" এই শব্দটীর দ্বারাই ইহার প্রকৃতিগত পরিচয় পাওয়া যায়। বাণের মধ্যে বৈদ্যুতিকী শক্তির ব্যবহার করিতে এখনও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সামর্থ্য লাভ করেন নাই। মন্দিরের

উপর ত্রিশূল চক্রাদি ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহাও বিদ্যুদ্-বিজ্ঞানের বিপুল পর্য্যালোচনার ফল। উত্তর শিয়রে শয়ন করিতে নাই, এ রীতিটীও বিদ্যুদ্-বিজ্ঞানতত্ত্ব পরিপাক করার পর প্রচারিত হইয়াছে। একটী অণ্ড বা একটী কচি ফলের দিকে কেহ অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলে, ভারতের গ্রাম্যনারী পর্য্যন্ত তাহাকে নিষেধ করিয়া থাকে। অঙ্গুলির দ্বারা নিষ্ক্রান্ত জান্তব সতেজ তাড়িৎ-শক্তি-প্রবাহে অণ্ড বা কচি ফলটী নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, ইহা যে দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা অবগত আছে, সেখানে বিজ্ঞান-শাস্ত্রের উন্নতি হয় নাই কেমন করিয়া বলিব? মন্দিরে যেমন ত্রিশূল, চক্রাদি ব্যবহার হয়, সেইরূপ উচ্চ ছাদের উপরে লোকে তেকাঁটা-সিজ গাছ রক্ষা করিয়া থাকেন। সিজও তাড়িৎ-প্রবাহক। ত্রিশূলাদি যেমন বজ্রপাতাদি হইতে মন্দিরকে রক্ষা করে, সিজও সেইরূপ গৃহকে রক্ষা করিয়া থাকে। আমাদের বঙ্গদেশীয় একজন প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবেত্তা সিজের গুণ পরীক্ষা করিবার জন্য তাহার নিকট একদিন একটী "ইলেকট্রিক্ ব্যাটারি" রাখিয়া দিয়াছিলেন, অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে দেখিলেন, ব্যাটারিতে স্থিত বিদ্যুদ্-রাশি প্রায়ই সমস্ত নিষ্কাশিত হইয়া গিয়াছে। পল্লীগ্রামবাসিনী একজন পরিচারিকা পর্য্যন্ত এ সকল ব্যবহার জানে, কিন্তু কারণবিজ্ঞানের চর্চ্চার বিপুল অভাবে ইহার কারণ অনেক বিদ্যাবান্ও অবগত নহেন। বাঙ্গালাদেশের কোন কোন বিভাগে "শিলারি"-ব্রতের প্রবল প্রচার ছিল, এবং এখনও কোন কোন স্থানে উহা অল্পাধিক পরিমাণে প্রচলিত আছে। কৃষকগণ যখন

দেখে, তাহাদিগের ক্ষেত্র শস্য-পূর্ণ, এবং মেঘমালা আকাশ-মার্গের অনতিদূর দিয়া ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে, সেই সময় শস্য রক্ষার্থ শিলারি নিয়োগ করিয়া থাকে। শিলারিকে নিরামিষভোজী রুক্ষকেশে থাকিতে ও কেশ লোমাদি রক্ষা করিতে হয়, এবং সর্ব্বদা একটী সুদীর্ঘ ত্রিশূল হস্তে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ভ্রমণ করিতে হয়। শিলাবৃষ্টির দ্বারা শস্যের পাছে ক্ষতি হয়, এই জন্যই শিলারি-নিয়োগ। শিলা+অরি অর্থাৎ শিলাবৃষ্টির নিবারণকারী। শিলারি যেখানেই দেখিবে মেঘ নিকট দিয়া যাইতেছে, অমনি সেইখানে মেঘ কাটিয়া যাউক, এই সংকল্পশক্তির পরিচালনা পূর্ব্বক সেই-খানে ত্রিশূল পুঁতিয়া দাঁড়াইবে, অথবা সেই স্থানে ত্রিশূল স্কন্ধে ধীরে ধীরে বিচরণ করিবে। অট্টালিকার শীর্ষ-ভাগস্থ লৌহশলাকা আকাশমার্গের ও মেঘমালার যে বিকার বিনাশ করিয়া থাকে, ব্রহ্মচর্য্যশীল শিলারি ত্রিশূল-ধারী হইয়া সেই কার্য্য সম্পাদন করে। "শিলারি"-পদ্ধতিও প্রাচীন বিজ্ঞান-কৌশল হইতে প্রচারিত হইয়াছিল। এই বিজ্ঞান-শাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল বলিয়াই সন্ধ্যাহ্নিক কালে পট্টবস্ত্র পরিধান, রোমশাসনে উপবেশন, জল, ও তাম্রপাত্রাদির ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে। এই বিজ্ঞানের প্রভাবেই কোন্ তিথিতে কোন্ দ্রব্য খাইতে হয়, ও না খাইতে হয়, কোন্ কোন্ তিথিতে উপবাস করিতে হয়, স্ত্রীজাতি ও পুরুষজাতির ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের আহারাচ্ছাদন কি, ইহা নিরূপিত হইয়াছে। সধবাকে কেন মণিমুক্তা-খচিত স্বর্ণালঙ্কারাদিতে বিভূষিত থাকিতে হয়, কেন বিধবাকে ব্রহ্ম-

চারিণী সাজিতে হয়, ইহাও বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নিরূপিত হইয়াছে।

বিজ্ঞান-শাস্ত্রের বিশিষ্টরূপ উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি এই অষ্টাঙ্গ যোগের অবতারণা হইয়াছে। এই বিজ্ঞান-সিদ্ধ বিশিষ্ট প্রক্রিয়াবলেই মানব চিরায়ু হইতে পারে, দূর দর্শন ও অগোচর জ্ঞানে সমর্থ হইতে পারে; অন্তর্ধ্যান ও অন্তরীক্ষ-বিচরণ আদির ক্ষমতা এই বিজ্ঞান-বলেই আর্য্যগণ লাভ করিয়াছিলেন। এই বিজ্ঞান-সিদ্ধির বিশাল বিস্ফুরণে আর্য্য মহাযোগিগণ অণিমা, মহিমা, লঘিমা, গরিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, ও বশীত্ব এই অষ্ট-সিদ্ধি লাভ করিয়া ত্রিলোকের তাবৎ শক্তিকে নিজ নিজ পরিচারিকা মধ্যে পরি-গণিত করিয়াছিলেন। এই বিজ্ঞানের পূর্ণাৎ পূর্ণতর বিকা-শের সঙ্গে সঙ্গে যোগীশ্বরবর্গ পরব্রহ্মের পূর্ণ বিকাশ করামলক-বৎ প্রত্যক্ষ করিয়া, মানব জীবনের, মানব জন্মের সার্থকতা ও সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছিলেন। এই পূর্ণ জ্ঞান-বিজ্ঞান-তৎ-পর মহাযশস্বী আর্য্যজাতির হৃদয়-যন্ত্রের অলৌকিক গতি কেন স্তম্ভিত হইল! কেন ভারতের প্রফুল্ল মুখে মলিন ছায়া পড়িল! কেন খেলিতে খেলিতে শিশু ভূমিতে ঢলিয়া পড়িল! কি জানি, কোন্ বিষে ভারত জর্জ্জরিত হইল! ভারত-বন্ধু মহোদয়গণ! বলুন কি রূপে আবার ইহার চেতনা-সঞ্চার হইবে।

সমাজ-গঠন সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতির ন্যায় নির্ম্মল চাতুর্য্য-পূর্ণ ব্যবস্থা পৃথিবীর আর কোন জাতিরই নাই। নদীর

স্রোতের মুখে যদি অনুকূল বাতাস পায়, তবে নৌকা যেমন শীঘ্রগতি লক্ষ্য স্থানে গিয়া পৌঁছে, তেমন অন্য কোন কৌশলে নৌযাত্রা সুগম নহে। আর্য্যজাতির হৃদয় একে ভারতীয় স্বভাবজাত ধর্ম্ম-প্রবণ প্রকৃতি দ্বারা গঠিত, তাহাতে তপঃ-সিদ্ধ-বুদ্ধি মহামনা মহামুনি মহর্ষিগণের সিদ্ধবাণীর উপদেশে পরিচালিত। সহজেই সমাজের গতি মানব-দেহ-ধারণের গূঢ় লক্ষ্য স্থানে পৌঁছিবার সম্পূর্ণ অনুকূল হইয়াছিল। ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম চতুষ্টয় এবং ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা অনুসারে দীক্ষিত, শিক্ষিত, ও পরিচালিত হইয়া, ভারতীয় সমাজ ধীরে ধীরে অস্খলিত পদে উন্নতির চূড়ান্ত সীমায় উপস্থিত হইয়াছিল। যে প্রণালীতে শিক্ষিত হইলে, যে প্রণালীতে কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণ করিলে, মানবগণ প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা পূর্ব্বক ইহপরলোকের কল্যাণ-মার্গ বিশেষরূপ বিচার পুরঃসর আর্য্য মহর্ষিগণ তাহা পরিপাটীরূপে বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বিদ্যাবান্ ও ধর্ম্মাত্মা সাধু সন্ন্যাসীদিগকে, গভীর-তত্ত্ব-চিন্তা-পরায়ণ মহাপুরুষদিগকে, জগতের কল্যাণকারী ব্রাহ্মণদিগকে রক্ষা করিবার ভার বিজয়-চিহ্নধারী রাজন্যবর্গ, ধনাধিকারী বৈশ্যবর্গ, এবং সেবাচারী শূদ্রবর্গ উৎসাহ-পূর্ণ হৃদয়ে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই নিশ্চিন্ত চিত্তে মহাপুরুষগণ জগতের হিতের জন্য অনেক গুরুতর কার্য্য সাধন করিতে পারিয়াছিলেন। দীনদরিদ্রকে দান করিয়া, অতিথি অভ্যাগতের সেবা করিয়া, গুরু ব্রাহ্মণের শুশ্রূষা করিয়া, শাস্ত্রীয় আদেশ প্রতিপালন করিয়া, রাজার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া,

সমাজ ধীরে ধীরে ধর্ম্ম-রাজ্যের অলোকসামান্য আনন্দ-পুরীতে গমন করিয়াছিল। পুত্র পিতার আজ্ঞাকারী হইয়া, অনুজ অগ্রজের দাস হইয়া, নারী পতিগতপ্রাণা হইয়া, ভৃত্য প্রভুর পুত্রবৎ হইয়া, জীবের প্রতি দয়াকে পরম পুরু-ষার্থ জানিয়া, ভারতীয় সমাজ আনন্দ-নগরীতে প্রবেশ করিয়া-ছিল। আর্য্যজাতি স্বাধীনতা-প্রিয় ছিলেন, কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি-দূষিত স্বেচ্ছাচারকে স্বাধীনতা বলিয়া বুঝিতেন না। তাঁহারা সেই সুখকে সুখ বলিয়া বুঝিতেন, যে সুখ লাভ করিতে গেলে অন্যের অসুখ বা অনিষ্ট উৎপাদিত না হয়, এবং কোন কালে তাহার বিচ্ছেদ না ঘটে। তাঁহারা সেই বল, সেই বীর্য্য, সেই পরাক্রমকে শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন, যাহা দ্বারা মহাত্মা-গণ পরিরক্ষিত, দুরাত্মাগণ ভীত ও সুশাসিত হইয়া থাকে, এবং অন্তঃকরণের দুর্দ্দম্য বৈরী-বর্গ বশীভূত হইয়া আসে। তাঁহারা সেই ধনকেই ধন মনে করিতেন, যাহা সদুপায়ে উপার্জ্জিত ও সৎকার্য্য-সাধনার্থ ব্যয়িত হইত, এবং যাহা পাইলে মনের তৃষ্ণা-ক্ষয় হইত ও ভোগ বাসনাজাল জন্মের মত বিদূরিত হইত। তাঁহারা সেই বিদ্যাকেই বিদ্যা মনে করিতেন, যাহার অভ্যাসে গর্ব্ব ও অভিমান বিচূর্ণিত, অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত, এবং পরমার্থ-তত্ত্ব বিকাশিত হইত।

আর্য্যজাতির বিপুল-বিচার-বিজৃম্ভিত সিদ্ধান্ত-রাশি উৎ-পাটিত উৎখাতিত করিবার জন্য আজ কাল অনেক সমাজ-সংস্কারকই ব্যস্ত। সমাজ-বন্ধনকে তাঁহারা শৃঙ্খল-বন্ধনের ন্যায়, পিঞ্জরাবরোধের ন্যায়, মনে করিয়া থাকেন। যথেচ্ছা-চারের বশবর্ত্তী হইয়া অনেকে ভারতীয় সমাজের জাতিভেদ-

পদ্ধতি বা বর্ণাধিকার-বন্ধনকে বিমোচন করিতে চাহেন। আমি বলি, যাহাকে সর্পে দংশন করিয়াছে, তাহার দষ্ট স্থানের উপরিভাগে সুদৃঢ় বন্ধন করাই শ্রেয়; যতক্ষণ বিষ বিনির্গত না হইয়া যায়, ততক্ষণ বন্ধন মোচন করা ভাল নহে। গোঁয়ার চিকিৎসক বন্ধন খুলিতে বলিলেও রোগীর আত্মীয়গণের পক্ষে তাহা খুলিতে না দেওয়াই উচিত। অসময়ে খুলিলে, বিষ থাকিতে খুলিলে, সেই বিষ সর্ব্ব শরীরে সঞ্চারিত হইয়া যায়, এবং রোগীর প্রাণ-বায়ুকে বাহির করিয়া দেয়। অবিদ্যারূপিণী কালনাগিনী জীব মাত্রকেই দংশন করিয়াছে। যাহারা অবোধ, তাহারা চিকিৎসা করুক বা নাই করুক, সুবোধ আর্য্যজাতি এই কালসাপিনীর বিষবহ্নি-জর্জ্জরিত মানবাত্মাকে আরোগ্য—মায়া-মুক্ত করিবার জন্য এই বন্ধনের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। বিষ কাটিয়া গেলে, সর্ব্বত্রৈকাত্মাকতা-বুদ্ধির উদয় হইলে, পারমহংস্য বৃত্তি-প্রবাহ সবেগে ছুটিতে থাকিলে, এই বন্ধন কাহাকেও যত্ন করিয়া খুলিতে হইবে না, উহা আপনিই খুলিয়া যাইবে। বিষ বাহির হইয়া গেলে, বিষ-পাথর আপনিই খসিয়া পড়িবে। স্বেচ্ছাচার-প্রিয় ব্যক্তিগণ এই বর্ণ-বন্ধনকে একটা বিড়ম্বনা বলিয়া বোধ করিয়া থাকে। অতি সূক্ষ্ম-দর্শন-সম্ভূত এই বর্ণ-বিচারই আর্য্যজাতির প্রধান গৌরব-চিহ্ন। এই বর্ণভেদ-বিচার-বিতাড়িত হইয়াই বৈশ্যগণ ভারতকে ধনধান্য-পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন, ক্ষত্রিয়গণ সাগরাম্বরা বসুন্ধরায় ঐকাধিপত্য করিয়া নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোহভ্যনুনাদিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই বর্ণ-বিচার-বিলাসে বিমোহিত—বিনোদিত হইয়াই ব্রাহ্মণগণ

ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর শাসনে থাকিয়া, অশেষ তপঃক্লেশ সহ্য করিয়া, ব্রহ্মবিদ্যা অভ্যাস করিয়াছিলেন। আমার স্মরণ আছে, আমার মুঙ্গেরে অবস্থিতি কালে একদিন গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতেছি, দেখিলাম, রাজকীয় পুরস্কারে লুব্ধ হইয়া একজন ডোম লগুড় হস্তে অপালিত কুক্কুর মারিবার জন্য বেড়াইতেছে। সেখানকার কোন দয়াল ব্যক্তি একটা অপালিত কুক্কুরকে ডোমের হস্ত হইতে বাঁচাইবার জন্য পালিত কুক্কুরের চিহ্ন-স্বরূপ তাহার গলে একটা ফিতা বান্ধিয়া দিয়াছেন। অপালিত অবোধ কুক্কুর—অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা-বিমূঢ় কুক্কুর—দয়ালু-মহাত্মা-প্রদত্ত ফিতাটীকে একটা বিষম বন্ধন মনে করিয়া, পথ-পার্শ্বে পড়িয়া চারি পায়ে তাহা ছিঁড়িবার যত্ন করিতেছে। ডোমটা পশ্চাদ্‌ভাগে লগুড় লুকাইয়া নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল; কুক্কুর ফিতাটী ছিঁড়িয়া ফেলিলেই তাহাকে অপালিত কুক্কুর-শ্রেণীভুক্ত করিয়া এক দণ্ডাঘাতেই তাহাকে যমালয়ে পাঠাইবে, ইহাই তাহার লক্ষ্য। আমি সেই খানে দাঁড়াইলাম, ডোম ও কুক্কুর উভয়েরই চেষ্টা দেখিলাম, সামান্য লোভে জীব-হত্যা-নিরত ডোমকে মনে মনে ধিক্কার দিলাম, এবং মনে মনে কুক্কুরকে বলিতে লাগিলাম, অবোধ জীব! তুমি যাহাকে আজ বন্ধন বলিয়া মনে করিতেছ, যে বন্ধন কাটিয়া দিলে—ছিঁড়িয়া ফেলিলে, তুমি বাঁচিবে মনে করিতেছ, যে বন্ধনকে তুমি বিড়ম্বনা বোধে ছিঁড়িবার যত্ন করিতেছ, তাহাই তোমার বাঁচিবার একমাত্র উপায়। দয়ালু-জন-দত্ত বন্ধন উন্মোচন করিও না, বন্ধনও ছিঁড়িবে, তোমার প্রাণটীও বাহির হইবে। দয়ালু মহাত্মা মানবের

মর্ম্ম কুক্কুর বুঝিল না, তবু ছিঁড়িতে প্রয়াস পাইতে লাগিল; তখন আমি আর কি করি, একটী করতালী দিলাম। কুক্কুর শব্দ শ্রবণে ভীত, চকিত হইয়া উঠিয়া পলায়ন করিল। ডোমের আশা পূর্ণ হইল না, সে বিরস বদনে চলিয়া গেল। সভ্য মহোদয়গণ! ভারতীয় আর্য্য ঋষিরা দয়া করিয়া সমাজের যে বন্ধন ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহা যেন অবোধ কুক্কুরের ন্যায় আমরা ছিঁড়িয়া না ফেলি। এই অধঃপতনের দিনে—স্রোতের মুখে নাবিক-বিহীন নৌকার ন্যায়, নায়ক-শূন্য নাট্যশালার ন্যায়, ভারতের শোচনীয় দুর্দ্দশার দিনে—আমাদের এই বর্ত্তমান দুঃখ-দুর্ব্বলাধিকারের অশুভ দিনে—এই সমাজ-বন্ধন কাটিয়া গেলে, ক্লেশের পরিসীমা থাকিবে না। জাতীয় গৌরবের উজ্জ্বল চিহ্ন অপগত হইবে, সামাজিক ও পারিবারিক উচ্ছৃঙ্খলতা আসিয়া আমাদের সমাজকে পর্য্যুদস্ত করিবে, সামাজিক বল সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইবে। দিগ্দেশের লোক আমাদিগের মূর্চ্ছাদশাগ্রস্ত সমাজের সংস্কারকবর্গের বর্ত্তমান বিকট চীৎকার শ্রবণ করিয়া মনে মনে হাসিতেছে। কে আছ, ভারত-বন্ধু! একবার দয়া করিয়া ভারতকে প্রকৃতিস্থ, সুস্থ, ও সচেতন করিয়া দাও।

ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত তত্ত্বের মূলবীজ যাহাতে নিহিত রহিয়াছে, সেই অনাদিকাল-সিদ্ধ অপৌরুষেয় বাণী-স্বরূপিণী শ্রুতি, মাতার ন্যায়, যে ভারতকে কল্যাণ-মার্গ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, যে ভারতে ধ্রুব, প্রহ্লাদ, বৃষকেতু আদি বালক, যে ভারতে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী আদি কুলাঙ্গনা, যে ভারতে জনকাদি গৃহস্থ, যে ভারতে শ্রীরামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির রাজা, যে

ভারতে বেদব্যাস, বাল্মীকি গ্রন্থ-রচয়িতা, যে ভারতে মনু, কপিল, যাজ্ঞবল্ক্য বক্তা, যে ভারতে শ্রীকৃষ্ণ, বসিষ্ঠাদি উপ-দেষ্টা, যে ভারতে সিদ্ধ-সংকল্প শুকদেব তপস্বী, আজ সেই সিদ্ধি-সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ভারতের দুর্দ্দশা দেখিয়া, দেবগণ, পিতৃগণ যে নিতান্ত ক্ষুণ্ণ, অবসন্ন, ও অপ্রসন্ন হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আজ মূর্চ্ছিত বা অঘোর নিদ্রায় অভিভূত সমস্ত তেজের আধার-স্বরূপ ভারত-হৃদয়ে পুনস্তেজঃ সঞ্চার করি-বার জন্য যিনি প্রযত্ন করিবেন, তিনিই ধন্য, তিনিই ভারতের প্রিয় সন্তান, তিনিই ভারতের হৃদয়-সর্ব্বস্ব।

রামায়ণ পাঠ করিয়া আজ বাল্মীকির তপোবন দেখিতে গেলাম, ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যানগরী দর্শন করিতে গেলাম, রামায়ণের শোভা তাহাতে দেখিতে পাইলাম না। মহাভারত পড়িয়া ইন্দ্রপ্রস্থ দর্শনে গমন করিলাম, সে পুরীর নিদর্শন পাইলাম না, সমস্ত ছারখার হইয়া গিয়াছে, অতি বিস্তার শূন্য ভূমি ধূ ধূ করিতেছে। গীতার অভিনয় ক্ষেত্র—অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী মহাসেনা সমাগমের রঙ্গ-ভূমি—কুরুক্ষেত্র দর্শন করিতে গেলাম, হৃদয় কান্দিয়া উঠিল, যাহা দেখিতে গেলাম, তাহার কিছুই দেখিতে পাইলাম না। নাম আছে, আর স্থান আছে ; মলিন হৃদয় আমাদিগের, আমরা তাহার মহিমা বুঝিতে পারিলাম না। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, শল্য, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, জয়দ্রথ আদি প্রতাপবান্ মহাবীরবর্গের জ্যা-নির্ঘোষে যে আকাশমণ্ডল ঘনঘোর নিনাদিত হইয়াছিল, যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণ-সখা অর্জ্জুন আত্মজ্ঞান লাভে অহং-মমেতি বুদ্ধি পরিহার পূর্ব্বক ভগবানের পাঞ্চজন্য শঙ্খ-

নিনাদের সহিত দেবদত্ত শঙ্খধ্বনিতে ত্রিলোক পুলকিত ও বৈরিবর্গের হৃদয় বিকম্পিত করিয়াছিলেন, সেই লীলা-ভূমি—কুরুক্ষেত্রে শ্মশান-দৃশ্য ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তাদির গর্ভানুসন্ধান করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলা-ভূমি মথুরা, বৃন্দারণ্য প্রভৃতি দর্শন করিতে গেলাম, সে লালিত্য, সে মাধুরী, সে প্রেম, সে ব্রজপুরী আর দেখিতে পাইলাম না। কাশীখণ্ড পড়িয়া, অগস্ত্য মুনির আশ্চর্য্য কথা শ্রবণ করিয়া, অবিমুক্ত বারাণসীপুরীদর্শনে গমন করিলাম, যাহা দেখিবার জন্য গেলাম, তাহার নাম পাইলাম, স্থান পাইলাম, ঠাট মাত্র দেখিলাম, দেহ পাইলাম, কিন্তু প্রাণ আছে বলিয়া বুঝিতে পারিলাম না। মহাদেবের মহা শ্মশান দেখিলাম, কিন্তু আনন্দ-কাননে নিরানন্দের ছায়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। যে কাশী স্মরণ মাত্রে যম-ভয় বিদূরিত হইয়া থাকে, আজ সেই নির্ম্মলা পুরীতে যমকিঙ্কর সদৃশ ভয়ঙ্কর দুষ্ট দুরাত্মা মণ্ডলীর প্রচুর প্রবেশ হইল কেন? ভারতের যেখানে যাই, তাহার কোন স্থানেই পূর্ব্ববৎ কিছুই দেখিতে পাই না। যাহা ছিল, তাহা কোথায় লুকাইল! আর তাহা দেখিতে পাইব কি না, তাহাই বা কে জানে! উপকথায় শুনিয়াছিলাম, রাক্ষসী রাণী রাজার সপ্তপুরী গ্রাস করিয়া সমস্ত শূন্যময় করিয়াছে; আছে কেবল একটী রাজকন্যা, তাহাকেও ঘুম পাড়াইয়া অচেতন করিয়া সেই রাক্ষসী বাহিরে বিচরণ করিতে যায়। বিলাস-বুদ্ধি-রূপিণী রাক্ষসী সোণার ভারতের সপ্তপুরী প্রায় শূন্য করিয়াছে;

আছে কেবল সেই আর্য্যগৌরব-বুদ্ধি-রূপিণী রাজকন্যা, সেও আবার পাশ্চাত্য সভ্যতারূপ কুহক-বিদ্যায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। যদি কেহ এই রাজকন্যাকে জাগাইতে ও বিবাহ করিতে পারে, তবেই ঐ রাক্ষসীর সোণার কাটিতে সপ্তপুরী পুনঃ পূর্ব্ববৎ সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইবে, রাক্ষসী দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিবে। কে আছ, সোণার ভারতের সোহাগের সন্তান! একবার সমস্ত কুহক-জাল ভেদ করিয়া দৈবীশক্তি-বলে মহামন্ত্রকে চেতন করিয়া, এই প্রসুপ্ত রাজকন্যার অঘোর নিদ্রা—মহামূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়া দাও। রাজনন্দিনী জাগিয়া উঠুক, সপ্তপুরী পুনরুত্থিত হউক। তাহা হইলে সিদ্ধি, সমৃদ্ধি, সৌভাগ্য ভারত-গগনে তারকা-স্তবকের ন্যায় ফুটিয়া উঠিবে। আর্য্যজাতির—আর্য্যপ্রকৃতির বিজয়-ভেরী-নিনাদে প্রসুপ্ত জগৎ পুনর্জাগ্রত হইবে।

প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড প্রখর কিরণ-মালা বর্ষণ ও জগৎকে সন্তপ্ত করিয়া যখন অস্তাচলচূড়ায় বিশ্রাম লাভ করেন, তখন গৃহে গৃহে প্রদীপ-রাশি প্রজ্বলিত হয়, লতায় পাতায় ও তৃণ-শয্যায় খদ্যোতকুল দীপ্তি দান করিতে থাকে, নক্ষত্র-মালা আকাশের দিগ্‌ভাগ আলোকিত করিতে চেষ্টা করে। এইরূপ ত্রিলোক-বন্দিত ব্রহ্মতেজঃ-সন্দীপ্ত আর্য্যজাতির বর্ত্তমান অধঃপতন দেখিয়া, পৃথিবীর দিগ্দিগন্তবাসী নিজ নিজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণভঃপুঞ্জ লইয়া, ভারতের পবিত্র সিংহাসন অধিকার করিতে আসিয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাবে যেমন গোপবধূগণ পাষাণী হইয়া গিয়াছিলেন, সুশোভনা দ্বারকা-পুরী সমুদ্র-গর্ভে লুক্কায়িত হইয়াছে, মহাতেজা মহাপুরুষ-

গণের অবিদ্যমানে আর্য্যনাম আর্য্যধাম যদি সেইরূপ তিরোহিত হইত, তাহা হইলে আক্ষেপ করিবার জন্য আর আমাদিগকে জন্মগ্রহণ করিতে হইত না। যাহার ভীম গর্জ্জনে সমস্ত বন বিকম্পিত হইয়া উঠে, সেই সিংহ যখন নিদ্রিত হইয়া পড়ে, তখন তাহার সম্মুখে ও পশ্চাতে কত বনচারী মৃগ নৃত্য করিয়া, লম্ফ প্রলম্ফন পূর্ব্বক ক্রীড়া করিয়া বেড়ায়, হয় তো ক্ষুদ্র মূষিক সিংহকে মৃত জ্ঞান করিয়া, তাহার নাসা-রন্ধ্রকে একটা ক্ষুদ্র বিবর মনে করিয়া, তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে যায়। কিন্তু পশুগণ! অবোধ জীবগণ! তোমাদিগকে বলিয়া রাখি, সিংহ মরে নাই, নিদ্রিত—অচেতন আছে মাত্র। যথা সময়ে জাগিবে, জাগিয়া যখন সৃক্কণী লেহন পূর্ব্বক ভীম নাদে মহা গর্জ্জন করিবে, তখন অবোধ মূষিক! নির্ব্বোধ মৃগগণ! তোমরা প্রাণ-ভয়ে ভীত হইয়া কোথায় পলায়ন করিবে তাহার স্থিরতা নাই। আর্য্যজাতির গৌরব-বুদ্ধি একটু মলিন হইয়াছে দেখিয়া, আর্য্যপ্রকৃতির প্রতিভা একটু নিষ্প্রভ হইয়াছে দেখিয়া, আজ বিজাতীয় বিক্রম ও বিষয়-বুদ্ধির বিস্ফুরণ লইয়া এই আর্য্য-ক্ষেত্রে কত লোকে সমাজ-সংস্কারক সাজিয়া, অবোধ মৃগ-কুলের ন্যায়, লম্ফ প্রলম্ফন পূর্ব্বক ক্রীড়া করিয়া আপনাদিগের প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি, ও প্রতিভা বিস্তারে যত্ন করিতেছে। কিন্তু যাঁহারা আর্য্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আর্য্যপ্রকৃতি লাভে যত্ন করিতেছেন, আর্য্যকার্য্য-সাধন-ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছেন, আর্য্যশোণিত-বিন্দু যাঁহাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত রহিয়াছে, আর্য্যকুল-গৌরব লাভে যাঁহাদিগের মন প্রধাবিত

হইতেছে, আর্য্যদিগের পরমোপাস্য পরম দেবতার সুচারু চরণ-চুম্বনে যাঁহাদিগের প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে, তাঁহাদিগের প্রসুপ্ত তেজঃ, স্তম্ভিত শক্তি পুনর্জ্জাগ্রত ও প্রবল হইতে অধিক বিলম্ব নাই। তাঁহাদিগের তপস্তেজঃ-বর্দ্ধিত মহা গর্জ্জন শ্রবণ মাত্রেই ইহাদিগকে এ স্থান হইতে পলায়ন করিতে হইবে। ভারতহিতচিকীর্ষু মহাত্মাগণ! সুশিক্ষিত সভ্য মহোদয়-গণ! ভগবানের কৃপার বাতাস বহিয়াছে, শীঘ্রই বিজাতীয় ঘোর মেঘ কাটিয়া যাইবে; ভারতের মলিন আকাশে আবার সূর্য্যের প্রখর কর-জাল বিস্তার হইয়া পড়িবে।

এক সময়ে ভারতবর্ষ সভ্যতা, শিক্ষা, ও সমুন্নতির উচ্চ রত্নসিংহাসনে বসিয়া সমস্ত পৃথিবীর উপর ঐকাধিপত্য করিয়াছিল। তখন সকল জাতির মস্তক ভারতের চারু চরণ-তলে অবনত হইয়াছিল। তখন ভারতের পদরেণু পরিলেহন করিয়া জগদ্বাসী কৃতার্থ হইয়াছিল; ভারতের সহিত যাহার কিঞ্চিন্মাত্র সংশ্রব থাকিত, সেও পুণ্যপূত বলিয়া আপ-নাকে কৃতকৃত্য মনে করিত। তখন ভারতের কোন বিষয়েই প্রতিযোগিতা করিবার উপযুক্ত দেশ বিদ্যমান ছিল না। কিন্তু চিরদিন তো কাহারও সমান যায় না। তবে ভারতের সে শুভ দিনই বা চিরদিন থাকিবে কেন? তখন ভারতের কথা শুনিয়া লোকে পুণ্যোপার্জ্জন করিত; এখন সেই ভার-তের কথায় অবিশ্বাস ও সংশয় জন্মিয়াছে। ভারতে অনেক দার্শনিক জন্মগ্রহণ করিয়া পরস্পর তর্ক বিতর্কে অনেক নিগূঢ় কথার আলোচনা করিয়াছেন; তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন মতের বিরোধ-শান্তির জন্য সকলেই শ্রুতিকে মধ্যস্থ মানিয়া-

ছিলেন। অধ্যাত্ম বিদ্যার আকর-ভূমি শ্রুতিকে এক্ষণে লোকে লৌকিক যুক্তি-যন্ত্রে নিষ্পেষিত করিয়া অপ্রামাণিক বোধে উপেক্ষা করিতেছে। মানব-মন-নিহিত গুপ্ত ও প্রসুপ্ত শক্তি-রাশি অজ্ঞানতা ও অসাধনার আবর্জ্জনায় ঢাকিয়া পড়িয়াছে। বাহ্য জগতের মোহন ভাব লোক-চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে। ভারতের প্রাচীন কথা এখন উপকথা মধ্যে পরিগণিত হইতেছে। যে দিন ভারত জগদ্‌গুরু হইয়া ঐকাধিপত্য করিতেছিল, সে দিন বিগত হইয়াছে। যে দিন ভারত বৃদ্ধ পিতামহের ন্যায় শিশুবর্গকে পার্শ্বে বসাইয়া রাখিতেন, স্নেহ-ভরে সকলকে খাওয়াইয়া পরাইয়া শিক্ষা সভ্যতায় সাজাইয়া মানুষ করিতেন, সে দিন এক্ষণে অতীত-কালগর্ভে লুক্কায়িত হইয়াছে। এখন শিশুগণ সবল ও প্রবল হইয়া, নিজ নিজ ভাবে উন্মত্ত হইয়া, বৃদ্ধ পিতামহকে পদাহত, পদচ্যুত করিবার জন্য, নানাবিধ প্রহরণ সহিত সম্মুখ-সমরে উপস্থিত হইয়াছে। এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর সকল জাতিই ভারতে আসিয়া নিজ নিজ পরিচয় প্রদানের উপযুক্ত অবসর পাইয়াছে। সকল দেশের আচার ব্যবহার, সকল দেশের রীতি নীতি, সকল দেশের আহার আচ্ছাদন, সকল দেশের ভাষা ও ভাব, সকল দেশের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম, সকল দেশের শাস্ত্র ও শস্ত্র, নিজ নিজ উজ্জ্বলতা ও প্রতিভা সহিত ভারতীয় কার্য্য-ভূমিতে আসিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে। বৃদ্ধ ভারতকে উপেক্ষা ও উপহাসের টিট্‌কারীতে ক্ষিপ্তপ্রায় করিয়া তুলিয়াছে। যাহার যে অস্ত্র আছে, যাহার যে বল বা পরাক্রম আছে, যাহার যে কুহক বা কৌশল আছে,

তাহাই লইয়া সকলে ভারতকে অপদস্থ করিতে উদ্যত হইয়াছে। সর্ব্বংসহ ভারতবর্ষ, মহাসাগরগর্ভস্থ প্রচণ্ড পর্ব্বতের ন্যায়, উত্তাল-তরঙ্গ-মালার অগণ্য আঘাত সহ্য করিতেছে। বিজাতীয়তা, বিধর্ম্মিতা, ব্যভিচারাদি দুর্নিমিত্ত-রাশি বৃদ্ধ ভারতের সম্মুখে বিষম বিভীষিকা উৎপাদন করিতেছে। ভারত নিরস্ত্র, কিন্তু নির্ভীক। ভারতের পক্ষ রক্ষা করিবার জন্য যে সকল মহাতেজা মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কি জানি, কোথায় তাঁহারা তিরোহিত হইয়াছেন। বৃদ্ধ ভারত আজ একাকী নিরস্ত্র-হস্তে চারিদিক হইতে নিক্ষিপ্ত বাণরাশির তীব্রাতিতীব্র বেগের বাধা সম্পাদন করিয়া স্বপক্ষ পোষণার্থ অনুকূলবর্গের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে। আজই ভারতের পরীক্ষার দিন। এই মহাসমরে বিজয় লাভ করিতে পারিলেই ভারতের প্রতিষ্ঠা চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকিবে। আর এই সমরে পরাভূত হইলে ভবিষ্যৎ সভ্য সমাজে ভারতীয় অস্তিত্বের নামোল্লেখও হইবে না। শত শত বর্ষ মহাবিক্রম ও পরাক্রম সহিত একাকী ভারতবর্ষ বহু জাতির সহিত বিপুল সংগ্রাম করিয়া এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে অতি প্রতাপী বীরাগ্রগণ্য পিতামহ ভীষ্মের ন্যায় বাণ বিদ্ধাঙ্গ রক্তাক্ত কলেবরে শরশয্যাশায়ী হইয়াছে। হতচেতন হইয়াও কাতরকণ্ঠে পুনর্জ্জীবন-লাভের জন্য ভারতবর্ষ পিপাসার জল চাহিতেছে। দুর্য্যোধনাদির ন্যায় অনেক অবোধ কুলপাংশুবর্গ কর্পূরবাসিত সুশীতল জল বলিয়া, বিজাতীয় প্রকৃতির বিজাতীয় রস আনিয়া পান করিতে দিতেছে। ভারত-ভূষণ ভীষ্ম মহাবীর সে জল পান করিবেন কেন?

আক্ষেপের দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া সঙ্কেতে গাণ্ডীব-ধনুর্ধারী বীরকেশরী অর্জ্জুনের দিকে কটাক্ষপাত করিলেন। কৃষ্ণ-সখা কুন্তিনন্দন মহাবীর ভীষ্মের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তূণ হইতে বাণ গ্রহণ করিলেন, এবং মহাশরাসন গাণ্ডীবের সহায়তায় সেই বাণের তীব্র বেগে ধরিত্রী-গর্ভ ভেদ করিয়া গঙ্গার নির্ম্মল নীর-ধারা ভীষ্মের মুখ-বিবরে প্রবাহিত করিলেন। কুরুবৃদ্ধপিতামহ জলপানে কৃতকৃত্য হইলেন ও অর্জ্জুনকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। আজ মুমূর্ষু ভারতকে ধরাশয্যায় পতিত, পরপদ-বিদলিত, মূর্চ্ছিত, ও অভিভূত দেখিয়া কত অবোধ ভারত-সন্তান, দুর্য্যোধনের ন্যায়, দুর্ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছে; কত কুল-কুঠার হয়তো বলিতেছে, ভারতের শক্তি সামর্থ্য তিরোহিত হইয়াছে, ভারতের স্বতন্ত্র সত্তা নির্ম্মূল হইয়াছে, ভারতের জীবন চিরদিনের জন্য অপগত হইয়াছে, ইহার মায়ামমতা জন্মের মত বিসর্জ্জন দাও; কেহ বা ভারতের এই মহামূর্চ্ছা ভাঙ্গিবার জন্য, কুক্কুর শৃগালের ন্যায়, তাহার পবিত্র অঙ্গ দংশন করিতেছে। অহো! ভারতকুল-সম্ভূত শিক্ষিত সভ্য মহোদয়গণ! বর্ত্তমান ভারতে, কৃষ্ণ-সখা অর্জ্জুনের ন্যায়, হৃদয়ের বলে বলীয়ান, ধর্ম্মার্থ-জ্ঞানে গরীয়ান, কেহ কি পিপাসু বৃদ্ধ ভারতকে নির্ম্মল জল-দানের জন্য অগ্রসর হইবেন না? এক্ষণে এমন কি কেহ নাই, যিনি পার্থিব স্তর ভেদ করিয়া, অবিদ্যা মহামায়ার বিজ্ঞান-স্তর ভেদ করিয়া, ব্রহ্মার কমণ্ডলু—ব্রহ্মার চতুর্বেদ হইতে যে নির্ম্মল ধারা প্রবাহিত হইয়া কপিল-শাপে ভস্মীভূত ষষ্টিসহস্র সগর-সন্তানকে উদ্ধার করিয়াছিল, সেই বৈদিকী ভাগীরথীর মহা-

মহোচ্ছ্বাসের প্রবল ধারা আনিয়া ভারতের তৃষিত কণ্ঠ সুশীতল করেন। বর্ত্তমান ভারতে আর্য্যবংশে মহাতেজা ভগীরথের ন্যায় সুসন্তান কি কেহ বিদ্যমান নাই—যাঁহার তপোবলে ব্রহ্মলোক হইতে গঙ্গার ধারা ভূ-ভার হরিতে ভারতে আসিয়াছিল। মায়ের কোলের শিশুর ন্যায় একবার প্রাণ ভরিয়া ডাকিতে পারিলে, একবার মর্ম্মভেদী স্বরে কান্দিতে পারিলে, মনোরথ পূর্ণ হইতে পারে। আজ এই মহামূর্চ্ছিত ভারতকে হাত ধরিয়া উত্তোলন করিতে হইবে না, মূর্চ্ছিত ভারতের প্রাণ বাহির হয় নাই, শরীর অবসন্ন হইয়াছে মাত্র। ভারতের কর্ণকুহরে মহাশক্তিপূর্ণ সঞ্জীবনী মন্ত্র উপদেশ করিতে হইবে। ধর্ম্মের ধ্বনিতে, ভগবানের অমৃতময় নাম-গুণ-সঙ্কীর্ত্তনে, ভাগবতী শক্তির বিজয়-ভেরী-নিনাদে একবার রণ-ভূমি পরিপূর্ণ করিয়া দাও। মূর্চ্ছিত ভারত আপনিই জাগ্রত হইবে, আপনার তেজে আপনিই উঠিয়া বসিবে, আপনার প্রভাবে আপনি দাঁড়াইয়া উঠিবে, আপনার ভাবে আপনি মাতিয়া ভৈরব নাদে হুঙ্কার ছাড়িবে। আবার ত্রিজগৎ পুলকে পূর্ণিত হইয়া "জয় ভারতের জয়" বলিয়া সিংহনাদ করিবে।

প্রেত-তত্ত্ব-বিজ্ঞানের একখানি ইংরাজি পুস্তকে পাঠ করিয়াছিলাম যে, একজন খৃষ্টীয়-ধর্ম্ম-প্রচারক কোন খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-মন্দিরের উচ্চ বেদিতে বসিয়া শ্রোতৃবর্গের নিকট সার-গর্ভিত ধর্ম্ম-কথা ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার স্বর ক্রমে বন্ধ হইয়া আসিল, চক্ষুঃ স্থির, শরীর নিস্পন্দ, ও শ্বাস নিরুদ্ধ হইয়া গেল। অকস্মাৎ আসন হইতে

তিনি বিচ্যুত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার শুশ্রূষার জন্য সকলে দৌড়িয়া গেল, বারংবার তাঁহাকে ডাকিয়া কোন উত্তর পাইল না, শরীর স্পর্শ করিয়া দেখিল, মৃত্যু হইলে সাধারণতঃ যে সকল লক্ষণ হইয়া থাকে, তাহাই তাঁহার হইয়াছে। বিজ্ঞ চিকিৎসক সকলও আহুত হইলেন। নানারূপ চিকিৎসা করিয়াও কোন ফল-লাভ হইল না। অবশেষে তাঁহার স্বধর্ম্মোচিত শেষ সংকার করার ব্যবস্থা হইতে লাগিল। কফিণ (শবাধার), নবীন বস্ত্র প্রভৃতি সময়োচিত আয়োজন হইল। তাঁহাকে যখন ভূ-গর্ভ-শায়ী করিবার জন্য যাত্রার্থ উদ্যোগ হইতেছে, এমন সময়ে লোক-মণ্ডলীর মধ্য হইতে একজন ধীরবুদ্ধি ও সুবিজ্ঞ পুরুষ বলিয়া উঠিলেন যে, ইহাঁকে লইয়া যাইবার পূর্ব্বে নিকটে কোথাও যদি ইহাঁর কোন আত্মীয় ব্যক্তি থাকেন, তাঁহাকে একবার তারযোগে সমাচার দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহা হইলে, তিনি আসিয়া আমাদিগের সহযাত্রী হইতে পারেন। এই কথায় সকলেই অনুমোদন করিলেন, এবং রেলওয়ে-যোগে এক ঘণ্টায় আসিতে পারা যায়, এরূপ অনতিদূরবর্ত্তী স্থানে তাঁহার একজন ভ্রাতুষ্পুত্র জজীয়তি করিতেন, তাঁহাকেই তৎক্ষণাৎ তারযোগে এই শোচনীয় সংবাদ প্রেরণ করা হইল। এই জজ্ মহোদয় নিজ পিতৃব্যেরই অর্থ সাহায্য ও তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত ও সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন। তিনি এই আকস্মিক দুর্ব্বিপত্তির সংবাদ শুনিবামাত্র ঐ ঘটনা-স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শান্ত, সুধীর, সৌম্যমূর্ত্তি পিতৃব্যের অশেষ গুণরাশি স্মরণ করিয়া, তাঁহার স্নেহ ও কৃপার কথা বারংবার মনে

করিয়া, এবং তাঁহার জীবন সত্ত্বে তাঁহার সহিত শেষ সাক্ষাৎ করিতে পারিলেন না, ইহাই ভাবিয়া, তাঁহার শোকাবেগ উচ্ছ্বসিত হইল ; এবং এই মহানুভব অভিভাবকের সহিত এ জীবনে আর যে সাক্ষাৎ হইবে না, মনঃপ্রাণ ভরিয়া যে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে ও তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে পারিলেন না, তিনি এ আক্ষেপ রাখিবার স্থান পাইলেন না। তাঁহার প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল, আর থাকিতে পারিলেন না। পিতৃব্যের চরণ ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে কান্দিয়া উঠিলেন। তাঁহার শোকোচ্ছ্বাসের আবেগপূর্ণ আর্ত্তনাদে গগন পরিপূর্ণ হইল। তত্রোপস্থিত সকলেরই নয়ন হইতে শোকধারা বহিতে লাগিল। চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে সকলে একবার ঐ চেতনা-শূন্য মহানুভবের গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মুখের দিকে তাকাইলেন, এবং সকলেই দেখিলেন যে, ধীরে ধীরে তাঁহার নয়নের পলক পড়িতেছে, ধীরে ধীরে অঙ্গুলী-সংঙ্কেতে তিনি সকলকে শোক ত্যাগ করিতে ও নীরব হইতে বলিতেছেন। মহাত্মার পুনর্জীবন-লাভের শুভ চিহ্ন-সঞ্চার দেখিয়া সকলেই সহর্ষ চিত্তে শুশ্রূষার্থ তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলেন। অনেকক্ষণ পরে তিনি ধীরে ধীরে আপনি উঠিয়া বসিলেন, এবং মৃদুভাষায় ভ্রাতুস্পুত্রকে সস্নেহ সম্ভাষণ পূর্ব্বক বলিলেন, তুমিই আমাকে বাঁচাইলে, তুমিই আমার যথার্থ পুত্রের কার্য্য করিলে। তুমি না আসিলে আমার পুনঃ সংজ্ঞালাভ হইত না। আমি সজীব অবস্থাতেই ভূ-গর্ভ-শয্যায় চিরনিদ্রিত হইতাম। আমার মৃত্যু হয় নাই, উপদেশ দান করিতে করিতে, কি জানি, কেন আমার মস্তক বিঘূর্ণি-

হইল, হস্ত পদাদি কাঁপিতে কাঁপিতে স্পন্দহীন হইয়া আসিল, বাহিরের শ্বাসের ক্রিয়া যেন রুদ্ধ হইয়া গেল, আর আসনে থাকিতে পারিলাম না, ভূমিতে পড়িয়া গেলাম। ভিতরে চৈতন্য ছিল, সকলে যাহা বলিতে ছিলেন, যাহা পরামর্শ করিতেছিলেন, আমি সমস্তই শুনিতে পাইতেছিলাম। কিন্তু আমি যে মরি নাই, এই কথা সকলকে বলিবার জন্য কতবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু বলিবার সামর্থ্য হইল না। ভিতরে ভিতরে ভাবিতে লাগিলাম যে, আমার বাহিরের অবস্থা দেখিয়া আমাকে সকলেই তো মৃত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু আমি যে জীবিত আছি, একথা ইহাঁদিগকে বুঝাইয়া দেয় কে? আমার মৃত্যু হয় নাই, আমার মূর্চ্ছা হইয়াছে; মূর্চ্ছা ভাঙ্গিলেই যে আমি বাঁচিব, একথা কাহাকেও বলিতে পারিতেছিলাম না। পরিশেষে ভগবৎ-কৃপায় জনৈক সুবিজ্ঞ মহোদয়ের প্রস্তাব অনুসারে তুমি নিকটে আনীত হইলে, এবং স্বভাবসিদ্ধ আত্মীয়তা-সুলভ মনোবেদনার আবেগে তুমি যে চীৎকার করিয়া কান্দিয়া উঠিলে, সেই শব্দ-বলেই আমার শরীরের স্তম্ভিত শক্তি-রাশি অকস্মাৎ কম্পিত ও জাগ্রত হইয়া উঠিল, আমার চেতনা সঞ্চারিত হইল। আজ তোমার চিরকল্যাণের জন্য ভগবানের নিকট আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছি। সভ্য মহোদয়গণ! বর্ত্তমান ভারতও প্রোক্ত ধর্ম্মাচার্য্যের ন্যায় মহামূর্চ্ছায় নিস্পন্দ ও হতচেতন হইয়া পড়িয়াছে। জগদ্‌গুরুর আসনে বসিয়া ভারতবর্ষ সকল জীবের হিত সাধন করিতেছিল, কি জানি, কোথাকার কি কুবাতাস গায়ে লাগিল, ভারতবর্ষ উচ্চ রত্নবেদি হইতে

মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল। অবোধ হিত-চিকীর্ষুগণ সকলেই ভারতের শেষ সৎকার করিতে উদ্যত! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই দুঃসময়ে ভারতের কি কেহ আত্মীয় উপস্থিত নাই, মনঃপ্রাণ দিয়া ভারতকে ভাল-বাসিবার লোক কি কেহ বিদ্যমান নাই, ভারতের চিরকৃতজ্ঞ কি কোন সৎপুত্র নাই, যিনি ভারতের বর্ত্তমান শোচনীয় দশা দেখিয়া ব্যথিত অন্তঃকরণে মর্ম্ম-ভেদী স্বরে কান্দিয়া উঠেন। ভারতের ভাবে বিমোহিত, ভারতীয় শক্তি-সমন্বিত, ভারতীয় তেজে অনুপ্রাণিত ভারত-সন্তান কি আর একটীও জীবিত নাই, যে ভারতের পুনর্জ্জীবনাকাঙ্ক্ষী হয়। হৃদয়বান্ মহোদয়গণ! যিনি ভার-তের সুসন্তান থাকিবেন, তিনিই প্রাচীন ভারতের অ ল প্রতিভা স্মরণ করিয়া একবার মনঃপ্রাণে মিলাইয়া ভারতের প্রাণ-স্বরূপের নিকট ব্যাকুল হৃদয়ে রোদন করিবেন ও ভারতের কল্যাণ প্রার্থনা করিবেন, তিনিই, আর্য্য-কুল-তিলক মহাসাধকের ন্যায়, মহাশ্মশানে মহাশক্তিকে জাগ্রত করিয়া, ভস্মাচ্ছাদিত শবকে শিব করিয়া তুলিবেন। প্রাণের তারে সুর মিলাইয়া যিনি এক বিন্দুও অশ্রুপাত করিবেন, তিনিই ভারতের সুসন্তান, তিনিই ভারতের পরম আত্মী। একবার সনাতন-ধর্ম্মের জয় জয় ধ্বনিতে আকাশ পরি-পূর্ণ হইয়া উঠিলে, একবার হরি হরি ধ্বনিতে সমস্ত হৃদ-য়াকাশ আকুলিত হইয়া উঠিলে, একবার সাধন-মহাশক্তির মহাগর্জ্জনে আকাশ পাতাল পরিপূর্ণ হইয়া গেলে, ভারতের মহামূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়া যাইবে। ভারত আবার জাগিয়া উঠিবে।

আবার মৃদু মধুর তানে ভারতে শান্তির সামগান গীত হইবে। উপসংহারে বলিতেছি ঃ—

"পুনর্ম্মনঃ পুনরায়ুর্ম্মা আগন্ পুনঃ প্রাণঃ পুনরাত্মা,
মা আগন্ পুনশ্চক্ষুঃ পুনঃ শ্রোত্রম্ মা আগন্।"

যে মন সমস্ত কলুষিত চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ত্রিজগতের হিতকামনা পূর্ব্বক ভগবচ্চরণামৃত পানে মত্ত হইয়া থাকিত, আমরা সেই মন হারাইয়াছি, আমাদিগের সেই মন প্রত্যাবৃত্ত হউক; যে পরমায়ু পাইয়া আমরা পাশব প্রকৃতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক মানব জীবনের সার্থকতা সাধন করিতাম, আমাদিগের সেই আয়ু পুনরাবৃত্ত হউক; আমরা যে বল পাইয়া বাহ্য শক্তির প্রবল বল অতিক্রম পূর্ব্বক সকল শক্তির চূড়ান্ত সীমায় উপস্থিত হইতে পারিতাম, আমরা সেই বল হারাইয়াছি, সেই বল আমাদিগের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হউক; যে আত্মা, যে সমৃদ্ধি পাইয়া, আমরা বিষয়-সুখ তুচ্ছ বোধ করিয়া, পরমাত্মার শুদ্ধসত্তা-নির্ম্মল-রাজ্য উপভোগ করিতাম, যে আত্মা বিশুদ্ধ চৈতন্যের পূর্ণ বিকাশে স্বচ্ছ, তাহা আমাদিগের নিকট পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসুক; আমাদিগের যে চক্ষুঃ জড় জগতের বাহ্য শোভাকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ ও অসদ্বোধে চক্ষু-স্বরূপ ভগচ্চরণারবিন্দ-দর্শনে কৃতকৃত্য হইত, আমাদের যে কর্ণ মঙ্গলময়ের মঙ্গল গান শুনিয়া, বিষয়-বিষ-বহ্নি-নির্ব্বাণকারী, দুঃখ-সন্তাপহারী, হরিগুণ-লহরী শুনিয়া, আনন্দিত হইত, সেই চক্ষুঃ, সেই কর্ণ, আমাদিগের নষ্ট হইয়াছে, তাহা আমরা পুনঃ প্রাপ্ত হই; তাহা হইলেই, সভ্য মহোদয়গণ! জানিবেন, হত-চেতন ভারতের জীবনী শক্তির পুনঃ

সঞ্চার হইবে। জীবনের জীবন! যে তুমি ভারতের অন্তরে বাস করিতেছ! হে চৈতন্য-স্বরূপ! একবার সেই তুমি দয়া করিয়া অচেতন ভারতের চেতনা-সঞ্চার করিয়া দাও! দুর্ভাগ্য ভারত—বিপন্ন ভারত—তোমার চিরশরণাগত! তোমারই কৃপায় ভারত সকল সুখের মুখ দেখিয়াছে। হে ভক্ত-ভয়ার্ত্তি-ভঞ্জন! একবার সদয়-দৃষ্টি-পাত কর, আমরা তোমার বিশ্ব-বিমোহন ভক্ত-কুল-পাবন মনোহর রূপের পূর্ণ বিকাশ দর্শনে কৃতার্থ হইয়া যাই!!

ওঁ হরিঃ ওঁ।

ভারতে ধর্ম্ম-প্রচার। *

ধর্ম্মেণৈব জগৎ সুরক্ষিতমিদং ধর্ম্মোধরাধারকঃ।
ধর্ম্মাদ্বস্তু ন কিঞ্চিদস্তি ভুবনে ধর্ম্মায় তস্মৈ নমঃ॥

শিক্ষিত সভ্য মহোদয়গণ! কোন পুণ্যবান্ রাজার রাজ্যে এক ধর্ম্মশীল ব্রাহ্মণ-দম্পতি বাস করিতেন। ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ, বিদ্যাবান্ ও স্বাধ্যায়-নিরত ছিলেন। কিন্তু দরিদ্রতা-নিবন্ধন তাঁহার বিদ্যা ও পাণ্ডিত্য লোক-সমাজে বিশেষরূপে পরিগৃহীত বা সমাদৃত হয় নাই। সদনুষ্ঠান, স্বাধ্যায় ও শাস্ত্রাধ্যয়নের গুণে তাঁহার হৃদয়ে যে তেজস্বিতার সঞ্চার হইয়াছিল, তাহাতেই তিনি কোথাও নিজ গুণ-গরিমা প্রচার করিতে বা কাহারও নিকট কিছু যাচ্ঞা করিতে পারিতেন না। শাস্ত্রার্থ-জ্ঞানের বিনিময়ে ধনোপার্জ্জন করা তিনি লঘুতা ও নীচাশয়তা মনে করিতেন। অর্থ বিনা সংসার চলা ভার। এই জন্য ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণের নিকট অনেক সময় ক্ষুণ্ন মনে ক্ষোভ প্রকাশ করিতেন, এবং অর্থোপার্জ্জনের জন্য ব্রাহ্মণকে বারংবার উত্তেজনাও করিতেন। ব্রাহ্মণ ধনের জন্য কোথায় যাইবেন, কি করিবেন, কিরূপে ধন আসিবে, কে তাঁহাকে ধন দিবে, ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন

---

* ১৭৯৯ শকে মুঙ্গের আর্য্য-ধর্ম্ম-প্রচারিণী সভায় পরিব্রাজক মহাশয় এই বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতার পর হইতেই উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের সনাতন-ধর্ম্মের পুনঃ প্রচারের কার্য্য আরম্ভ হইল। এই বক্তৃতা শুনিবার জন্য স্থানীয় ও বিদেশীয় অনেক ধনবান্, বিদ্যাবান্, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। পরিব্রাজক মহাশয়ের পাঠ্যাবস্থার সহাধ্যায়ী কাশিম-বাজারবাসী ৺ রায় অন্নদা-প্রসাদ বাহাদুর মহাশয় এই বক্তৃতা-সভায় সভাপতি ছিলেন। তিনি সেই দিন প্রচার-কার্য্যের সাহায্যার্থ ৪০০০৲ টাকা স্বাক্ষর করেন।

না। এক দিন ব্রাহ্মণী পরামর্শ দিলেন, যে, আমাদের রাজা বিদ্যাবান্, বিদ্যানুরাগী, গুণগ্রাহী ও বদান্য। তাঁহার রাজসভায় অনেক পণ্ডিত প্রতিপালিত হইয়া থাকেন। তুমি সেই রাজসভায় গমন কর, আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। ব্রাহ্মণ বলিলেন, আমি রাজ-সমীপে ধনের জন্য প্রার্থনা করিতে পারিব না, তবে রাজা আমাকে ধন দিবেন কেন? ব্রাহ্মণী বলিলেন, তিনি গুণজ্ঞ, তোমাকে বিদ্যাবান্ ও অপ্রার্থী দেখিয়া তিনি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়াই তোমাকে পুরস্কার দান করিবেন। ব্রাহ্মণ ধৌত বস্ত্র পরিধান করিয়া ধীরে ধীরে রাজসভায় গমন করিতে লাগিলেন। পথি মধ্যে এক স্থানে একহস্ত-পরিমিত-গভীর একটী সামান্য জল-প্রবাহ বহিয়া যাইতেছিল, দীন দুর্ব্বল ব্রাহ্মণ সেই সামান্য জলসিক্ত পিচ্ছিল ভূমিতে পড়িয়া গেলেন, এবং জল ও মৃত্তিকায় তাঁহার ধৌত বসন সিক্ত ও মলিন হইয়া গেল। নিরুপায় ব্রাহ্মণ সেই মলিন বেশেই রাজ-সকাশে উপস্থিত ও সভাস্থ পণ্ডিত-মণ্ডলী মধ্যে উপবিষ্ট হইলেন। অন্যান্য পণ্ডিত-বর্গের মধ্যে অনেক শাস্ত্রালাপ হইল, কিন্তু এ ব্রাহ্মণের দিকে কেহ দৃষ্টিপাতও করিল না। অন্যের দৃষ্টি না পড়িলেও সুচতুর ও নীতিজ্ঞ রাজার দৃষ্টি পড়িয়াছিল। সভা-ভঙ্গকালে যখন ব্রাহ্মণ রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া আসিতেছিলেন, সেই সময়ে রাজা তাঁহার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "সেই আর এই"। ব্রাহ্মণ রাজার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন না, নীরবে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। ব্রাহ্মণী রাজসভার সমাচার জিজ্ঞাসা করিলে, ব্রাহ্মণ পিচ্ছিল ভূমিতে পতন, মলিন

বেশে সভায় গমন, "সেই আর এই" রাজার সঙ্কেত-বাণী আদির পরিচয় দিলেন এবং ধন পাওয়া গেল না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন। ব্রাহ্মণী বলিলেন, রাজার কথার উত্তর দিতে পারিয়াছিলে ? ব্রাহ্মণ বলিলেন, আমি রাজার সঙ্কেত কিছুই বুঝিতে পারি নাই, উত্তর দিব কি ? ব্রাহ্মণী বলিলেন, রাজা ধন দিন, বা নাই দিন, রাজাকে কথার উত্তর দেওয়া চাই। তুমি কাল পুনর্ব্বার সভায় গমন করিও। মহারাজ সিংহাসনে বসিলে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিও যে, মহারাজ! একটী জলপূর্ণ জলপাত্র আর এক খণ্ড ক্ষুদ্র শিলা আনিতে কাহাকেও আদেশ করুন। এতাবৎ আনীত হইলে ঐ শিলাখণ্ডটী মহারাজকে স্বহস্তে জলে ফেলিতে অনুরোধ করিবে। শিলাটী জলে নিক্ষিপ্ত ও নিমগ্ন হইয়া গেলে তুমি বলিবে, মহারাজ! "এই আর সেই!" ইহাতেই মহারাজের সঙ্কেতবাণীর সাঙ্কেতিক উত্তর হইবে। ব্রাহ্মণ বুদ্ধিমতী স্ত্রীর কথানুসারে সভাস্থ হইয়া, স্ত্রীর পরামর্শানুসারে মহারাজকে জল ও শিলা আনাইতে বলিলেন, এবং জলে শিলা ডুবিয়া গেলে ব্রাহ্মণ বলিলেন, মহারাজ! "এই আর সেই"! মহারাজ ব্রাহ্মণের মুখে এই কথা শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে অতিশয় বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত জানিয়া তাঁহাকে সভাপণ্ডিত-শ্রেণীভুক্ত করিলেন এবং দৈনিক দুই টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণীর বুদ্ধিতে ব্রাহ্মণের কপাল ফিরিয়া গেল। কিন্তু সভাস্থ পণ্ডিত ও অমাত্যবর্গের মধ্যে কেহই এই সাঙ্কেতিক বাঙ্‌বিনিময়ের মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন না। ইহার গুহ্য মর্ম্ম বুঝিয়াছিলেন

ব্রাহ্মণী, আর বুঝিলেন মহারাজ। অকস্মাৎ একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণের কপাল ফিরিতে দেখিয়া পণ্ডিতগণ পরস্পর মুখ তাকাতাকি করিতে লাগিলেন, এবং সকলে রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ! কোন্ গুণে এই সামান্য ব্রাহ্মণ এরূপ পুরস্কৃত হইল? মহারাজ বলিলেন, ইহাঁর পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধিমত্তা অতি অদ্ভুত ও প্রশংসনীয়। আমি উহাঁকে কল্য বলিয়াছিলাম, "সেই আর এই!" তদুত্তরে উনি আজ যথাযথ উত্তর দিয়াছেন, "এই আর সেই!" পণ্ডিতগণ বলিলেন এ দুটীর একটী কথারও মর্ম্ম আমরা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। মহারাজ বলিলেন যে, এই জন্যই বলিতেছি উনি অতি পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান্। আপনাদিগের কাহারও বুদ্ধিতে যাহা আসিল না, তাহা উনি বুঝিয়াছেন। ব্রাহ্মণীর বুদ্ধিতে বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতজীও অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন; বস্তুতঃ তিনিও কিছু বুঝেন নাই। পণ্ডিত-মণ্ডলী জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ! এই প্রহেলিকার মর্ম্ম আমাদিগকে বুঝাইয়া দিন। তাহাতে মহারাজ বলিলেন যে, আমি গত কল্য ব্রাহ্মণকে অত্যল্প জলে পতিত জানিয়া ও সিক্তবস্ত্রে সমাগত দেখিয়া বলিয়াছিলাম, "সেই আর এই!" অর্থাৎ, হে ব্রাহ্মণ! যে ব্রাহ্মণ-কুলে অগস্ত্য ঋষি জন্মগ্রহণ করিয়া একমাত্র গণ্ডূষে সপ্তসমুদ্র শোষণ করিয়াছিলেন, আপনি সেই ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া এরূপ হীনবীর্য্য ও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছেন যে, সামান্য জলে লুটাপুটী খাইতে হইল! তাহাতে পণ্ডিত মহাত্মা আমার হস্ত-নিক্ষিপ্ত শিলাকে জলে নিমগ্ন হইতে দেখিয়া বলিলেন, "এই আর

সেই!" অর্থাৎ, যে ক্ষত্রিয়-কুলে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়া সমুদ্র-জলের উপর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গিরি-শৃঙ্গ ভাসাইয়া সেতু নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তুমি সেই ক্ষত্রিয়-কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া অত্যল্প জলে এই সামান্য শিলাখণ্ডটী ভাসাইতে পারিলে না। বস্তুতঃ, আমি যেমন বর্ত্তমান অতপস্ক ব্রাহ্মণ-কুলকে ধিক্কার দিয়াছিলাম, উনিও তদ্রূপ নির্বীর্য্য ক্ষত্রিয়-কুলকে উপহাস সহ ধিক্কার দিয়াছেন। অর্থাৎ, বর্ত্তমান কালে পূর্ব্বের ন্যায় ব্রাহ্মণও নাই, পূর্ব্বের ন্যায় ক্ষত্রিয়ও নাই। সকলেই বিষ-বিহীন বিষধর। সভ্য মহোদয়গণ! আপনা-রাও হয় তো আমার ন্যায় একজন সামান্য ব্যক্তিকে ধর্ম্ম-প্রচার-ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান দেখিয়া মনে মনে বলিবেন, "সেই আর এই!" অর্থাৎ, যে ক্ষেত্রকে সুশোভিত ও পবিত্র করিয়া শুক শৌনকাদি উপদেশ দান করিতেন, যে ক্ষেত্রকে উজ্জ্বল করিয়া ব্যাস বসিষ্ঠাদি শিক্ষা-সুধা-বৃষ্টি করিতেন, যে ক্ষেত্রকে গৌরব-যুক্ত করিয়া জনক যাজ্ঞবল্ক্যাদি জ্ঞানামৃত বিতরণ করিতেন, আজ সেই স্থানে দণ্ডায়মান একজন সামান্য নগণ্য পুরুষ। আপনারা তাঁহাদিগের শাস্ত্রোক্ত কথামৃত-রাশি পান করিয়াছেন, আর এই নগণ্য ব্যক্তির মলিন মস্তিষ্কের ক্ষুদ্র-চিন্তা-প্রসূত সামান্য কথা শুনিয়া হয় তো বলিবেন, "সেই আর এই!" পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের দিগ্বিজয়-বাণী আক-র্ণন করিয়াছেন, কাঙ্গালের সখা শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গদেবের প্রেম-সুধামাখা হরি-কথা শ্রবণ করিয়াছেন, আর এখন এই নগণ্য সামান্য ব্যক্তির সামান্য বাক্য শ্রবণ করিয়া হয় তো মনে মনে বলিবেন, "সেই আর এই!" বস্তুতঃ, মহাত্মাগণ! আমি

তাহাদের আসনে দাঁড়াই নাই। কৈকয়ী-কুমার ভরত যেমন ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের চরণ-পাদুকা সিংহাসনে রাখিয়া পূজা করিতেন, এই নগণ্য পুরুষও তেমনি মহর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষি আদির পূজ্য বেদিকাকে দেব-দুর্লভ সিদ্ধপীঠ জানিয়া, প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহাদের সেবকের স্থান অধিকার করিয়া, তাঁহাদেরই কথার প্রতিধ্বনি করিবার জন্য, ভবাদৃশ সজ্জন সাধুহৃদয়বর্গের সেবা করিবার জন্য, এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান। যেমন গৃহে চৌর প্রবেশ করিলে গৃহপালিত কুক্কুর চীৎকার করিয়া গৃহস্থকে জাগাইয়া দেয়, এই নগণ্য ব্যক্তিও তদ্বৎ চীৎকার করিয়া আর্য্যদিগের অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী ভবাদৃশ ভারতবাসীকে স্ব স্ব পরমধন-রক্ষার্থ আহ্বান করিবার জন্য দণ্ডায়মান। আমার শোক-সম্বেগ-পূর্ণ তীব্র ধ্বনিতে কেহ ক্লেশ বোধ না করেন, ইহাই আমার প্রার্থনা। আমার ন্যায় দীনার্ত্তিদীনের দাসত্ব করিবার অধিকার আছে বলিয়াই, ভগবান্ আজ আমাকে ভারতের সেবাধিকারী করিয়াছেন। আজ আমার বক্তব্য বিষয় "ভারতে ধর্ম্ম-প্রচার"। ধীর ভাবে ভারতে এই নগণ্য সেবকের কথায় কর্ণপাত করিলে কৃতার্থ হইব। উপদেশ দিবার জন্য দণ্ডায়মান হই নাই। আমার নানা কথার মধ্যে যদি একটী কথাও ভারতহিতৈষী চিন্তাশীল পুরুষবর্গের সাধুকার্য্য-ক্ষেত্রের কিছু সহায়তা করে, তাহা হইলেই কৃতার্থ হইব।

সাধুহৃদয় সভ্য মহোদয়গণ! আজ কাল ভারতবর্ষে হিন্দু ধর্ম্ম, বৌদ্ধ ধর্ম্ম, জৈন ধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম, খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রভৃতি বিবিধ নামের ধর্ম্ম প্রচলিত রহিয়াছে।

আমরা কেবল "ধর্ম্ম-প্রচার" এইরূপ শব্দ প্রয়োগ করায়, হয় তো অনেকে "এ কোন্ ধর্ম্ম-প্রচার," ইহা অনায়াসে হৃদ্গত করিতে পারিবেন না। আর্য্য ঋষি, মুনি, তপস্বীগণ বেদ-বেদান্ত-প্রকাশ, ও অষ্টাদশ পুরাণ, সংহিতা, তন্ত্রাদির প্রণয়ন দ্বারা যে ধর্ম্মের বহুল প্রচার করিয়া ভারতবর্ষের মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন, সেই পরম পবিত্র ধর্ম্ম-প্রচারই আমাদের লক্ষ্য। ঋষিগণের কঠোর তপস্যারূপ অতিশয় দৃঢ় ও সুন্দর মর্ম্মরময় ভিত্তি-ভূমির উপর সত্য, আত্মনিষ্ঠা প্রভৃতিরূপ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্ফটিক স্তম্ভাবলি পরিশোভিত বিবিধ-রত্নরাজি-বেষ্টিত ব্রহ্মবোধরূপ কৌস্তুভ-মণি-জড়িত এই ধর্ম্মরূপ মন্দিরে কাল-স্বভাব-প্রযুক্ত যে মালিন্য-রাশি পতিত হইয়াছে, ধর্ম্ম-প্রচার দ্বারা তাহাই পরিষ্কার করিয়া ইহার স্বাভাবিক জ্যোতিঃ ও সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতে হইবে। মন্দিরের কোন অংশই ভগ্ন হয় নাই, ইহা সংস্কার করিবার কোন প্রয়োজনই দেখিতেছি না; তবে কোন কোন শিল্পী (সমাজ বা ধর্ম্ম-সংস্কারক) ইতি পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক এই লক্ষ্য-সাধন করিতে গিয়া কোন কোন স্থানের পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছিলেন, তৎসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া আদিম গঠনের সঙ্গে ঠিক মিলাইতে না পারায়, সে গুলি মনোহর মন্দিরের বিকৃতি প্রতিপাদন করিতেছে। কোন কোন ধর্ম্ম-মত-মল-মার্জ্জনকারী অসাবধানতা ও ব্যস্ততা প্রযুক্ত মার্জ্জন-দণ্ডের আঘাতে মন্দিরের কার্ণিস্ (ধর্ম্ম-সাধন-প্রণালী) ফাটাইয়া দিয়াছেন, কোথাও বা বহুমূল্য বিশাল ঝাড়, লণ্ঠন (সামাজিক প্রণালী) ভাঙ্গিয়া

ফেলিয়াছেন। বর্ত্তিকা-উত্তেজনার দ্বারা দীপ-শিখা উজ্জ্বল করিতে গিয়া তাহা নির্ব্বাণ করিয়া বসিয়াছেন। অশিক্ষিত চিকিৎসকের ন্যায় স্ফোটক অস্ত্র করিতে গিয়া অসাবধানতা প্রযুক্ত প্রধানা রক্ত-বাহিনী নাড়ী ছেদন করিয়া ফেলিয়াছেন। মশক মারিতে চপেটাঘাত করিলেন, মশক উড়িয়া অন্য শরীরে বসিল, চপেটাঘাত প্রথম ব্যক্তির শরীরকে বেদনা-যুক্ত করিল মাত্র। অনেক ধর্ম্ম-সংস্কারক এইরূপ অবস্থায় পতিত হইয়া এই ধর্ম্মরূপ মন্দিরের মনোহর শোভার বৃদ্ধির পরিবর্ত্তে হানি করিয়াছেন। দীর্ঘসূত্রী হইয়া ধীরে ধীরে একটী কার্য্য যদি সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করা যায়, তাহাও বরং উত্তম, তথাচ উদ্যমশীলতা দেখাইতে গিয়া ব্যস্ততা বশতঃ কার্য্যের হানি করা কর্ত্তব্য নহে। বৃদ্ধ ঋষিগণের নিকট জ্ঞান-গর্ভ উপদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক ধীরে ধীরে সাধারণের হিতার্থে বোধ-সুলভ উপায় দ্বারা তাঁহাদের গভীর ভাব ভারতে প্রচার করাই এখন আবশ্যক।

আমরা আমাদের প্রচর্ত্তব্য ধর্ম্মের নাম "আর্য্য ধর্ম্ম" বা "হিন্দু ধর্ম্ম" দিলে দিতে পারিতাম; কিন্তু যখন বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, সংহিতা, তন্ত্র প্রভৃতি আমাদিগের প্রাচীন ধর্ম্মতত্ত্ব-পূর্ণ গ্রন্থাদি পর্য্যালোচনা করা যায়, তখন কুত্রাপি "ধর্ম্ম" এই প্রশস্ত শব্দ ভিন্ন "হিন্দু" বা "আর্য্য ধর্ম্ম" এরূপ শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল ইংরাজি, পারস্য, ও অধুনাতন হিন্দী ও বাঙ্গালা গ্রন্থাদিতে এইরূপ শব্দ লিখিত আছে মাত্র। "হিন্দু ধর্ম্ম" বা "আর্য্য ধর্ম্ম" এ দুটী নাম আধুনিক, এজন্য আমরা আমাদিগের চিরপ্রচলিত ও

চিরসম্মানিত ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত "ধর্ম্ম" এই প্রশস্ত নাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক আধুনিক নাম-করণ দ্বারা ভক্তিভাজন শাস্ত্রবেত্তাগণের বিরোধে বাক্যবিন্যাসে বাসনা করি না। বিশেষতঃ "হিন্দু" এই শব্দটী পারস্য ভাষার; ইহার অর্থ "কাফের," "কৃষ্ণবর্ণ," "বিধর্ম্মী"। মুসলমানগণ সিন্ধুনদ-পরপারবর্ত্তীগণকে "হিন্দু" বা "কাফের" বলিত, এবং তাহা হইতেই ভারতবর্ষকে "হিন্দুস্থান" বা "কাফেরদিগের বাসস্থান" বলিয়া নাম দেওয়া হয়। মুসলমানগণের প্রাদুর্ভাব-কালে তাহাদের কঠোর শাসন-ভয়ে ভারতবাসীগণ রাজ-জাতির গৌরব-ব্যাখ্যা-ছলে আপনারা "হিন্দু" বা "কাফের" এই ঘৃণাকর পরিচয় দানে বাধ্য হইয়াছিলেন। কালক্রমে "হিন্দু" শব্দটীর অর্থবোধহীনতা-প্রযুক্ত উহা আমাদিগের গৌরব-বাচক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা এখনও "হিন্দু" বলিতে আহ্লাদ প্রকাশ করি। এই কথাটী আহ্লাদের সহিত পরিচয় দিবার সময় যদি একজন পারস্য-ভাষাবিদ্ (মৌলুবী) শুনিতে পান, তবে তিনি মনে মনে কতই হাস্য করিয়া থাকেন। অতএব "হিন্দু" নাম ধারণ করিয়া আমাদের গৌরবের পরিচয় দেওয়া হয় না। এজন্য আজ কাল পণ্ডিত ও শিক্ষিত সম্প্রদায় 'হিন্দুধর্ম্ম" এই শব্দের পরিবর্ত্তে "আর্য্য ধর্ম্ম" বা "সনাতন ধর্ম্ম" ব্যবহার করিয়া থাকেন। এটী বরং কিয়ৎ পরিমাণে প্রশস্ত। কেন না, বর্ত্তমানকাল-প্রচলিত বহু ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ করিয়া বলিতে হইলে 'আর্য্য ধর্ম্ম" অর্থাৎ, আমাদিগের পরমশ্রদ্ধাস্পদ আর্য্যগণের চিরাচরিত "সনাতন ধর্ম্ম" এইরূপ ব্যাখ্যা ভিন্ন অন্য

উপায় নাই। এ নামটী দ্বারা ভারতের জাতীয় গৌরব-রক্ষা হইল বটে, কিন্তু ইহা যে আধুনিক পণ্ডিত-সমাজ-কল্পিত, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। শাস্ত্র-কর্ত্তৃ-গণের উক্ত কেবল "ধর্ম্ম" নামটী যেমন উদার ও প্রশস্ত, মনুষ্যের প্রকৃতিসিদ্ধ ও আদিম ভাবের পরিচায়ক, "আর্য্য ধর্ম্ম" শব্দটী তদ্রূপ নহে। তথাচ হয়তো আমরা আমাদের "ধর্ম্মকে" উপধর্ম্ম ও অপধর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে "আর্য্য ধর্ম্ম" বলিয়া উল্লেখ করিতে বাধ্য হইব।

যে দিন হইতে ভারতবর্ষ আর্য্যজাতির অধিকার-চ্যুত হইয়া পরাধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছে, সেই দিন হইতেই সৌভাগ্য-লক্ষ্মী ভারতের প্রতি বাম হইয়াছেন। পদে পদে বিপত্তি, দুরবস্থা ও হীনতা ইহার চিরগৌরব-বিনাশ করিতেছে। ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতির প্রবল পরাক্রম, দিগ্বি-জয় নিনাদ, শিল্প নৈপুণ্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান-শাস্ত্রালোচনা প্রভৃতি পৃথিবীস্থ যে সকল জাতিকে প্রথমতঃ বিস্ময়াপন্ন করিয়া রাখি-য়াছিল, আর্য্যজাতির প্রচণ্ড প্রতাপ-কালে যে সকল জাতি অরণ্যবাসী অসভ্য ছিল, আজ সেই সকল জাতি দর্পসহ-কারে ভারতের প্রতি কূট কটাক্ষপাত করিতেছে, সেই সকল জাতি ভারতকে জ্ঞানালোক-বিহীন ও অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন বলিয়া ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য করিতেছে। ভারতও অধোমুখে তাহা সহ্য করিয়া দুর্ভাগ্যদুঃখ-ব্যথিতান্তঃকরণে নিজ ধর্ম্ম-বীরগণের সহিষ্ণুতা-গুণে মহত্ত্বের পরিচয় দিতেছে। বস্তুতঃ, ভারতের সে দিন নাই, সে অবস্থা নাই, সে ভাব নাই, সে তেজোবীর্য্য, সে শৌর্য্য গাম্ভীর্য্য নাই, ভারতে আর গৌরব

করিবার কিছুই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভারতবর্ষ রাজ্য-শাসন-স্বাধীনতার আশায় তো জলাঞ্জলি দিয়া বসিয়াছে। সাহস নাই, বীরত্ব নাই, পরস্পর একতা নাই; অগত্যা কিছু দিন মুসলমানগণের কঠোর শাসনে নিপীড়িত হইয়া আপাততঃ-অপেক্ষাকৃত সৌভাগ্যক্রমে আমরা ইংরাজ জাতির সুশাসনে দিন যাপন করিতেছি। ভারতীয় আর্য্যগণের নিকট প্রাপ্ত "ধর্ম্ম-ধন" ভিন্ন আর আমরা কিছুই স্বেচ্ছাক্রমে ভোগ করিতে পাইতেছি না। তাহাও আবার বৌদ্ধগণের প্রভাবে অতিশয় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল। পূজ্যপাদ মহাত্মা শ্রীমচ্ছঙ্করচার্য্যের বিপুল তেজঃ ও তপোবলে শাস্ত্রার্থ-পূর্ণ জ্বলন্ত যুক্তি-যোগ-জালে উহা পুনরুদ্ধৃত হয়। মুসলমান রাজত্বের খরশান-কৃপাণ-তাড়নায় অনেক সামাজিক রীতিনীতি বিশৃঙ্খলাযুক্ত হইয়া গিয়াছিল, তৎপরে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-যাজকগণও কদর্থ-ব্যাখ্যায় কিয়ৎ পরিমাণে আর্য্য ধর্ম্মকে প্রভা-হীন করিয়া তুলিয়াছেন। মৃত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় বৈদান্তিক ও অন্যান্য শাস্ত্রোক্ত জ্ঞান-কাণ্ডীয় প্রণালী সাধারণ-সমীপে প্রচার দ্বারা যেরূপ সমাজ ও ধর্ম্ম-সংস্কার এবং ভারতের উন্নতির আশা করিয়াছিলেন, তাহাতে সুফল ফলিল না। ব্রাহ্মমণ্ডলী সনাতন-ধর্ম্মীগণের আচার ব্যবহারের প্রতি হস্তক্ষেপ পূর্ব্বক সমাজকে কেবল ক্রমশঃ বিকৃত ও অপর একটী নূতন সম্প্রদায় গঠন করিয়া তুলিতেছেন। এইরূপে আর্য্যজাতির একমাত্র গৌরব-চিহ্ন ধর্ম্ম-ভাবটী দিন দিন মলিন ভাব ধারণ করায়, ইহার পূর্ব্বতন প্রাকৃতিক প্রভা হীন হইতেছে। ইসলাম ধর্ম্মের প্রচার জন্য

মুসলমান সম্রাট্‌গণ সনাতন-ধর্ম্ম-সেবকগণের মস্তক-ছেদনের ভয় দেখাইতেন। বর্ত্তমান ইংরাজ শাসনকর্ত্তৃবর্গ বাহ্যতঃ মস্তক ছেদন করেন না, কিন্তু কৌশল-পূর্ণ শিক্ষা-প্রণালীর ছুরিকা চালাইয়া মস্তকের ভিতর মস্তিষ্ক বিকৃত করিয়া দেন, বা ভাষা কথায়, মাথা খাইয়া দেন। শিক্ষা-প্রণালীর দোষে সমাজ মলিন হইয়া যাইতেছে।

যেমন সূর্য্য নিজ রশ্মিজাল বিস্তার পূর্ব্বক সাগরাম্বু-রাশিকে বাষ্পাকারে আকর্ষণ করতঃ নিবিড় নীরদ-নিকর-নির্ম্মাণ ও তদ্দারা আপনাকে তমসাচ্ছন্ন ও পৃথিবীকে তিমিরাবৃত করেন, আবার স্বীয় উষ্ণতা-সহযোগেই বর্ষাবারিপাতে আপনিই নির্ম্মুক্ত হয়েন, তদ্রূপ পরম পরাৎপর ভগবান্ নিজ মহীয়সী মায়াতেই আপনাকে আপনি আচ্ছন্ন ও জগৎকে অজ্ঞানজালে অন্ধ করেন, আবার আপনিই সাধুহৃদয়কুঞ্জে প্রকাশিত হইয়া তাঁহার পূর্ণ-জ্ঞান-প্রভাবে জগৎকে জ্ঞান-শিক্ষা দিয়া আপনার অচিন্তনীয় লীলার পরিচয় দিয়া থাকেন।

আজ কাল চারি দিকে ধর্ম্ম-বিপ্লব উপস্থিত হওয়ায়, স্থানে স্থানে মহাত্মাগণের যত্নে ধর্ম্ম-সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। পুরাকালে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই সনাতন-ধর্ম্মের প্রভূত প্রচার ছিল, কিন্তু আপাততঃ সর্ব্ব স্থানেই ইহার দুরবস্থা ঘটিয়াছে, তাহার পুনরুদ্ধার অর্থাৎ সাময়িক উপদ্রব-রাশি দূরীকরণ জন্য এক একটী প্রধান প্রধান স্থানে এক একটী সভা-স্থাপন মাত্র করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। বিশেষতঃ তন্মধ্যে কোন কোন ধর্ম্ম-সভা পরধর্ম্মদ্বেষ ও ঈর্শাভাব-শূন্য

হইয়া কার্য্য করিতে না পারায়, ও সাধারণের আধ্যাত্মিক তমোরাশি নিরাকরণের দিকে বিশেষ দৃষ্টি না করায়, সনাতন-ধর্ম্ম-প্রচার দ্বারা ভারতের পূর্ব্ব গৌরব পুনরুদ্ধার এবং স্বদেশের হিত ও উন্নতি সাধন করিতে পারিতেছেন না। এক্ষণে কেবল কতকগুলি সভার মুখাপেক্ষা করিয়া সুশিক্ষিত আর্য্যধর্ম্মাবলম্বীগণের নিশ্চিন্ত থাকিবার আর সময় নাই। যাহার সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত, তাহার এক অঙ্গে একটু প্রলেপ দিলে আশা পূর্ণ হইতে পারে না। যাহাতে সর্ব্বাঙ্গে ঔষধ প্রযুক্ত হয় তদ্বিষয়ে যত্নশীল হওয়া আবশ্যক। এক্ষণে সর্ব্বত্রই সনাতন-ধর্ম্ম-ভাবকে পুনরুদ্দীপিত করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, "আর্য্য ধর্ম্ম আধুনিক নহে, অপ্রতর্ক্য সময় হইতেই ইহার গৌরব অব্যাহত আছে, অতএব খৃষ্টীয় ধর্ম্মাদির প্রচারের ন্যায় উহা প্রচার করিবার চেষ্টা করিলে সনাতন-ধর্ম্মের গৌরব-হ্রাস হইবে"। কেহ কেহ বা বলিয়া থাকেন যে, "ধর্ম্ম-সভা বা বক্তৃতাদি দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার করা প্রাচীন কালে ছিল না, এটী বর্ত্তমান কালের ইংরাজদিগের অনুকৃত পদ্ধতি"। এ সকল কথা কতদূর সারবান তাহা বিচক্ষণগণ বিচার করিবেন। আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, ভারতবর্ষীয় পুরাতন ধর্ম্মবীরবর্গ ধর্ম্ম-প্রচারের এত আবশ্যকতা-বোধ করিয়াছিলেন যে, অন্যত্র ততদূর এখনও উহার উদয় হইয়াছে কি না সন্দেহ। পূর্ব্বতন ঋষিগণ সাধারণ্যে ধর্ম্ম-প্রচার দ্বারা অশেষ কল্যাণসাধন জন্য সর্ব্বদাই সযত্ন ছিলেন। প্রথম দৃষ্টিতে বোধ হয়

বটে যে, তাঁহারা লোক-সমাজের প্রতি উদাসীন হইয়া একান্তে তপস্যা করিতেন ও অন্যের মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি-পাত করিতেন না; কিন্তু বিশেষরূপে প্রণিধান করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, সামাজিক লোকগণ অপেক্ষা তাঁহারা অধিক পরিমাণে পরহিতৈষী ছিলেন। যেমন লোক সকল নিজ পরিবারগণের প্রতিপালন জন্য অর্থোপার্জ্জনের উদ্দেশে একাকী বিদেশে বাস করে, ঋষিগণও প্রায় তদ্রূপ স্বকীয় ও পরকীয় মঙ্গল জন্য নির্জ্জন নিবিড় বনে বাস করিয়া তপস্যা ও যোগযাগ করিতেন। তাঁহাদের ইহা সম্পূর্ণ ধারণা ছিল যে, সাধারণকে মহান্ করিতে ইচ্ছা করিলে প্রথমে আপনাকে মহৎ হইতে হইবে, অন্যকে শিক্ষা দান করিতে হইলে প্রথমে আপনাকে সুশিক্ষিত হইতে হইবে, অপরকে উন্নত করিতে হইলে প্রথমে আপনার উন্নতি সাধন করিতে হইবে। এই জন্যই তাঁহারা প্রথমে আপনাদিগের উন্নতি-সাধন জন্য তপস্যা করিয়া অবশেষে সাধারণের প্রতি কর্ত্তব্য-সাধনের উপায় অবলম্বন করিতেন। তাঁহাদিগের কার্য্য-প্রণালীর ইতিহাস উচ্চৈঃস্বরে ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তজ্জন্য তাঁহাদিগকে স্বার্থপর, অনুদার, চেষ্টা-শূন্য বা ধর্ম্ম-প্রচার-পরাঙ্মুখ বলিয়া দোষারোপ করা ন্যায়-সঙ্গত বোধ হয় না। তাঁহারা ভগবৎ-সাধনা দ্বারা অমূল্য জ্ঞান-রত্নরাশি উপার্জ্জন করিতেন, শাস্ত্রাদি-প্রণয়ন দ্বারা, মধ্যে মধ্যে কৃপা-পরবশ হইয়া, রাজসভা বা যজ্ঞক্ষেত্রাদিতে সমাগত হইয়া, উপদেশ-দান দ্বারা, সাধারণকে উপকৃত করি-তেন। বিশেষ বিশেষ পর্ব্বাহে তীর্থস্থান-বিশেষ-যাত্রার

পুণ্য-মহিমা-বর্ণনা ও ধর্ম্ম-প্রচারের একটী প্রশস্ত উপায় স্থির করিয়াছিলেন, অর্থাৎ, তীর্থ-সমাগম-ছলে সময়ে সময়ে এক এক মহতী সভার আহ্বান করিতেন। দিগ্দিগন্ত হইতে ধর্ম্ম-পিপাসু গৃহস্থ ও ধর্ম্মতত্ত্ববেত্তা সাধুগণের একত্র সম্মিলনে ভগবদ্বিষয়ের আলোচনা ও সংক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইত। ঋষিগণ স্ব স্ব মহদ্গুণে ভূপতিগণকে একান্তানুগত করিয়া তাঁহাদিগের দ্বারাই রাজনীতির সহিত ধর্ম্মনীতি, চিকিৎসক-গণের স্বাস্থ্য-বিধান-শাস্ত্রের সহিত ধর্ম্মশাস্ত্রের আদেশ প্রচার করিতেন। ধর্ম্ম-বিপ্লবের প্রশস্ত কাল কলিযুগ উপস্থিত হইলে, ধর্ম্মকে অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য নৈমিষারণ্যে শ্রদ্ধাস্পদ মহর্ষি, মুনি, ও সাধকগণের মহাসমারোহ-পূর্ণ এক মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। যে শাস্ত্রে ধরাতলে অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইলে মধ্যে মধ্যে স্বর্গধামে দেবতাগণেরও সভা-মণ্ডল রচিত হয় বর্ণিত আছে, যে শাস্ত্রে পাপকর্ম্মা দুরাত্মা দৈত্যগণের দুষ্ক্রিয়ায় ধরা মর্ম্মবেদনায় অস্থির হইয়া ব্রহ্মার নিকট আবেদন করেন, ও চতুরানন পাপভারাবতরণ জন্য বিষ্ণু ও শিবাদির সহিত পরামর্শ করেন কথিত আছে, যে শাস্ত্রে অধর্ম্ম-নাশ ও সত্য-ধর্ম্ম-প্রচার জন্য বারংবার ঈশ্ব-রকেও ভূতলে অবতীর্ণ হইবার আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, যে শাস্ত্রে ভগবান্ নিজমুখে "ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে" বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সেই সনা-তন-ধর্ম্ম-শাস্ত্র-প্রণেতা ও ধর্ম্মগতপ্রাণ আর্য্যগণ যে ধর্ম্ম-প্রচারের কতদূর আবশ্যকতা বুঝিয়াছিলেন, তাহা আমরা ধারণা করিতেও অসমর্থ। হরিদ্বারে, প্রয়াগ আদি মহা-

মহাতীর্থ-স্থানে প্রতি ষষ্ঠ বা প্রতি দ্বাদশবর্ষে যে মহামেলা হইয়া থাকে; যে মেলায় বহুসংখ্যক সাধু, সন্ন্যাসী, সাধক, সিদ্ধ মহাপুরুষের সমাগম হয়; যে মেলায় লক্ষ লক্ষ গৃহস্থ স্ত্রী পুরুষ একত্রিত হয়েন; স্নান, পূজা, পাঠ, সাধু-সঙ্গ দ্বারা কয়েক দিন ধরিয়া, কখনও বা এক মাসকাল ধরিয়া যে সৎকথা-প্রসঙ্গ ও ভগবদ্‌গুণানুবাদাদি হইয়া থাকে; সেই মহামেলা-সমূহ কি ধর্ম্ম-প্রচারার্থ মহাসভার কার্য্য-সাধন করে না? বস্তুতঃ, এবম্বিধ নানা ধারায় বিচক্ষণ ও পরিণাম-বিবেকী ঋষিগণ ধর্ম্ম-প্রচারের অতি অমোঘ উপায় সকল অবলম্বন পূর্ব্বক জনসমাজকে ক্রমে ধর্ম্মসমাজ করিয়া তুলিয়াছিলেন। খৃষ্টীয়-ধর্ম্ম-প্রচারকগণের ন্যায়, পথে পথে ভ্রমণ করিবার তাঁহাদিগের আবশ্যক হইত না। এক্ষণে তাদৃশ মহাত্মা-গণের অভাব, ও স্বদেশবাসী ও এতদ্ধর্ম্মাবলম্বী স্বাধীন রাজা না থাকা প্রযুক্ত ধর্ম্ম-প্রচারের পথ রুদ্ধপ্রায় হইয়া গিয়াছে। কেবল কথকতা-পদ্ধতি ও যাত্রার দলের অভিনয় মাত্র সামান্য পথ উন্মুক্ত আছে। ইহা ভারতবর্ষীয় জনসাধারণের কিয়ৎ-পরিমাণে ধর্ম্মভাবোত্তেজনা করে সত্য, কিন্তু ধর্ম্মের সম্পূর্ণ সুচারু চিত্র সর্ব্ব সমক্ষে প্রদর্শন করিতে পারে না। বরং কখন কখন লোক-রঞ্জনার্থ প্রাতঃস্মরণীয় জীবন্মুক্ত দেবর্ষি নারদকে ঝগড়া বাধাইবার পরম গুরু, বশিষ্ঠ আদিকে বিট্‌লে বামুনের ন্যায় বর্ণনা করিয়া, অতি উচ্চ আদর্শ পুরুষগণকে উপহাসাস্পদ করিয়া থাকে। পুরাণ-ব্যাখ্যাতা জগদ্‌গুরু মহর্ষি ব্যাসদেবকে "বাস্‌দেব", ও জীবন্মুক্ত শুকদেবকে "কাশ্‌দেব" সাজাইয়া তাঁহাদের অলৌকিকী মর্য্যাদার মুখে দুরপনেয়

কলঙ্ক-কালিমা মাখাইয়া দেয়। নানা কারণে সনাতন-ধর্ম্ম-প্রচার-মার্গ মলিন ও দুর্গম হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান ভারতে ধর্ম্ম-রাজ্যের এই দুর্ব্বিপত্তি দূর করিবার উপায়-নির্দ্ধারণ জন্য সম্প্রতি প্রায় সর্ব্বত্রই একটী নূতন তরঙ্গ উঠিয়াছে। কাল সহকারে ভূতভাবন ভগবান্ করুণা বিতরণপূর্ব্বক এই কঠিন প্রহেলিকার অবশ্যই মীমাংসা করিয়া দিবেন। তাঁহার করুণা-লাভের জন্য যেন আমাদিগের চেষ্টা ও যত্নের ত্রুটি না হয়।

ভারতবর্ষীয় মহারাজা, রাজা, জমিদার, ধনাঢ্য, ধর্ম্মাত্মা, সাধু, বিদ্যাবান্, বিষয়ী, ও দেশহিতৈষী মাত্রেরই নিকট বিনয় সহকারে প্রার্থনা যে, তাঁহারা ভারতের ও নিজ নিজ গৌরব-রক্ষা, ও ভারত-সৌভাগ্যলক্ষ্মীকে প্রসন্না করিবার নিমিত্ত, ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল-কামনায় সনাতন ধর্ম্মের পুনরুদ্দীপনার্থে যাঁহার যাহা কিছু ক্ষমতা আছে, তাহা ইহাতে নিয়োজিত করুন; অর্থ দ্বারা, বিদ্যা দ্বারা, পরাক্রম দ্বারা, উপদেশ দ্বারা, সদ্দৃষ্টান্ত-প্রদর্শনে সাধারণকে উত্তেজিত ও উদ্বোধিত করুন; যে কোন উপায়ে হউক সনাতন ধর্ম্মের বহুল প্রচারের সহায়তা করুন। যদি কাহারও পীড়া হয়, তবে তাহার পিতা অর্থ ও চেষ্টাদি দ্বারা, মাতা যত্ন দ্বারা, সেবক শুশ্রূষা দ্বারা, বন্ধু বান্ধব সতর্কতা ও সান্ত্বনাদি দ্বারা, চিকিৎসক ঔষধ-ব্যবস্থা দ্বারা, ঔষধ-বিক্রেতা ব্যবস্থা-বিহিত উত্তমৌষধ-দান দ্বারা, পীড়িতের ব্যাধিনাশের সহায়তা করিয়া থাকেন; কেবল এক জনের সাহায্যে তাহার পীড়ারোগ্য দুরাশা মাত্র। এতদ্রূপ মলিনীভূত সনাতনধর্ম্ম-

সমাজকে পুনরুজ্জ্বল করা প্রত্যেক সাধুহৃদয়ের সাহায্য সাপেক্ষ।

ভূপালগণ স্ব স্ব রাজ্য মধ্যে লুপ্তপ্রায় পূর্ব্বতন আর্য্য-জাতির ভগবদ্ভাবোদ্দীপক ধর্ম্মানুষ্ঠান যাহাতে সাধারণের হৃদ্গত করিতে পারেন, এবং ক্রমশঃ ধর্ম্মোন্নতি-সাধন সহকারে তাহাদের চিত্তোৎকর্ষ-সম্পাদন করতঃ গার্হস্থ্য, সামাজিক, রাজনৈতিক, শারীরিক, আধ্যাত্মিক, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কুশল ও সুখ সম্বর্দ্ধন করিতে পারেন, তাহার উপায় করুন। শিক্ষা ও অনুষ্ঠানাভাবে সনাতন ধর্ম্ম আজ কাল আড়ম্বরাবশেষ মাত্র হইয়াছে। ধর্ম্মের উন্নতি হইলে দেশের হীনতা দূর হইবেই হইবে। সাধারণ জনগণ যদি এই সুযোগে সুনীতি-শিক্ষা, হিতোপদেশ-লাভ, জ্ঞানালোচনাদি করিয়া নির্ম্মলচেতা হইতে পারেন, না জানি, তাহা হইলে দেশের কীদৃশ কল্যাণ হয়। সাধারণে ধর্ম্মোৎসাহী হইলে, সমুদয় ভারতবাসী একটী মনোহর অধ্যাত্মভাবসূত্রে বদ্ধ হইয়া পরস্পর আত্মীয়তা প্রদর্শন করিবে। আশা করি, সমুদারচেতা মহারাজা, রাজা, ও ধনাঢ্য দেশ-হিতৈষীগণ আমাদের এই প্রস্তাবে কর্ণপাত করিবেন।

অনেকে আশঙ্কা করিতে পারেন যে, ভারতীয় সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বীগণ এক্ষণে বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের প্রত্যেকের 'মত-পোষক' ধর্ম্মোপদেশ দান করিতে হইলে প্রত্যেক মতের এক এক জন ধর্ম্ম-প্রচারক আবশ্যক ; অন্যথা সাধারণের রুচিকর উপদেশ দান করিতে কোন ধর্ম্ম-প্রচারক কখনই সমর্থ হইবেন না। এত-

দুস্তরে অধিক কথা বলিতে সাহস হয় না, তবে এই মাত্র বলিয়াই ক্ষান্ত হইব যে, এক্ষণে আর ধর্ম্ম-"মতের" পোষকতা করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই, তাহা ইতিপূর্ব্বে অনেক মহাত্মা করিয়া গিয়াছেন। আপাততঃ আমাদের সমাজে যে ধর্ম্ম-"ভাবের" বহুল পরিমাণে ন্যূনতা হইয়াছে তাহারই উত্তেজনা করা আবশ্যক। ধর্ম্ম-"ভাবের" উদ্দীপনা বা সাধুজীবন সংগঠিত হইলে, যিনি যে মতাবলম্বীই হউন, তিনি তাহাতেই ভগবৎপ্রেমের অধিকারী হইয়া আনন্দ ভোগ করিবেন। যেমন শীতকালে সমস্ত বৃক্ষের পত্র শুষ্ক হইয়া পতিত হইয়া যায়, আবার বসন্ত বায়ু-প্রবাহে প্রত্যেক পল্লবে নবীন পত্রের উদ্গম হয়, কিন্তু বসন্ত বায়ু বহিল বলিয়া যে, সকল বৃক্ষের একরূপ পত্র হইবে, তাহা কখনই আশা করা যায় না; যে তরুর যে প্রকৃতি ও যে তরু যে জাতি, তদনুসারে সেইরূপ পত্র হইবে। যাঁহারা ধর্ম্ম-প্রচারক হইবেন, তাঁহারা, বসন্ত বায়ুর ন্যায়, ভারতে বিচরণ করিয়া সকল সম্প্রদায়ের হৃদয়েই মনুষ্যের প্রকৃতিগত ধর্ম্মভাবের উদ্দীপনা করিতে চেষ্টা ও যত্ন করিবেন।

উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তি যেমন আপনি ভিন্ন জগতের সকলকেই উন্মত্ত বলিয়া মনে মনে হাস্য করে, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বুদ্ধি-বিদ্যার পারিপাট্য ও নানারূপ অনুশীলন সত্ত্বেও ধর্ম্ম-জগতের প্রত্যেক সম্প্রদায়ই সেইরূপ নিজ সম্প্রদায়টী ভিন্ন আর সমস্ত সম্প্রদায়কেই সঙ্কীর্ণচিত্ত ও সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম-রূপ ভ্রান্তির সেবক বলিয়া অবজ্ঞা, উপেক্ষা, ও উপহাস করিয়া থাকেন। সুতরাং ধর্ম্ম-প্রচারের নাম গ্রহণ করিলে

চিরপ্রসিদ্ধ শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য, এবং আধুনিক স্বস্বকপোল-কল্পিত ধর্ম্মমতাবলম্বীদিগের অন্তঃকরণে এক ভাবের উদয় হইবে না। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে সাধুতা, শিষ্টাচার, সৎসাহস, ভগবৎপ্রেম, ও উপচিকীর্ষা প্রভৃতি সদ্‌গুণ-রাশির প্রভুত প্রাদুর্ভাব থাকিলেও, নিজ নিজ ভাবের প্রভাবে নিজ নিজ সম্প্রদায় ও আচার পদ্ধতির দিকে একটু বিশেষ টান হইবেই হইবে। শৈব মহাশয় সাধুস্বভাব-সম্পন্ন হইলেও যতক্ষণ না তাঁহার কর্ণকুহরে—

"জটাকটাহ-সংভ্রম-ভ্রমন্নিলিম্প-নির্ঝরী
বিলোল-বীচি বল্লরী-বিরাজমান-মূর্দ্ধনি
ধগদ্ধগদ্ধগজ্জ্বলল্ললাট পট্ট-পাবকে
কিশোর-চন্দ্রশেখরে রতিঃ প্রতিক্ষণং মম॥"

প্রবেশ না করিবে, যতক্ষণ তিনি প্রাণ ভরিয়া বলিতে না পারিবেন—

"জয় শঙ্কর পার্ব্বতীপতে
মৃড় শম্ভো শশিখণ্ড-মণ্ডন।
মদনান্তক ভক্তবৎসল প্রিয়-
কৈলাশ দয়া-সুধাম্বুধে॥"

ততক্ষণ তাঁহার চিত্ত চরিতার্থ হইবেনা। পরম ভাগবৎ বৈষ্ণব দেবদ্বেষ-বিহীন হইলেও যতক্ষণ তিনি না শুনিবেন—

"নবনীরদ-নিন্দিত-কান্তিধরম্
রসসাগর-নাগর-ভূপবরম্
শুভবঙ্কিম-চারুশিখণ্ডশিখম্
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতম্॥"

যতক্ষণ তিনি প্রাণের তারে স্বর মিলাইয়া না গাহিবেন—

"বৃষভানু-সুতাধর-কেলিপরম্
রসরাজ-শিরোমণি-বেশধরম্।
জগদীশ্বরমীশ্বরমীড্যবরম্
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতম্।

ততক্ষণ তাঁহার হৃদয়ের পিপাসা কোন মতেই মিটিবে না। সৌর মহোদয় পরম ধার্ম্মিক ও অতি নিষ্ঠাবান্ হইলেও যতক্ষণ না তিনি বলিতে পারিবেন—

"ভাস্বদ্রত্নাঢ্যমৌলিঃ স্ফুরদধররুচা
রঞ্জিতশ্চারুশোভা-
ভাস্বান্ যো দিব্যতেজাঃ করকমলযুতঃ
স্বর্ণবর্ণ-প্রভাভিঃ।
বিশ্বাকাশাবকাশ-গ্রহপতি-শিখরে
ভাতি যশ্চোদয়াদ্রৌ
সর্ব্বানন্দ-প্রদাতা হরিহর-নমিতঃ
পাতু মাং বিশ্বচক্ষুঃ॥"

যতক্ষণ তিনি হৃদয় ভরিয়া গাহিতে না পারিবেন—

"উদয়গিরিমুপেতং ভাস্করং পদ্মহস্তম্
নিখিল-ভুবননেত্রং রত্নরত্নোপমেয়ম্
তিমিরকরি-মৃগেন্দ্রং বোধকং পদ্মিনীনাম্
সুরবরমভিবন্দে সুন্দরং বিশ্ববন্দ্যম্॥"

ততক্ষণ তাঁহার ভগবৎপূজা সিদ্ধ হইল বলিয়া বোধ হইবে না। এক জন শাক্ত অতি ভক্তিমান্ ও সদুদার-চরিত হইলেও যতক্ষণ তিনি না শুনিবেন—

ঊর্দ্ধং বামে কৃপাণং করকমলতলে
ছিন্নমুণ্ডং তথাধঃ
সব্যেচাভীর্ব্বরঞ্চ ত্রিজগদঘহরে
দক্ষিণে কালিকেতি।
জপ্ত্বৈ তন্নাম যে বা তব মনুবিভবং
ভাবয়ন্ত্যেতদম্ব
তেষামষ্টৌ করস্থাঃ প্রকটিত-বদনে
সিদ্ধয়স্ত্র্যম্বকস্য ॥"

যতক্ষণ তিনি প্রেমস্বরে না বলিবেন—

"সকলসুরজনানাং সিদ্ধ-বিদ্যাধরানাম্
মুনি-দনুজ-নরাণাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাম্
নৃপতিগৃহগতানাং দস্যুভিস্ত্রাসিতানাম্
ত্বমসি শরণমেকা দেবি দুর্গে প্রসীদ" ॥

ততক্ষণ তাঁহার হৃদয় পরিতৃপ্ত হইবে না। গণপতির সেবক অতি সজ্জন হইলেও যতক্ষণ না শ্রবণ করিবেন—

"যতো বুদ্ধিরজ্ঞাননাশো মুমুক্ষো
র্যতঃ সম্পদো ভক্তসন্তোষিকাঃ স্যুঃ।
যতো বিঘ্ননাশো যতঃ কার্য্যসিদ্ধিঃ
সদা তং গণেশং নমামো ভজামঃ ॥"

যতক্ষণ না বলিবেন—

"প্রণম্য শিরসা দেবং গৌরীপুত্রং বিনায়কম্
ভক্তাবাসং স্মরেন্নিত্যমায়ুষ্কামার্থসিদ্ধয়ে" ॥

ততক্ষণ তাঁহার তৃষিত হৃদয় শান্তি-লাভ করিবে না।

একনিষ্ঠার দোহাই দিয়াই হউক, অথবা নিজ সংস্কার জন্যই হউক, সকলেই প্রায় এক না এক প্রবাহে ভাসিয়া

যাইবেন, নিজ সম্প্রদায় ভিন্ন অন্য সম্প্রদায় অজ্ঞান-জাল-জড়িত বলিয়া প্রতীতি করিবেন। "ধর্ম্ম-প্রচার" সম্বন্ধে যেমন মত-ভেদ, ধর্ম্ম-প্রচারের "উপায়" সম্বন্ধেও তদ্রূপ ব্যবস্থা-ভেদ বিদ্যমান আছে। এক সম্প্রদায়ের মালা, তিলক, ও আহারাচ্ছাদনাদিও অন্য সম্প্রদায়ের সহিত ঐক্য হয় না। পূজার উপচার ও অনুষ্ঠান লইয়াই যে ধর্ম্ম-প্রচার-কার্য্য শেষ হইল তাহা নহে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে পাপ, পুণ্য, সাধুতা, অসাধুতা, স্বর্গ, মোক্ষ, সাধনা, সিদ্ধি ইত্যাদি বিষয়েও ভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। যদি কোন ব্যক্তি লোক-সমাজে ভদ্র, সাধু, শিষ্ট, বিনম্র, ও সচ্চরিত্র বলিয়া পূজ্য থাকিয়াও সম্প্রদায় বিশেষের আশ্রয় লইতে চান, তবে যেমন তাঁহাকে সেই সম্প্রদায়ের ললাট-তিলকাদিরূপ কতকগুলি বিশেষ অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আবার ঐ সম্প্রদায়ের পরিগৃহীত ও সমাদৃত বিশেষ বিশেষ অর্থ ও অভিপ্রায় অনুসারে ভদ্র, সাধু, শিষ্ট, বিনম্র, ও সচ্চরিত্র হইতে হইবে। বাল্মীকির কোমল প্রকৃতি ও ভক্তিভাব, বশিষ্ঠের ক্ষমা ও শান্ত স্বভাব, কর্ণের বদান্যতা ও বৈরাগ্য, শঙ্করাচার্য্যের তপঃ-প্রভাব ও জ্ঞান আজকালের অনেক সম্প্রদায়ের চক্ষেই যথার্থ কোমলতা ও ভক্তি, ক্ষমা ও শান্তি, বদান্যতা ও বৈরাগ্য, এবং তপঃ-প্রভাব ও জ্ঞান বলিয়া প্রতীত হইবে না।

নিজ মতের সহিত ঐক্য না হইলেই যে তাহা অধর্ম্ম হইবে, ইহা কোন্ মর্ত্ত্যজীব সাহস করিয়া বলিতে পারে? যে সাধকের যাদৃশী কার্য্য-প্রণালী দ্বারা ভগবদ্ভাব পরিস্ফুট

হইয়া তাঁহাকে আনন্দ-রাজ্যের অধিকারী করিয়াছে, তিনি তাহাকেই এক মাত্র পথ মনে করিয়া সাধারণ্যে প্রচার করিলে চলিবে কেন? অন্য সাধক অন্য উপায়ে সেই ভাব পাইতে পারেন, এবং কত শত মহাত্মা তাহা পাইয়াও জগতের এক এক অংশকে মাতাইয়া গিয়াছেন; ইহা জগতের পুরাবৃত্ত-পাঠে বিদিত হওয়া যায়। সাধক ও পণ্ডিত, এই দুই উচ্চ শ্রেণীর লোক ধর্ম্ম-প্রচারের ভার গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে জনসাধারণকে নানাদিকে আকর্ষণ করিতে থাকেন। সাধকগণ ভাব-রাজ্যে বিচরণ করিয়া ভক্তকে ধর্ম্ম-ভাব-সাগরের শান্তি-নীরে মগ্ন হইতে উপদেশ দেন; পণ্ডিতগণ বিদ্যা, বুদ্ধি, যুক্তি প্রভৃতি দ্বারা অগণ্য-শাস্ত্র-সাগরে ধর্ম্ম-মত-তরঙ্গে সকলকে ভাসাইতে থাকেন। ধর্ম্ম-"মত" লইয়া যত গোলযোগ, তর্ক বিতর্ক, বিবাদ বিসম্বাদ হয়, ধর্ম্ম-"ভাব" লইয়া সাধকগণের মধ্যে সেরূপ বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। সুবোধ সভ্য মহোদয়গণ! ধর্ম্ম-"মত"-প্রচারপ্রিয় পণ্ডিতগণকে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে; প্রথম, যাঁহারা কেবল সুশাণিত তর্কাস্ত্রে অন্যের মতকে খণ্ডন করিয়া থাকেন, অথচ তৎপরিবর্ত্তে কোন অমৃতময় মত দিতে পারেন না; দ্বিতীয়, যাঁহারা অন্যের কলুষিত মতকে (তাঁহাদের মতানুসারে) খণ্ডন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে নিজ মত স্থাপন করিয়া তাহাকে আপনাদিগের অনুগত করিয়া থাকেন; তৃতীয়, যাঁহারা অন্যের মতাদি-খণ্ডনে ব্যস্ত না হন, অথচ আপনাদিগের কোমল ধর্ম্ম-ভাব সকল সর্ব্ব সাধারণকে অবলম্বন করাইয়া পরমানন্দ-

ধামের যাত্রী হইতে উপদেশ দিয়া থাকেন। ইহার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর লোকেরা দুষ্ট প্রজাগণকে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়া রাজ্য জনশূন্য ও ক্রমে বনাকীর্ণ করিয়া তুলেন; দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ সদাশয়গণ দুষ্ট প্রজাপুঞ্জকে বহিষ্কৃত করিয়া সাধু প্রজার উপনিবেশ করান; তৃতীয় শ্রেণীর মহোদয়গণ রাজধানীতে কেবল সম্ভ্রান্ত ও প্রতাপান্বিত লোকের বাসোপযোগী গৃহ ও দ্রব্যাদির আয়োজন ও ব্যবস্থা করেন, তাহাতে সামান্য প্রজাগণ আপনা আপনিই বাসভূমি ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়।

প্রথম শ্রেণীস্থ তার্কিক লোকদিগের অধিকৃত স্থানে নাস্তিকতা, অশান্তি প্রভৃতির অঙ্কুরোৎপত্তির সম্ভাবনা আছে; দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদিগের অধিকার-ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা ও তৎসঙ্গে সঙ্গে আত্মমতোৎকর্ষ-ভাবনা দিন দিন বলবতী হইতে থাকে; তৃতীয় শ্রেণীর মহাত্মাগণের কার্য্য-ভূমিতে সুফল ফলিবার অনেক সম্ভাবনা; কেন না, তাঁহারা সদ্ভাবের দ্বারা সাধারণের ভাগবতী বুদ্ধি-বৃদ্ধি করেন মাত্র। যাঁহারা বিদ্যাবান্, বুদ্ধিমান্, শাস্ত্র-বিশারদ, তর্কপ্রিয়, অথচ ভগবৎ-প্রেম-রসের বিন্দুমাত্রও আস্বাদ করেন না, তাঁহারাই কাল সহকারে প্রথম শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়া পড়েন; যাঁহারা চিন্তাশীল, শাস্ত্রার্থ-পারদর্শী, সমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, সদ্বিচার ও যুক্তি-প্রিয়, দেশ-সংস্কার-ব্রতানুরত তাঁহারাই দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত; এবং যাঁহারা বিনম্র, ভক্তিমান্, প্রেমিক ভগবদুপাসনাশীল, মুমুক্ষু, তত্ত্বদর্শী, এবং আত্মজ্ঞানসম্পন্ন, তাঁহারাই প্রায় তৃতীয় শ্রেণীতে বিচরণ করিয়া থাকেন।

প্রথম শ্রেণীর দ্বারা সমাজ ভীত ও ক্ষতিগ্রস্ত; দ্বিতীয় শ্রেণী দ্বারা শতধা-বিভক্ত, কার্য্য বিশেষে উন্নত, ও সময়ে সময়ে বিপ্লবগ্রস্ত হইয়া থাকে; তৃতীয় শ্রেণী দ্বারা সমাজ স্থির, নিরুপদ্রব, দ্বন্দ্বশূন্য, স্বাধ্যায়তৎপর, আনন্দিত, ও প্রেমিক হইতে পারে। প্রথম শ্রেণীস্থ লোক পরদোষ ক্ষালন করিতে চান; দ্বিতীয় শ্রেণী অন্যের দোষ দেখাইয়া স্বকীয় মতের গুণ-গৌরব ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন; তৃতীয় শ্রেণী কাহারও কোন দোষাদির উল্লেখ না করিয়া শুদ্ধ নিজ ভাবের উৎকর্ষ ঘোষণা করিয়া থাকেন। প্রথম শ্রেণী মলিন বস্ত্র ত্যাগ করাইয়া লোক সকলকে উলঙ্গ করিয়া রাখেন; দ্বিতীয় শ্রেণী মলিনবাস বর্জ্জনপূর্ব্বক পরিষ্কার বস্ত্র দিয়া তাহা ব্যবহারের শিক্ষা দিয়া থাকেন; তৃতীয় শ্রেণী কেবল পরিচ্ছন্ন বস্ত্রাদির পারি-পাট্য, শোভা, ও গুণ ব্যাখ্যা করিয়া লোক সকলকে সেইরূপ বসন দান করিয়া পরিধানে লোলুপ করেন, এবং পক্ষান্তরে লোক সকল তাহার শোভা সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া বিনা প্রেরণায় আপনা আপনিই মলিন বসন পরিত্যাগ করিতে থাকে।

এক্ষণে কোন্ প্রণালীতে ভারতে ধর্ম্ম-প্রচারিত হইলে আমাদের কল্যাণ সংসাধিত হইতে পারে, তাহা বিচক্ষণ মাত্রেরই বিবেচ্য বিষয়। তবে আমাদের সামান্য বুদ্ধিতে বর্ত্তমান বিপ্লবপূর্ণ ভারত-সমাজে তৃতীয় শ্রেণীর প্রণালীতে কার্য্য হইলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকার হইবার আশা আছে, ইহাই বোধ হয়। এবং সময়ে সময়ে কোথাও কোথাও দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যবস্থাও অবলম্বন করা শ্রেয়স্কর।

এক্ষণে সকলেই ইউরোপীয় বিদ্যা, বিজ্ঞান, চিন্তাশীলতা-প্রভাবে কিয়ৎ পরিমাণে স্বাধীন-ভাব-পরতন্ত্র, কেহ কাহারও অধীন হইতে চাহেন না, সুতরাং নির্ব্বিরোধী তৃতীয় শ্রেণীর অবলম্বিত প্রণালী তাঁহাদের হৃদয়ে আদৌ কোন আঘাত মাত্র করিবে না। আবার কোথাও কোথাও শান্ত ও ধীর ভাবে মলিন মত খণ্ডনপূর্ব্বক সাধু মত প্রচার করিতে হইবে।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, অগ্রে কাম, ক্রোধ, লোভাদিকে দমন কর, তবে ধর্ম্মের আলোচনা করিও; কিন্তু আমাদের বোধ হয় যে, ধর্ম্মের আলোচনা ও কার্য্য করিতে করিতে, কাম ক্রোধাদির দৌরাত্ম্য আপনিই নিবৃত্ত হইবে। অন্ধকার চলিয়া যাউক তবে সূর্য্যোদয় হইবে, এ সিদ্ধান্ত সারবান্ নহে; সূর্য্যোদয় হইলে অন্ধকার আপনিই অপসৃত হইয়া যাইবে। শান্তি-রক্ষক আসিলেই চৌর পলায়নপর হইবে। প্রথমে ভ্রান্তি-শান্তি করিয়া পরে জ্ঞান প্রচারিত হইবে, ইহা কখনই হইতে পারে না। জ্ঞান-প্রচার প্রথমেই প্রয়োজন; কেন না, ভ্রান্তির শান্তি করিতে গেলেই জ্ঞানের সহায়তা চাহিতে হইবে। তাই বলি, নির্ব্বিরোধে মানবের নির্ম্মল-প্রকৃতি-নিহিত ধর্ম্মভাব-কুসুমের সৌরভে ভারতকে মত্ত করিতে পারিলে বর্ত্তমান কালে যথেষ্ট উপকার হইবে; আবার জ্ঞান-সূর্য্যের আলোক যাহাতে ঘরে প্রবেশ করিতে পারে, উপদেশের যোগে বুদ্ধির দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিতে হইবে।

ভারতে কিরূপে ধর্ম্ম-প্রচার করিতে হইবে, তাহা যদিও আমরা বিশেষরূপ স্থির করিতে সম্পূর্ণ পারগ নহি, তথাচ

আমাদের সামান্য বুদ্ধিতে এইরূপ বোধ হয় যে, কতিপয় সাম্প্রদায়িক পদ্ধতি মত ভাব-প্রচার যথার্থ "ধর্ম্ম-প্রচার" নহে। সমস্ত জাতির প্রকৃতি-পরিবর্ত্তনের জন্য ধর্ম্ম একমাত্র সহায়। ধর্ম্মের যেরূপ প্রচার সেই মহোচ্চ লক্ষ্য সাধনে সমর্থ হইবে, আমরা তাহাকেই ধর্ম্মের প্রকৃত প্রচার বলিব। কিরূপে ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মরাজ্য পুনর্জ্জীবিত হইবে, কি উপায়ে ভারতীয় আর্য্যধর্ম্ম পুনঃ প্রচারিত হইয়া ভারতবর্ষকে ভগবদ্ভাবে উন্মত্ত করিবে, ইহা ভারতের কল্যাণেচ্ছু মাত্রেরই চিন্তা করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মের বাহ্য লক্ষণ ভারতবর্ষকে ভুলাইতে পারিবে না। কেবল বক্তৃতা, ঈশ্বরলাভেচ্ছাশূন্য শাস্ত্রপাঠ, কতকগুলি সাম্প্রদায়িক বাহ্যানুষ্ঠান দ্বারা ভারতীয় ধর্ম্ম পুনর্জ্জীবিত হইবে না। স্পন্দরহিত হিম-কলেবর মুমূর্ষু রোগীকে কতকগুলি মণিমুক্তাজড়িত স্বর্ণাভরণ দ্বারা সজ্জিত করিলে তাহার যেমন প্রীতিকর হয় না, তদ্রূপ মলিন মুমূর্ষু ভারতবর্ষকে কতিপয় সাম্প্রদায়িক ভাবালঙ্কারে সজ্জিত করিলে কিছুই হইবে না। যেরূপ ধর্ম্ম-প্রচারে ভারতবর্ষের অদ্যকার নিস্তেজ হৃদয়ে তেজঃ-সঞ্চার করিতে, নিদ্রিত ভারতবর্ষকে জাগ্রত করিতে, শতধা-বিভক্ত ভারতবর্ষকে প্রণয় ও দেশহিতৈষণার নামে এক করিতে পারিবে; যেরূপ ধর্ম্ম-প্রচারে ভারতবর্ষীয়দিগের অন্তঃকরণে দেবব্রতের দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা, যুধিষ্ঠিরের সহিষ্ণুতা ও সত্যানুরাগ, লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভাব ও জিতেন্দ্রিয়তা, বশিষ্ঠের সৌম্যতা, শান্ত স্বভাব ও ক্ষমা, ভীষ্মের শৌর্য্য, গাম্ভীর্য্য, বীর্য্য, ও বিজ্ঞতা, পুরাতন তাপস-

গণের তপঃ-প্রভাব ও ব্রহ্মচর্য্যের পুনরানয়ন করিতে পারিবে; যেরূপ ধর্ম্ম-প্রচারে ভারতবর্ষ উর্দ্ধে ঈশ্বর-ভক্তি ও লৌকিক জগতে লোক-স্থিতি, এই স্থির তারকের প্রতি অনিমেষ দৃষ্টি রাখিয়া সর্ব্বতোমুখী উন্নতি সহকারে ক্রমে পৃথিবীর জাতিসমাজে প্রাচীন ভারতবৎ প্রধান আসন গ্রহণ করিতে অধিকারী হইবে, তাহাই "ভারতে ধর্ম্ম-প্রচার"। সংক্ষেপে বলিতে গেলে যেরূপ ধর্ম্ম-প্রচারে লোকের শরীর সুস্থ ও সবল হইবে, মন উদ্যম ও উৎসাহ-যুক্ত, সৎসাহস ও নির্ভীকতা-দীপ্ত, বিশ্বাসী ও ভগবদ্ভক্ত, এবং কার্য্যকুশল ও সরল হইবে, তাহাই ভারতে প্রকৃত ধর্ম্ম-প্রচার।

ভারতবর্ষ চিরদিন ধর্ম্ম-সাধনই জীবন-ধারণের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া বিশ্বাস করে। ধর্ম্মভাব-রহিত কোন কার্য্যই ভারতবর্ষের আদরণীয় বোধ হয় না। যে ভারতবর্ষ ধর্ম্মের জন্য সমস্ত ত্যাগ স্বীকার করা কর্ত্তব্য বলিয়া থাকে; যে ভারতবর্ষ বিষয়-বিরাগী না হইলে, কাহাকেও ধর্ম্মোপদেষ্টার পদমর্য্যাদা দান করিতে চাহে না; যে ভারতবর্ষ জিতেন্দ্রিয়, শান্ত, সুধীর না হইলে, ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার অনধিকারী মনে করে; সে ভারতবর্ষে যে কতিপয় বাক্‌চতুর পুরুষ কেবল বাক্যের আড়ম্বরে ধর্ম্মপ্রচার দ্বারা লোক সমূহের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারিবেন, এমন বোধ হয় না। যে ভারত-বর্ষ ধর্ম্মের জন্য কঠোর ব্রতাচারে সদাই তৎপর; যে ভারত-বর্ষ প্রাণবায়ু-নীরোধপূর্ব্বক নিমীলিতনেত্র সমাহিত পুরুষ ভিন্ন কাহাকেও সাধক বলে না; যে ভারতবর্ষ ষষ্টিসহস্র বর্ষ-ব্যাপী তপস্যাচার তপোনিষ্ঠ ব্যক্তির বল্মীকাবরণ, ও অঙ্গে

দূর্ব্বাদলোৎপত্তি বাহ্যজ্ঞানশূন্য যোগীর উৎসঙ্গে বিহঙ্গগণ বসিয়া তাঁহার প্রেমাশ্রু পান করিবে, এইরূপ তপশ্চরণ ও ধর্ম্ম-সাধনের আদর্শ স্থির করিয়া রাখিয়াছে, তাহার নিকট আকণ্ঠ ভোজন করিয়া, উত্তম উত্তম সজ্জায় সজ্জিত হইয়া, এবং কেবল বাক্যে জ্ঞান প্রচার করিয়া যে, কেহ পূর্ণকাম হইতে পারিবেন, এরূপ বোধ হয় না। যিনি নিজ জীবনে প্রচার্য্য বিষয়ের পরীক্ষা দেখাইতে পারিবেন, যিনি বাক্যের কোন বিষয়-প্রকাশের পূর্ব্বে নিজ প্রকৃতিপটে তাহার অঙ্কন করিতে পারিবেন, যিনি নিজ সাধু বাক্য ও মনের পরস্পর অবিরোধিতা প্রদর্শন করিতে পারিবেন, তাঁহার ধর্ম্ম-প্রচা-রের কার্য্য বিফল হইবে না।

যিনি নিজ কপোল-কল্পনা বা নিজ সাধন-বর্জ্জিত-বুদ্ধি-বিজৃম্ভিত-যুক্তিজাল দ্বারা ধর্ম্ম শিক্ষা দিবেন, আর্য্য সন্তানগণ তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিবেন না। যাঁহার বুদ্ধি অপরি-ণত ও বিচার-শক্তি সদা পরিবর্ত্তনশীল, যাঁহার নিজেরই কোন মত এখনও স্থির হয় নাই, তিনি আচার্য্য হইবেন কিরূপে? তিনি আজ এক স্থানে যে উপদেশ দিলেন, দশ বৎসর পরে তিনি স্বয়ংই সে উপদেশ অসার ও অযৌক্তিক বোধে অনুপ-যুক্ত মনে করিলেন; তিনি হয় তো কোন জ্ঞানী ভক্তের সৎ-সঙ্গে সংশোধিত হইয়া গেলেন, কিন্তু দশ বৎসর পূর্ব্বে যে সকল লোককে তিনি উপদেশ দ্বারা অযথা পথে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাহাদের দশা হইবে কি! কুপথে প্রবৃত্ত হওয়া যেমন দোষ, কুপথে প্রবর্ত্তনা করাও তেমনি দোষ। বুদ্ধি ও জ্ঞান-সিদ্ধান্তের অপরিণত অবস্থায় কোন কার্য্যের

সূচনা করিতে নাই। যাঁহারা তপঃস্বাধ্যায় দ্বারা বুদ্ধির পরিপাক-দশায় উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারাই উপদেশ-দানের সুযোগ্য পাত্র। এই জন্য আর্ষবাক্যই প্রকৃত সদুপদেশ বলিয়া আর্য্যগণ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মজ্ঞানের অপরিণত অবস্থায় যাঁহারা উপদেশ করেন, তাঁহাদিগকে নিজেই পশ্চাত্তাপ করিতে হয়, ও তাঁহার শিষ্যবর্গকেও বৃথা কুপথ-গমনে ক্লেশ পাইতে হয়। এই স্থানে আমার একটী গল্প মনে পড়িল—

পল্লীগ্রামের একটা পাঠশালায় গুরুমহাশয় বেত্রহস্তে পড়ুয়া (পাঠার্থী) দিগকে হস্তলিপির শিক্ষা দিবার সময় সর্দ্দার পোড়োকে অন্যান্য বালকগণের "শিক্ষার্থ গম্ভীর স্বরে আজ্ঞা করিলেন, "ডেকে ডেকে নাম লেখ্— শ্রীসনাতন বিশ্বাস"। কালদণ্ডধারী যমের ন্যায় বেত্রধারী গুরুমহাশয়ের হাঁক ডাক শুনিয়া সর্দ্দার পোড়ো ভীতচিত্তে গুরুমহাশয় কি নাম লিখিতে বলিলেন, তাহাতে প্রণিধান করিতে না পারিয়াই অন্যান্য বালকের দিকে লক্ষ্য করিয়া সুদীর্ঘ টানা স্বরে বলিয়া উঠিল, "দাঁড়ী দিয়ে ছি রি (শ্রী) ফাঁ—দো ; 'খুশীরাম'—খয়ে হস্ব উ"। সর্দ্দার পোড়ো "সনাতন বিশ্বাস" নামটী ভুলিয়াই হউক, বা গুরুমহাশয়ের কথা না শুনিয়াই হউক, আন্দাজী "খুশীরাম" লিখিতে ও লিখাইতে বসিল দেখিয়া গুরুমহাশয় ক্রোধান্ধ হইয়া সর্দ্দার পোড়োকে এক বেত্রাঘাত করিলেন। সর্দ্দার পোড়ো বুঝিল যে, গুরুমহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইল না, অমনি সে মুখ বিকৃত করিয়া (চক্ষে টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতেছে ;

কাঁদিতে কাঁদিতে হাত দিয়া "খুশীরামের" 'খু' মুছিয়া বালক-বর্গকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিল, "মুচে ফ্যা—লো", ইহা শুনিয়া সকল বালক হস্ত দ্বারা তাল পত্রের লেখা "খুশী-রামের" 'খু' মুছিয়া ফেলিল।

সভ্য মহোদয়গণ! যাঁহারা সনাতন বিশ্বাস ভুলিয়া নিজের খুশীমত "খুশীরাম" লিখিতে বসিতেছেন, বুদ্ধির পরিপাকের উন্নত অবস্থায় সৎসঙ্গ-জন্য সদ্বিবেকের তাড়-নায় তাঁহাদিগকেই আবার পূর্ব্ব কথা সব মুছিয়া ফেলিতে হইবে, এবং সনাতন বিশ্বাসের অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। সদাচার-সম্পন্ন তত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণের আদর্শেই ধর্ম্ম-প্রচারক প্রস্তুত হওয়া চাই।

শাস্ত্রকার মাত্রেই যুক্তি-প্রদর্শন দ্বারা, উপাখ্যান দ্বারা, পারলৌকিক সুখলাভের লোভ-প্রদর্শন দ্বারা, সত্যনিষ্ঠা সম্বন্ধে কত স্থানে কত কথা যে বলিয়া গিয়াছেন, তাহা গণনা করা যায় না। রাজা যুধিষ্ঠির কখন জনসাধারণের নিকট সত্যনিষ্ঠার বক্তৃতাও করেন নাই, অথবা কোন গ্রন্থও রচনা করেন নাই, কিন্তু তাঁহার জীবন-চরিত "সত্যনিষ্ঠা" বিশেষ করিয়া প্রচার করিয়াছে। ধ্রুবের সরল ভগবদ্ভক্তিরস-পূর্ণ জীবন-চরিত যেমন লোক সকলকে ভক্তিমার্গে প্রবৃত্ত করিতে পারে, তদ্রূপ ভক্তির বক্তৃতা বা ভক্তি-শাস্ত্র বা যুক্তি কিছুই করিতে পারে না। দনুজকুলপাবন প্রহ্লাদের জীবনী যে ভগবদ্বিশ্বাসের পরাকাষ্ঠা সাধারণ্যে প্রচার করিয়াছে ও এখনও করিতেছে, তদ্রূপ ভাবপূর্ণ অন্যান্য বিশ্বাস-বিষয়ক জ্ঞানোপদেশ কার্য্যকর নহে। এক জন সাধুর "জীবন" শত

সহস্র ধর্ম্ম-প্রচারক অপেক্ষা অধিক কার্য্য করিতে পারে; সাধুর এক একটী কার্য্য, এক একটী বিভূতি, সহস্র সহস্র বক্তৃতা হইতেও উপকারী, ও প্রচুর শাস্ত্রের আলোড়ন হইতেও শ্রেয়স্কর। ভারতবর্ষ অনুষ্ঠানশীল ধর্ম্ম-প্রচারককে যেরূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিবে, সেরূপ অন্যকে করিবে না।

সদাচার-বর্জ্জিত হইলে শুদ্ধাত্মা হইতে পারা যায় না। ধর্ম্ম-বুদ্ধি সত্ত্বেও অনাচারী ধর্ম্মহীন হইয়া পড়ে। দক্ষ প্রজাপতি বলিয়াছেন—

আচারঃ প্রথমোধর্ম্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত্ত এবচ।
তস্মাদেতৎ সমাযুক্তং গৃহ্লীয়াদাত্মনো দ্বিজঃ॥
চতুর্ণামপি বর্ণানাং আচারো ধর্ম্মপালনং;
আচারভ্রষ্টদেহানাং ভবেদ্ধর্ম্ম পরাঙ্মুখঃ॥

উন্নতচেতা হইয়াও যদি কেহ আচারহীন হয়, তবে তাহাতে ধর্ম্মের প্রতিভা সম্যক্‌রূপে বিকাশ প্রাপ্ত হয় না। দৃষ্ট হইয়া থাকে, অনেক উচ্চহৃদয় পুরুষ প্রথমাবস্থায় "খুশীরামের" অনুগত হইয়া যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়েন, কিন্তু পরিণামে ভগবৎ-কৃপায় প্রবুদ্ধ হইয়া শেষ দশায় সদাচারের পক্ষপাতী হইতেছেন। প্রথম হইতেই সদাচারী হইয়া ধর্ম্মপথে বিচরণ করিতে পারিলে পরম সুখলাভ হইয়া থাকে। সভ্য মহোদয়গণ! এই সময় একটা গল্প মনে পড়িতেছে, উহা সামান্য হইলেও বলিতে হইল—

একটী মূষিকের সঙ্গে একটা বিষধরের অতিশয় মিত্রতা ছিল। বিষধর আপনার চাকচিক্যে ও শোভায় আপনি মত্ত থাকিত, ও মূষিকের মলিন মূর্ত্তি দেখিয়া অনেক

সময় উপহাস করিত। কিন্তু মূষিক বলিত, ভাই বিষধর! তোমার তেজে, তোমার গর্জ্জনে সকলেই তোমাকে প্রধান বলিয়া মানে, কিন্তু ভাই! তোমার চাল চলন্‌টা বড় বাঁকা (বক্রগতি); তোমার চলন্‌টা আমাদের মত সরল হইলে তোমার যে কত প্রশংসা হইত, তাহা বলিতে পারি না। সর্প মনে মনে বুঝিল, মূষিক যাহা বলিল তাহা সত্য, কিন্তু আমি উরগ, কাজে কাজেই বাঁকিয়া যাইতে হয়, পাদচারী হইলে সরলভাবে যাইতে পারিতাম। আমি অশক্ত একথা মূষিককে বলিলে তো আমার মান থাকে না, এই ভাবিয়া বিষধর কপট কোপ প্রকাশ করিয়া বলিল, দেখ মূষিক! তুমি ক্ষুদ্রজীব, আমি এখনই তোমাকে দংশন করিয়া মারিয়া ফেলিতে পারি, কিন্তু তুমি পুরাতন মিত্র বলিয়া কিছু বলিলাম না, সাবধান! এরূপ কটু কথা আমাকে আর কখনও বলিও না। মূষিক ভাবিল

মূর্খ জনে সদা ভয়,
ভাল ব'লে মন্দ কয়।

আর প্রকাশ্যে বলিল, না ভাই! তুমি যা কর, তাই বেশ। কিছু দিন পরে সর্প কোন গৃহস্থের ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাদের ভৃত্য তাহা দেখিয়া দণ্ডাঘাতে সর্পের প্রাণনাশ করিল, ও মৃত সর্পের লাঙ্গুল ধরিয়া হড়্ হড়্ করিয়া টানিয়া লইয়া চলিল, মূষিক হড়্ হড়ানি শব্দ শুনিয়া নিজ বিবর হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিল, ভৃত্য টানিয়া লইয়া যাওয়ায় আজ মিতা তো সোজা হইয়াছেন, আর বলিল, ভাই বিষধর! সেই তো সোজা হইলে, কিন্তু মরণের পর; যদি বাঁচিয়া

থাকিতে, আজিকার মত সোজা (সরল গতিতে) চলিতে, তবে আমার আহ্লাদের সীমা থাকিত না। তাই বলি, বিদ্বজ্জনগণ! শেষ বয়সে সোজা না হইয়া দিন থাকিতে সদাচারী, ও সরল হইলে পরম সুখলাভ হইয়া থাকে। অতএব সনাতন ধর্ম্মের উপদেষ্টা আচার্য্যগণ প্রথম হইতেই সদাচারী সরল, ও তত্ত্বজ্ঞ হইবে।

সরোবরের জল যখন বাড়িতে থাকে, তখন তথাকার কমলের মৃণালেরও বৃদ্ধি হইয়া থাকে, কিন্তু কাল সহকারে যখন জল বিশুষ্ক হইয়া যায়, তখন মৃণাল আর ক্ষুদ্র হইতে পারে না, ক্রমে শুষ্ক হইয়া পড়ে। সেইরূপ আর্য্যগণের অত্যন্ত উন্নতির সময়ে ভারতের মনের দৃষ্টি অতি উচ্চ হইয়া গিয়াছিল, এক্ষণে সে সব পূর্ব্ব ব্যাপার কিছুই না থাকিলেও ভারতের উচ্চতর দৃষ্টি আর নীচতর হইতেছে না। সুতরাং, ভারতবর্ষ পূর্ব্বতন বিষয়-বিলাস-বিরাগী ঋষিগণকে ভিন্ন আর কাহাকেও ধর্ম্ম-প্রচারকের পদে বরণ করিতে অগ্রসর নহে; এবং তাঁহারা যে প্রণালীতে, যে ভাবে, ধর্ম্ম-প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা ভিন্ন অন্যরূপে ধর্ম্ম-প্রচার হইলে ভারতের মনোনীত হইবার সম্ভাবনা নাই। এই জন্য বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতে অধিককাল স্থায়ী হইতে পারিল না; মুসলমানগণ, অচিরকাল মধ্যেই, ভারত যে মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে প্রস্তুত নহে, তাহা বুঝিতে পারিল; খৃষ্টীয়ধর্ম্ম-প্রচারকপুঞ্জও স্ব স্ব পরিশ্রম বিফল বুঝিতে পারিতেছেন; ব্রাহ্মসমাজও সাধারণের সহানুভূতি হইতে এই জন্য বঞ্চিত হইতেছেন। আর্য্যগণ প্রথমতঃ নিজ নিজ জীবন সাধুভাবপূর্ণ ও তপোগ্নি-

পূত করিতেন, তৎপরে লোকোপদেশার্থ প্রবৃত্ত হইতেন, এবং ধর্ম্ম-প্রচার করিবার সময় দেশ, কাল, পাত্র বুঝিয়া কার্য্য করিতেন। এক জন অতিশয় বুদ্ধিমানের ধর্ম্মভাব কখনও এক জন মহামূঢ়ের হৃদয়ে স্থান পায় না, এজন্য প্রত্যেকের প্রকৃতি অনুসারে ধর্ম্মাচারও বিহিত হইয়াছে। অতি অল্পজ্ঞ ও অতি বিজ্ঞ উভয়েরই ধর্ম্মভাবের আদর্শ ও লক্ষ্য এক বটে, কিন্তু অধিকার ভেদে তাঁহাদের সাধন-প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন হওয়া স্বাভাবিক। আর্য্যগণ চিন্তাশীল, শাস্ত্রজ্ঞ, তপঃশুদ্ধবুদ্ধি, প্রশস্তচেতাগণের জন্য জ্ঞানকাণ্ড, ও সাধারণ বিষয়ীবর্গের নিমিত্ত কর্ম্মকাণ্ড ব্যবস্থা করিয়াছেন। ধ্যানসমাধিশীল সূক্ষ্ম-চেতার পক্ষে কর্ম্মকাণ্ড যেমন আদরণীয় নহে, আবার দেহাত্মবাদী মূঢ়গণের পক্ষে সূক্ষ্ম জ্ঞান-পথ তেমনি দুর্গম, অরুচিকর ও নীরস; সুতরাং একের ভাব অন্যতরের হৃদয়কে কখনই সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিতে পারে না। মনুষ্যের মনঃ-প্রকৃতি, সমাজের প্রচলিত প্রথা, সময়ের গতি প্রভৃতির প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি না রাখিয়া, কবির কল্পনা-বিজৃম্ভিত নাট্য-নায়িকার অলোকসামান্য রূপ-রাশি সত্য সত্য দেখিব বলিয়া উন্মত্ত হওয়ার ন্যায়, একবারে দিব্যজ্ঞান প্রচারে প্রবৃত্ত হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। বালককে জ্ঞান-শিক্ষা দিতে হইলে সুচতুর বিচক্ষণ শিক্ষক অবশ্যই বালকের বুদ্ধিশক্তির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সরল সুমধুর ভাষায়, ইতিহাস উপন্যাস-ছলে, সাধারণ দৃষ্টান্তে, ধীরে ধীরে তাহাকে তাঁহার মন্তব্য পথে লইয়া যাইবেন। তদ্রূপ, বয়োবৃদ্ধ ধারণাশীল পুরুষকে জ্ঞান-

শিক্ষা দিতে হইলে, শাস্ত্রীয় সাধুসদ্ভাবপূর্ণ ভাষায়, গম্ভীর ভাবে, যুক্তি প্রমাণাদির দ্বারা আপনার উদ্দেশ্য সাধন করিবেন। যদি কোন মহাত্মা অজ্ঞানে উন্মত্ত হইয়া বর্ত্তমান ভারতে ধর্ম্ম-প্রচার করিবার জন্য "পৌত্তলিকতা অত্যন্ত ভ্রমদূষিত", "অবতারবাদ মূর্খমণ্ডলীর মিথ্যা শাস্ত্রের উক্তি," "শ্রাদ্ধ তর্পণাদি মৃত গাভীর জন্য তৃণচ্ছেদ তুল্য," "বর্ণবিচার মহামূর্খতার ফল," ইত্যাদি ঘোষণা করিতে থাকেন, তবে তিনি ভারতের কমনীয় হৃদয়ে আঘাত করিয়া বেদনা দিবেন মাত্র, কিন্তু সিদ্ধমনোরথ হইতে পারিবেন কিনা তাহা সম্পূর্ণ সন্দেহ-স্থল। অতএব যে উপায়ে ভারতের কোমল প্রকৃতি ও সরল বিশ্বাসের অভ্যন্তর দিয়া ধীরে ধীরে আর্য্যগণের জগদ্বিজয়ী জ্ঞান-গৌরব ভারতে প্রচারিত হয়; যে উপায়ে ভারতীয় সহানুভূতি-লাভ করিয়া, পরম সুহৃদের ন্যায়, প্রত্যেকের হৃদয়ে বিলুপ্তপ্রায় সনাতন ধর্ম্ম-প্রভাব উত্তেজিত করা যায়; যে উপায়ে সকলের সহিত সাধারণ ভাবে যোগ রক্ষা করিয়া শনৈঃ শনৈঃ ভারত সামাজিক, রাজনৈতিক, ও আধ্যাত্মিক উন্নতি-পথে অগ্রসর হইতে থাকিবে, তাহাই "ভারতে ধর্ম্মপ্রচার"। যে উপায়ে ভারতীয় প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সূক্ষ্ম লক্ষ্য ভেদ করিয়া প্রতি হৃদয়ে ধর্ম্মভাব সাধারণ ভাবে স্থান পাইবে, তাহাই "ভারতে ধর্ম্ম-প্রচার"। যে কার্য্য চতুরতা কৌশলাদি-বিজৃম্ভিত না হইয়া ধর্ম্ম-জীবনের উপাদেয় ফল বলিয়া প্রত্যেকের মনোমধ্যে ধারণা হইবে, তাহাই "ভারতে ধর্ম্ম-প্রচার"। যে ভাব কোন সরল চিত্ত ধার্ম্মিক হৃদয়ে আঘাত না করিয়া নির্ব্বিঘ্নে ভারতের প্রতি গৃহে স্থান

পাইবে, তাহাই "ভারতে ধর্ম্ম-প্রচার"। যে ধর্ম্মভাব প্রচারিত হইলে দেখিব যে, ভারতীয় প্রত্যেক ব্যক্তি আর্য্যগণের যোগ, জ্ঞান, ও ধর্ম্মাচার স্মরণ করিয়া প্রেমাশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁহাদের গুণ-গানে উল্লাসযুক্ত হইয়াছে, "ধর্ম্মাৎপরতরং নহি" বলিয়া মানবীয় কর্ত্তব্যে মনোনিবেশ করিয়াছে, "এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মঃ" বলিয়া নারায়ণকে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিতে শিখিয়াছে, তাহাই "ভারতে ধর্ম্ম-প্রচার"। যে প্রণালীতে ধর্ম্ম-প্রচারিত হইলে, প্রত্যেক ব্যক্তির মুখে "জয় ভারতের জয়, যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ, জয় জয় ধার্ম্মিক হৃদয়। জয় ব্রহ্ম নারায়ণ, জয় শুক সনাতন, জয় জয় ভারতের জয়"—এইরূপ আনন্দধ্বনি শুনিব, তাহাই "ভারতে ধর্ম্ম-প্রচার"।

শরীরের পীড়া এক দিনেই প্রকাশিত হয় না। শরীরস্থ ধাতুগত শক্তি নানা কারণে ক্রমশঃ মলিন হইলে পর, তত্তাবতেরই বিকাশস্বরূপ পীড়ার বাহ্য লক্ষণ শরীরে প্রকাশিত হয়। ধাতুগত বিকৃতি যে সময় হইতে জন্মিতে থাকে, সেই সময়ে সাবধান হইতে পারিলে জীবকে আর ব্যাধির যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। হিন্দু রাজত্বকালেই ভারতবর্ষের ভাবগত অধর্ম্মের উদ্বোধন অথবা ধর্ম্মচ্যুতির সূচনা দেখা দিয়াছিল—ধর্ম্মাচারগত দুর্দ্দশার বীজ হিন্দু-রাজত্বকালেই উপ্ত হইয়াছিল, বৌদ্ধ-শাসনে সেই ক্ষেত্রে জল সেচন হয়, মুসলমান রাজত্বকালে তাহার অঙ্কুরোৎপত্তি হইল, এবং ইংরাজ রাজত্বে উহা পল্লবিত হইতেছে। জীবের আধ্যাত্মিক স্বচ্ছন্দ অবস্থায় মনের প্রকৃতি, দিঙ্‌নির্ণয়-যন্ত্রের লক্ষ্য ধ্রুব তারার দিকে থাকার ন্যায়, সত্যের দিকে—সারভূত

পদার্থের দিকে,—সর্ব্বথা ভগবানের দিকে অবিচলিত থাকে। ভারতবর্ষের প্রকৃতিগত দৃষ্টি যত দিন পরমাত্মার দিকে স্থিরভাবে ছিল, যত দিন সংসারকে কেবলমাত্র কর্ম্মক্ষেত্র জানিয়া ধর্ম্মার্থ কার্য্যানুষ্ঠানে মানবের মনোবেগ প্রধাবিত হইত, যত দিন আত্মার নির্ম্মল সত্তানুভবে মনঃ প্রাণ বিগলিত হইত, তত দিন ভারতবর্ষের উন্নতাবস্থা অক্ষুণ্ণ ছিল। ভোজরাজার রাজত্বকালে, মহারাজ বিক্রমাদিত্যের অধিকারকালে কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যের ছটায় ভারতীয় গগন উজ্জ্বল ও আলোকিত হইয়াছিল। বলিতে গৌরব-বুদ্ধি বিস্ফারিত হইয়া উঠে—কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ প্রভৃতির অভ্যুদয়ে সংস্কৃত সাহিত্য-রাজ্যে অমূল্য রত্নকোষ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কবিতার মাধুরীতে হৃদয় পুলকিত ও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে; কবি যে রসের সঞ্চার করিবেন, যে রসের নির্ঝরিণী খুলিয়া দিবেন, সেই রসে জগৎ ভাসিয়া যাইবে,—ডুবিয়া যাইবে। বাল্মীকির কবিতায় যে রসের ফোয়ারা ছুটিয়াছিল, তাহাতে জীব অবগাহন করিয়া পবিত্র ও কৃতার্থ হইয়াছিল। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের কবিতায় যে রসের স্রোত বহিয়াছিল, তাহাতে স্নান করিয়া জীবের তাপিত প্রাণ সুশীতল হইয়াছিল। কিন্তু মহাকবি কালিদাস প্রভৃতির কবিতা-শক্তি যে রসের শতমুখী নির্ঝরিণী খুলিয়া দিয়াছে, তাহাতে লোকের হৃদয় প্লাবিত হইয়া, উন্মত্ত হইয়া, কুল কিনারা ছাড়াইয়া, কে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে, তাহার নিদর্শন পাওয়া কঠিন। কলির কবিগণ আমোদ প্রমোদ, রং তামাসার উচ্ছ্বাসে মানব মনকে অত্যুচ্চ পবিত্র রত্ন-বেদি

হইতে আকর্ষণ করিয়া ধরার ধূলায় লুটাইয়া দিয়াছেন, অন্তর্জ্জগৎ হইতে বহির্জ্জগতে টানিয়া আনিয়াছেন, দৃঢ়চিত্ততাকে শিথিল করিয়া দিয়াছেন, অন্তঃকরণের প্রখর তেজঃ মলিন ছায়ায় ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। যখনই আমোদ প্রমোদে লোকের চিত্ত প্রধাবিত হয়, তখনই মনের বলবীর্য্য ও শান্তির অপচয় হইতে আরম্ভ হয়, তখনই জাতীয় অবনতি ও অধঃপতনের সূত্রপাত হয়। দেশের মধ্যে রঙ্গরসের যত আধিক্য হইবে, ততই দেশের হৃদয় দুর্ব্বল হইয়া যাইবে। যাহারা যত পরিমাণে নাটক নভেল পড়িয়া থাকে, তাহারা তত পরিমাণে গণিত বা দর্শন-শাস্ত্রাদি পড়িতে অসমর্থ হইয়া পড়ে। প্রমোদ-কাননে বিচরণ করিতে করিতে রাজার বলবীর্য্য নিস্প্রভ হইয়া আসে। রস-বিলাসে, কেলি-কৌতুকে মনঃ প্রধাবিত হইলে ব্রহ্মচর্য্যের ব্রহ্মতেজঃ মলিন হইয়া পড়ে। সেইরূপ সাহিত্য-সমাজের মহাকবি কালিদাস আদির মনোমোহিনী কবিতাশক্তি অন্তর্জ্জগতের অভ্যন্তর-নিবাসী তেজোরাশিকে বহির্জ্জগতের কুসুম-শয্যায় শোওয়াইয়া নিদ্রিত করিয়াছে, ও স্বপ্নবিলাসের মনোহারিণী শোভায় বিমোহিত করিয়া রাখিয়াছে। মহাকবিগণের বর্ণনার ছটায় জীবের প্রসুপ্ত আমোদ-প্রমোদ-রস-বিলাস-বৃত্তি জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, ভোগের ভাগ অতি মাত্রায় বাড়িয়াছে, ভিতরের তেজঃ-হ্রাস হইয়া গিয়াছে। ভারতাকাশে যখন এইরূপে কৌতুক-কদম্ব ফুটিয়া উঠিল, তাহারই তীব্র দুর্গন্ধে মানব মনে মলিনতা জন্মিতে লাগিল। ক্রমে দুর্ব্বিনয়তা, বিষয়াসক্তি, ভোগবিলাস, সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থপরতা, দ্বেষ, হিংসা আদি ব্যাধি

হৃদয়কে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে অধিকার করিয়া ফেলিল। ভারতের নির্ম্মল তেজঃ গুহ্য গগনের গুপ্ত পটের অন্তরালে লুক্কায়িত হইতে লাগিল। মন মলিন হইলে—বৃত্তি নীচ হইলে—যে সকল দুর্ব্বিপত্তি ও দুর্ব্বলতা আসিয়া জাতিকে আশ্রয় করে, ক্রমে ক্রমে আমাদিগকে সে সমস্তই অধিকার করিয়াছে। যেমন "বাঘে ছুঁইলে আঠার ঘা হয়," মনোমালিন্যের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমস্ত গায়েই ঘা হইয়াছে! এখন ইহার সুচিকিৎসা চাই।

হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত বিশাল ভারতক্ষেত্রে খণ্ড খণ্ড বিভাগে—বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, পঞ্জাব, কাশ্মীর, মধ্যদেশ, রাজপুতানা, গুর্জ্জর, মহারাষ্ট্র, ত্রৈলিঙ্গ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন ভাষারসিক সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বিগণ বাস করিয়া থাকেন। আহার আচ্ছাদনে, আচার ব্যবহারে, রীতি পদ্ধতিতে, অথবা বিবিধ বাহ্য ব্যাপারে, কাহারও সহিত পরস্পর একতা না থাকিলেও, শ্রুতিমূলক, স্মৃতিমূলক, এবং পৌরাণিক ধর্ম্মরাজ্যের সুশাসনে সকলেই অধিবাস করিয়া থাকেন। প্রথা-পদ্ধতিতে অযথা বিভিন্নতা থাকিলেও, ভাষায় না হউক, ভাবে—রীতিতে না হউক, প্রকৃতিতে সকলেরই একতা আছে। যাহাতে সেই অন্তঃসূত্র-গ্রথিতা একতা সর্ব্বদেশীয়দিগের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুসম্বদ্ধ হয়, ধর্ম্ম-প্রচারের দ্বারা তাহার সংসাধন করিতে হইবে। খণ্ড খণ্ড রাজ্য যদি স্বতন্ত্র ভাবে পরিচালিত হয়, তাহা হইলে উন্নতির বিশালস্রোত কোন কালেই প্রবাহিত হইবে না। যখন কাহারও শরীর স্বচ্ছন্দ থাকে, তখন শরীর

রের হস্ত-পদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরস্পর সহানুভাবকতা করিয়া থাকে। সুস্থ শরীরে পদাঙ্গুষ্ঠের একাংশে কিঞ্চিন্মাত্র আঘাত লাগিলে সমস্ত শরীর বিত্রস্ত হইয়া উঠে, এবং যতক্ষণ না সেই আহত স্থানের ক্লেশ বিদূরিত হয়, ততক্ষণ সমস্ত শরীরই অবসন্ন ও অস্বচ্ছন্দ থাকে। ঐ আহত অংশকে পুনঃ প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গই যত্ন ও সাহায্য করিতে থাকে। আর যদি শরীরের অর্দ্ধাঙ্গে অথবা কোন প্রত্যঙ্গে পক্ষাঘাত-রোগ ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে শরীরের অন্য কোন অঙ্গে আঘাত লাগিলে, অথবা যাতনা জন্মিলে, সেই রোগাভিভূত অঙ্গ সেই যাতনার ভোগ-ভাগী হয় না, এবং ঐ যাতনার উপশম করিবার জন্য তাহার যত্ন বা সামর্থ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। মলিন ও অস্বস্থ-প্রকৃতি ভারতবর্ষের অবস্থা অতি শোচনীয়! অনেক দিন হইতে ইহার এক বিভাগের সহিত অন্য বিভাগের সহানু-ভাবকতার হ্রাস হইয়া গিয়াছে। আজ রাজপুতনায় দুর্ভিক্ষ-দাহে যদি সহস্র সহস্র লোক প্রাণত্যাগ করে, তবে তাহাদের দুঃখে দুঃখী হইয়া কয়জন অন্য বিভাগবাসী মুক্তহস্তে তাহাদিগের সাহায্যার্থ অগ্রসর হয়েন? বরং দেখিতে পাওয়া যায়, বৃথা রঙ্গরসে, কুরুচিপূর্ণ আমোদ প্রমোদে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা অপব্যয়িত হইতেছে, তথাচ দুর্ভিক্ষ-পীড়িতগণের সাহায্যার্থ দুইটী পয়সা দিতে ভার-বোধ হইয়া থাকে। এখন এক দেশের সহিত অন্য দেশের সাক্ষাৎ হইবার, সম্মিলিত হইবার, সখ্যতা-স্থাপন করিবার সদুপায় সকল আবিষ্কৃত হইতেছে। আমাদের সুচতুর

গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে পোষ্ট-আফিশ, টেলিগ্রাফ্, রেলওয়ে প্রভৃতি হওয়ায়, ক্ষণার্দ্ধ মধ্যে যেখানে সেখানে বসিয়া ভারতবর্ষের সকল স্থানের সহিত সহযোগিতা ও সম্পর্ক-স্থাপন করিতে পারা যায়। ভাল মন্দ যেখানেই যাহা ঘটিতেছে, ঘটনা যেমন দূরাদ্দূরতর দেশে হউক না কেন, নিশি পোহাইতে না পোহাইতে, সংবাদ-পত্রে তারের সমাচারে সসাগরা বসুন্ধরার চারিদিকে তাহার প্রতিধ্বনি ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। একজন মহানুভবের মনে একটা মহদ্ভাবের তরঙ্গ উঠিল, অমনি বিদ্যুৎ-প্রবাহে তাহা সকল দেশের সকল মনের ভিতর দিয়া ছুটিল। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু প্রভৃতি জীবের উদ্ধারার্থ নগরে নগরে ভ্রমণ করিয়া যে মনোহর স্বরে গগন পরিপূরিত করিয়াছিলেন, যদিচ সে স্বরে গান ধরিবার লোক এক্ষণে কেহ বিদ্যমান নাই, কিন্তু তাঁহাদিগের স্বরের প্রতিধ্বনি করিলেই এখন যথেষ্ট হইবে। তাঁহাদিগকে পদব্রজে কত ক্লেশ সহ্য করিয়া, কত বিলম্বে, কত দেশ ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। এক্ষণে রেলওয়ে, ষ্টীমার প্রভৃতি সেই ক্লেশ-রাশি দূর করিবার অনেক সাহায্য করিতেছে। তাঁহাদিগের দেশে দেশে যাইতে বিলম্ব লাগিত বটে, কিন্তু কার্য্যসাধনে বর্ত্তমান কালের মত কাল-বিলম্ব হইত না। তখন আচার্য্যগণ এক এক মণ্ডলাধিপতির, এক এক ধর্ম্মমত-প্রবর্ত্তকের, এক এক শাস্ত্রমার্গ-নেতার সহিত কিছু ক্ষণ বা কয়েক দিন ধরিয়া শাস্ত্রার্থ বিচার করিয়াছেন, এবং তাঁহাকে নিজ মতে আনয়নের সঙ্গে সঙ্গে তন্মতানুবর্ত্তী সহস্র সহস্র লোক সেই পথে আপনি আসিয়া গিয়াছে। কিন্তু এখনকার

সমাজের বিচিত্র গতি! বর্ত্তমান ভারতে কেহ কাহারই সম্পূর্ণরূপে অনুবর্ত্তন করিতে চায় না, সকলেই স্ব স্ব প্রধান। একজনের পরাভবে তন্মতাবলম্বী আর একজন পরাভব স্বীকার করে না। রাজা হারিলেও প্রজা হারিতে চায় না, গুরু হারিলেও শিষ্য তাহা মানিতে চায় না। এক্ষণে প্রত্যেকের সহিত স্বতন্ত্র বিচার করিতে হইবে, প্রত্যেকের উক্তি ও যুক্তি খণ্ডন করিতে হইবে। এখন মহামহোপাধ্যায় শিরোমণি মহাশয় হইতে বালিকা-বিদ্যালয়ের পঞ্চমবর্ষীয়া যৌনবতীর সঙ্গে পর্য্যন্ত বিচার করিয়া তর্কে হারাইতে হইবে। বস্তুতঃ, যাতায়াতের ও লোক-সঙ্গতির বহু সুবিধা হইলেও আমাদের প্রকৃতিগত উচ্ছৃঙ্খলতা সদ্ধর্ম্ম-প্রচারের অতিশয় প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু যে কোন বাধাই হউক না কেন, শাস্ত্রসিদ্ধ সাধন-সুলভ মহাতেজে অনুপ্রাণিত হইয়া যদি সিদ্ধসাধকগণ কর্ত্তৃক ভারতীয় সনাতন-ধর্ম্ম পুনঃ প্রচারিত হয়, তবে ভারতীয় গগনের মেঘমালা ভেদ করিয়া "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ" বিদ্যুদ্দামীর জ্বলন্ত অক্ষরে প্রকটিত হইয়া আমাদিগের নয়নমন উদ্ভাসিত করিবে।

একাগ্রতা একতাকে এবং আগ্রহ ভগবদনুগ্রহকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। কোটী কোটী ভারতবাসীর মধ্যে যদি কয়েক জনমাত্রও এই মহামন্ত্রের মহত্ত্ব বুঝিয়া জীবনসর্ব্বস্ব পণ করিয়া সিদ্ধি-সাধনের জন্য দীক্ষিত ও অভিষিক্ত হয়েন, তবে ত্রিজগতের প্রতিষ্ঠাতা ও মহামন্ত্রের অধিষ্ঠাতা স্বয়ং তাঁহার সহায়তা করিবেন। শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব-রাশির গুহ্য প্রহেলিকা

উদ্ভেদ করিয়া, সরল ভাষায়, সরল ভাবে, অধিকারী লোক-মণ্ডলীতে তাহা প্রকাশ করিতে হইবে। অনুষ্ঠানে—সাধনে স্বয়ং প্রবৃত্ত হইতে ও অন্যকে প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। প্রেমের স্বরে আপনি গাইয়া, প্রেমের তালে আপনি নাচিয়া, প্রেমের ভাবে আপনি মাতিয়া, প্রেম-সাগরে আপনি ডুবিয়া অন্যকে গাওয়াইতে, নাচাইতে, মাতাইতে ও ডুবাইতে যত্ন করিতে হইবে। যে দেশে, যে গ্রামে, লোকমণ্ডলী নিবাস করিয়া থাকে, সেই খানেই সৎসভা-সমিতির সূচনা করিতে হইবে। সুযোগ্য ব্যাখ্যাতার ধর্ম্মোপদেশে, ভগবানের নামানু-কীর্ত্তনে সভার কার্য্যক্ষেত্র সর্ব্বদা সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে। সাময়িক পত্রের দ্বারা, পুস্তকাদির দ্বারা, ধর্ম্মকথা অধিক পরিমাণে সাধারণের উপযোগী করিয়া প্রচার করিতে হইবে। যে স্থানে বেদের শিক্ষা, অন্যান্য শাস্ত্রের শিক্ষা, ধর্ম্মার্থ-পূর্ণ সুনীতি-শিক্ষা উত্তমরূপে প্রদত্ত হইতে পারে, এরূপ বিদ্যালয়-সমূহ সংস্থাপন করিতে হইবে। সাধক, সিদ্ধ মহাত্মাগণের আদর্শ-রেখা যাহাতে মানব হৃদয়ে জ্বলন্তরূপে অঙ্কিত হয়, স্বতঃ পরতঃ তাহার যত্ন করিতে হইবে।

হয়ত কেহ বলিবেন, কলিতে ধর্ম্মের পুনঃ প্রচার কখনই হইবার নহে, এ চেষ্টা বৃথা হইবে। আমরা স্বীকার করি, কলিতে ধর্ম্মের সংকোচ হইবে, কিন্তু ধর্ম্মের নাশ হইবে না। তাহাতে আবার ধর্ম্মের অতি সংকোচের সময় এখনও অতি দূরবর্ত্তী। ধর্ম্মের যেমন হ্রাস হইয়াছে, আবার বৃদ্ধি হইবে। তৎপরে পুনর্ব্বার হ্রাস, পুনর্ব্বার বৃদ্ধি, ক্রমে হ্রাসের ভাগ অধিক এবং বৃদ্ধির বেগ অল্প হইতে হইতে,

রবরের গোলা যেমন উঠিতে পড়িতে, লাফাইতে লাফাইতে, ক্রমে ক্রমে স্থির হইয়া যায়, সেইরূপ ধর্ম্মও উঠিতে পড়িতে, নাচিতে নাচিতে, ত্রিজগৎ-পরিত্রাতা ভগবদবতার কল্কীদেবের পবিত্র চরণে বিলীন হইবে। বালক জন্মিলেই মৃত্যু আছে সত্য, কিন্তু শরীর-ধারণে যত বার রোগ হইবে, তত বারই সে মরিবে না, অনেকবার আরোগ্যলাভ করিয়া শেষবারে তাহার মৃত্যু হইবে। তাই বলিতেছি, কলির পরমায়ু ৪,৩২,০০০ বর্ষ, তন্মধ্যে গত হইয়াছে ৪,৯৭৮ বৎসর মাত্র, এখনও বাকী রহিয়াছে ৪,২৭,০২২ বৎসর ; অতএব কলির শৈশব-রোগেই ধর্ম্ম নষ্ট হইবে না, সুচিকিৎসা করিলে আরোগ্যলাভ ও ভারতের বিপুল গৌরব-বৃদ্ধি করিবে। অতএব সভা-সমিতি প্রভৃতির সাহায্যে সংশিক্ষা ও সদুপদেশের দ্বারা পিচ্ছিল ভূমিতে পতিত ভারতবর্ষকে উত্থাপিত ও প্রকৃতিস্থ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভারতে যথাবিধি ধর্ম্ম প্রচারিত হইলে, ভারতের শরীর, মনঃ, আত্মা ভগবানের আশ্চর্য্য বিভূতি-দর্শনে পুলকে পূর্ণিত হইবেই হইবে। ধর্ম্মের জয়-নিনাদে ভারত-গগন ছাইয়া যাইবে। পবিত্রতার বর্ষা-ধারায় ভারতের মলিন আবর্জ্জনা সমস্ত ধুইয়া যাইবে। ভারতের নির্ম্মল যশঃসৌরভে ত্রিলোক আমোদিত হইবে।

সত্যযুগে ধর্ম্ম চতুষ্পাদ ছিল এবং কলিযুগে একপাদ মাত্র বিদ্যমান আছে, তাহাও আবার সবল নহে, ক্রমে বিশীর্ণ হইয়া যাইতেছে, এই সংস্কারের বশীভূত হইয়া, এই শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের গুহ্য প্রহেলিকা উদ্ভেদ করিতে না পারিয়া, আমাদের বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছে যে, কলিযুগে ধর্ম্মের

বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই, এবং এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা সদ্ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ে ক্রমশঃ নিরাশ হইতেছি। স্বীকার করিলাম, সত্যযুগে ধর্ম্মের পূর্ণাবয়বে অনুষ্ঠান হইত, স্বীকার করি, ধর্ম্মবল ও তপোবল সত্যযুগের তুলনায় কলিযুগে অল্পমাত্রই অবশিষ্ট আছে। যাহার অবয়ব যত বড়, তাহার পরিধেয় বস্ত্রও তত বড় চাই। যুবতীর কাপড় ও বালিকার কাপড় এক পরিমাণের হয় না। বালিকার কাপড়ে যুবতীর সর্ব্বাঙ্গ আবৃত হয় না। বালিকার কাপড় যুবতীর পক্ষে ছোট হইলেও বালিকার পক্ষে তাহাই উপযুক্ত ও যথেষ্ট। সত্যযুগের লোকের প্রকৃতি, আকৃতি, পরমায়ু ও সামর্থ্য যে পরিমাণে ছিল, ধর্ম্মও সেই পরিমাণে বিদ্যমান থাকিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিতেন। কিন্তু কলিযুগের লোকের প্রকৃতি, আকৃতি, পরমায়ু ও সামর্থ্য যেরূপ, কলিধর্ম্মও শাস্ত্রমধ্যে সেইরূপ সুগম করিয়া ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যেমন যুবতীর কাপড়ের তুলনায় বালিকার কাপড় ছোট, কিন্তু বালিকার পক্ষে তাহাই পূর্ণ পরিমাণ, সেইরূপ কলির ধর্ম্ম সত্যের তুলনায় একপাদ হইলেও কলির পক্ষে তাহাই পূর্ণ, এবং তাহাই যথাবিহিতরূপ অনুষ্ঠিত হইলে, সত্যযুগের চতুস্পাদ ধর্ম্মাবলম্বীরা যে গতি প্রাপ্ত হইতেন, কলির ধর্ম্মাত্মাগণও সেই সদ্গতি লাভ করিয়া থাকেন।

মনুসংহিতায় লিখিত আছে—

"অন্যেকৃতযুগে ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে পরে।
অন্যে কলিযুগে নৃণাং যুগহ্রাসানুরূপতঃ॥"

অর্থাৎ যুগ-স্বভাবে মানবের পরমায়ুর হ্রাস হয়, এই জন্য যুগে

যুগে ধর্ম্ম-প্রকাশও বিভিন্ন। সত্যের ধর্ম্ম যাহা, ত্রেতার তাহা নহে, ত্রেতায় যেরূপ, সেরূপ দ্বাপরে নহে, এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে যেরূপ, কলিতে ধর্ম্ম সেরূপ নহে। মানব শাস্ত্রে অন্যত্র উক্ত হইয়াছে—

"কৃতে তু মানবা ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং গৌতমাঃ স্মৃতাঃ।
দ্বাপরে শাঙ্খলিখিতাঃ কলৌ পারাশরাঃ স্মৃতাঃ॥"

সত্যযুগে মহর্ষি মনুর ধর্ম্মমত, ত্রেতাযুগে তপঃসিদ্ধবুদ্ধি গৌতমের ধর্ম্মমত, দ্বাপরে শাঙ্খলিখিত মত, এবং কলিতে পূজ্যপাদ মহর্ষি পরাশরের প্রচারিত ধর্ম্মমতই প্রচলিত হইবে। মনুর মত শ্রেষ্ঠ ও পরাশরের মত নিকৃষ্ট, তাহা নহে; যুগ-প্রকৃতি-ভেদে ধর্ম্মানুষ্ঠানের পদ্ধতি ও প্রকার বিভিন্ন মাত্র। মনুর ধর্ম্ম সাধন করিয়া সত্যযুগের ধর্ম্মাত্মা যেমন পরম কল্যাণ লাভ করিয়াছিলেন, পরাশরের ধর্ম্ম-সাধক কলির মহাত্মাগণও সেই পরম কল্যাণের অধিকারী।

গভীরতা ও প্রশস্ততার মাত্রা গণনায় কলিযুগের ধর্ম্ম সত্যযুগের ধর্ম্ম হইতে ন্যূন বলিয়া স্বীকার করিতে প্রবৃত্তি হয় না। একটী কূপ মধ্যে একসহস্র-কলস জল থাকিলে তন্মধ্যে পড়িয়া অনেক বালক, যুবা, বৃদ্ধও ডুবিয়া মরিতে পারে; কিন্তু সেই জলটুকু যদি তুলিয়া একক্রোশ-ব্যাপী একটী ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে, সেই জলে একটী পিপীলিকার পাদাঙ্গুষ্ঠও ডোবে কি না সন্দেহ। কূপের জল ও ক্ষেত্রের জল পরিমাণে তো এক হইল, তবে মাঠের জল কূপজল হইতে অল্প দেখাইল কেন? কূপের জলে মানুষ ডুবিয়া মরিল, মাঠের জলের একটী পিপীলিকাও ডুবিলনা

কেন? কূপের জলের গভীরতা ছিল, বিস্তার অধিক ছিলনা। মাঠের জলের বিস্তার অধিক, কিন্তু গভীরতা নাই, তাই গভীর জলকে অধিক বোধ হইল এবং মাঠের জল অত্যল্প বলিয়া অনুমিত হইল। কিন্তু বস্তুতঃ জলের পরিমাণ কি কূপ হইতে ক্ষেত্রে অল্প ছিল? সেইরূপ ভগবানের সঞ্চারিত সমগ্র ধর্ম্মসাধনশক্তি সত্যযুগের প্রথম সৃষ্ট অল্প লোকের মধ্যে থাকায় গুরুগভীরতায় অধিক বোধ হইত, এবং প্রকৃতির নিয়মিত ও পরিমিত সেই শক্তি সৃষ্টির বৃদ্ধি ও বিশালতার সঙ্গে সঙ্গে লোক-সংখ্যা—জীব-সংখ্যা—অধিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যত পরিমাণে অধিক বিস্তৃত হইয়া গিয়াছে ও হইয়া যাইতেছে, ভৌতিক প্রকৃতি, ভৌতিক আকৃতি, ভৌতিক আয়ুষ্কাল, ও ভৌতিক সামর্থ্য তত পরিমাণে বিস্তৃত হইয়া দুর্ব্বল ও অল্প বলিয়া বোধ হইতেছে। অল্প লোক-ব্যাপ্ত সত্যযুগের শক্তি ও বহুলোক-ব্যাপ্ত কলিযুগের শক্তি একত্র করিয়া তুলা-দণ্ডে ধরিলে উভয়ের তারতম্য দেখা যাইবে না। একটা কূপে ২০ হাত জল থাকিলে লোকে বলে কূপে অনেক জল আছে, কিন্তু যদি একটা নদী লোকে হাঁটিয়া পার হয়, তাহা হইলে বলিয়া থাকে, নদীতে অল্প জল। কিন্তু বস্তুতঃই কি এ কথা সত্য? নদীর উৎপত্তি-স্থান হইতে সঙ্গম-স্থান পর্য্যন্ত যত জল আছে, তাহা কি কূপের জল হইতে বহু পরিমাণে অধিক নহে? তবে লোকে কূপের জল অধিক ও নদীর জল অল্প বলিল কেন? গভীরতা ও বিস্তারের মাত্রা-গণনাতেই লোকে এইরূপ বলিয়া থাকে, বস্তুতঃ পরিমাণের গণনায় নহে। সেকালে

গ্রামের মধ্যে একঘর জমীদার বাস করিতেন, তাঁহার বাড়ীতে হয়ত একসহস্র টাকা মূল্যের এক জোড়া ও পাঁচ শত টাকা মূল্যের এক যোড়া, এই দুই জোড়া কাশ্মিরী শাল ছিল, অন্য সাধারণ কাহারও ঘরে খুঁজিলে শাল পাওয়া যাইত না; অতএব সে গ্রামের মধ্যে মূল্যগণনাতে দেড় সহস্র টাকার শাল ছিল। কিন্তু এক্ষণে সেই গ্রামে হয়ত সেরূপ মূল্যের শাল একখানিও নাই, কিন্তু গড় হিসাবে দুই শত গৃহে পঞ্চাশ টাকা মূল্যের দুই শতখানি শাল আছে, অর্থাৎ সেই গ্রামে দশসহস্র টাকা মূল্যের শাল রহিয়াছে। সেকালে দেড়সহস্র টাকার শাল থাকাতেই গ্রামে বড় মানুষ আছে বলিয়া একটা খ্যাতি ছিল, এক্ষণে দশসহস্র টাকার শাল গ্রামের মধ্যে থাকিলেও উহা সাধারণ গৃহস্থের বা গরীবের গ্রাম বলিয়া পরিচিত। তখন এক জায়গায় দেড় সহস্র টাকার শাল ছিল, অর্থাৎ অল্প স্থানে মূল্যের গভীরতা ছিল, এই জন্য তাহার আধিক্য বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু এক্ষণে তাহা অপেক্ষা বহুগুণ পরিমাণে অধিক টাকার সামগ্রী থাকিলেও বিশালতায় অধিক ও গভীরতায় অল্প বলিয়া সেরূপ গৌরব হইল না। তদ্রূপ যুগের মধ্যে যদি দুই জন লোকও তপঃসিদ্ধির উচ্চ সীমায় আরোহণ করিতে পারেন, তবে তাঁহাদিগের যশঃ ও তাঁহাদিগের গৌরব চিরকাল বিঘোষিত হইয়া থাকে। কিন্তু অসিদ্ধ অবস্থায় যদি কোটী কোটী লোক কোলাহল করিয়া মরিয়া যায়, তবে তাহা-দিগের জন্ম মরণের সমাচার পর্য্যন্তও হয়ত কাহারও কর্ণ-গোচর হয় না। সত্যযুগে জ্ঞানবল, তপোবল, যোগবলা-

দির তীব্রাতিতীব্র বেগ এক একটী জীবনে অতি মাত্রায় পরিলক্ষিত হইয়াছিল, তাই ধর্ম্ম সম্পূর্ণাবয়ব বা চতুষ্পাদ-বিশিষ্ট বলিয়া সত্যযুগের গৌরব-বৃদ্ধি করিয়াছে। তাই বলিয়া কি স্বীকার করিব, সত্যযুগে দুষ্ট দুরাত্মার অভাব ছিল? তাই বলিয়া কি বলিব যে, সত্যযুগে সকল লোকই সুপ্রসন্ন ও সকল গৃহেই কি পুণ্য অক্ষুণ্ণ ছিল?

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥"

ভগবানের এই সদয় ও অভয়বাণী যদি সত্য হয়, তবে সত্যযুগে অবতারের সংখ্যা অধিক দেখিয়া সেই যুগে কি উপদ্রবের পরিমাণ অধিক বলিয়া মনে করিব না? বস্তুতঃ পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে যেমন ধর্ম্মের গভীরতা ও গুরুতা ছিল, সেই-রূপ পাপ ও উপদ্রবেরও গভীরতা ও গুরুতা ছিল। কলি-যুগের অন্যান্য বিষয়েও যেমন ক্ষীণতা জন্মিয়াছে, পাপ পুণ্য সম্বন্ধেও সেইরূপ দুর্ব্বলতা জন্মিয়াছে। স্বীকার করি, ধ্রুবাদি যেমন পরম ভক্ত জন্মিয়াছিলেন, তেমন একটী এখন আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও কি স্বীকার করিব না যে, হিরণ্যকশিপুর বিজাতীয় অত্যাচার ও উপদ্রব, রাবণের দুর্ব্বিসহ অসংখ্য অনর্থপাত, কংশের দুঃসহ দৌরাত্ম্য লোক সকলকে যেমন উদ্বেজিত করিয়াছিল, কলিযুগে সেরূপ আর দেখিতে পাওয়া যায় না। কলিতে একদেহে যেমন অতিমাত্রায় পুণ্য দেখিতে পাওয়া যায় না, তেমনি এক দেহে অতিমাত্রায় পাপও দৃষ্ট হয় না। তখনকার একজনের অখণ্ড পুণ্য ও আর এক জনের বিশাল

পাপ খণ্ড খণ্ড হইয়া কলির লক্ষ লক্ষ লোককে আশ্রয় করিয়াছে। কলিযুগে সেই জন্য পাপের গভীরতার হ্রাস হইয়া বিশালতার বৃদ্ধি হইয়াছে বটে, কিন্তু পুণ্যেরও তদ্রূপ গভীরতা সঙ্কুচিত হইয়া বিশালতার বৃদ্ধি হইয়াছে। গড়ে গণনা করিলে কলির আকার প্রকারের অনুরূপ কলির ধর্ম্ম যথোচিত বিদ্যমান আছে। আমরা সত্যযুগের মানব নহি, সুতরাং সত্যের সম্পূর্ণ ধর্ম্ম আমরা অনুষ্ঠান করিব কিরূপে? সত্যযুগে প্রকৃতির মৌলিক শক্তির সম্পূর্ণ আবির্ভাবে ও প্রচুর প্রভাবে লোক সকল—

"সত্যধর্ম্মরতো নিত্যং তীর্থানাঞ্চ সদাশ্রয়ঃ
বন্দন্তি দৈবতা সর্ব্বা সত্যে সত্যপরায়ণাঃ"

এইরূপ ছিলেন। ক্রমে প্রকৃতির বিকাশে ও বিস্তারে শক্তি সামর্থ্যের ঘনতা বা গভীরতার কিঞ্চিৎ হ্রাস হওয়ায়, ধর্ম্ম ত্রিপাদ রহিল, ও একপাদ পাপ প্রবেশ করিল। তখন—

"দানধর্ম্মরতা নিত্যং তপস্যা তীর্থদর্শনং
অগ্নিহোত্রপরা লোকা ব্রাহ্মণো যজ্ঞকারিণঃ"

সমাজে ধর্ম্মের চিত্র এইরূপে অঙ্কিত হইল। প্রাকৃতিক শক্তি ও ক্রিয়ার ব্যাপকতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শক্তি ও সামর্থ্য বা মানবাধিকারের ঘনতা ও গভীরতার আরও হ্রাস হইল, তখন সংসারে পাপের মাত্রা আর একপাদ বাড়িল—

"ধর্ম্মাধর্ম্মরতা লোকাঃ প্রজাপিড়াপরাঃ সদা।
জ্ঞাননিষ্ঠঃ কপটবাক্ দ্বাপরে রাজবিস্তরঃ॥"

এই সময়ে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উভয়েরই সমান আধিপত্য,

জন-সমাজ জ্ঞাননিষ্ঠ হইলেও প্রলাপী, চঞ্চলস্বভাব, ও কপটাচারী হইয়া উঠিল। ক্রমশঃ এদিনও কাটিয়া গেল— দুর্দ্ধর্ষ কলিরাজের অধিকার বিস্তৃত হইল—অর্থাৎ প্রকৃতির শক্তিরাশির ঘনগভীরতার অতিশয় পরিমাণে হ্রাস হইয়া অতি ব্যাপ্তিতে পরিণত হওয়ায় জীবের অধিকার ও সামর্থ্য আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িল—আর অমনি ধর্ম্মরাজ্যের সীমা এইরূপে চিত্রিত হইল—

"ধর্ম্মঃ সঙ্কুচিতস্তপোবিরহিতং সত্যঞ্চ দূরং গতং।
লোকা ধর্ম্মাহতাঃ দ্বিজাশ্চ লুভিতা নারীবশা মানবাঃ॥"

কলিতে ধর্ম্ম নষ্ট হয়েন নাই; কিন্তু সঙ্কুচিত—বিকাশ-বর্জ্জিত —অর্থাৎ জড়সড়ো হইলেন, লোকে কঠোর তপস্যায় বিমুখ হইল, সত্য দূরে পলাইয়া লুক্কায়িত হইলেন, অধর্ম্ম কার্য্যে লোক বিমুগ্ধ হইল, দ্বিজাতিগণ লোভী ও মানব মাত্রেই নারীর বশীভূত হইয়া উঠিল।

যখন যেমন পীড়া হয়, তখন তাহারই উপযুক্ত চিকিৎসক ও ঔষধ পথ্যাদির ব্যবস্থা চাই। সত্যে মনু, ত্রেতায় গৌতম, দ্বাপরে শঙ্খ, ও কলিতে পরাশর চিকিৎসার ব্যবস্থাপক; তাঁহাদের প্রচারিত মতসম্মত আচার ব্যবহারাদিই সুপথ্য, ও যুগেযুগে যে তারকব্রহ্ম নাম নিরূপিত হইয়াছে, তাহাই মহৌষধ। সত্যে ভবরোগ নিবারণার্থ—

"নারায়ণঃ পরাবেদা নারায়ণঃ পরাক্ষরাঃ।
নারায়ণঃ পরামুক্তি র্নারায়ণঃ পরাগতিঃ॥"

এই মহৌষধ নিরূপিত হইয়াছিল। ত্রেতায় লোক-প্রকৃতি অনুসারে সংসার-যাতনা-নিবৃত্তির জন্য—

"রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন।
কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন॥"

এই অমোঘ ঔষধের ব্যবস্থা হইয়াছিল। দ্বাপরে সংসারের উৎকট পীড়ারোগ্যের জন্য

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ॥"

এই মহৌষধ নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। কলির দুরারোগ্য কালব্যাধি যখন আসিয়া জীবকে আশ্রয় করিল, তখন ভগবানের কৃপায় পরীক্ষিত ('experimented' ও 'patent') ঔষধ—মহারাজ পরীক্ষিতকর্ত্তৃক পরীক্ষিত ভগবন্নামানু-কীর্ত্তনরূপ মহৌষধ—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

ভবব্যাধি-বিনাশার্থ বিহিত হইয়াছে। কলির কাল-রোগের চিকিৎসক পরাশর ব্যবস্থা করিয়াছেন—

"তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে
দ্বাপরে যজ্ঞমিত্যাহু র্নামমেকং কলৌযুগে॥"

সত্যের ধর্ম্ম—তপস্যা, ত্রেতার ধর্ম্ম—জ্ঞান, দ্বাপরের ধর্ম্ম—যজ্ঞার্চ্চন, এবং কলিযুগের ধর্ম্ম—নামসাধন।

সত্যের ধর্ম্ম ভাল বা বড় ছিল, কলির ধর্ম্ম মন্দ বা ছোট ইহা কেহ মনে করিবেন না। সত্যযুগের প্রকৃতিতে জ্বর যেরূপ ফুটিয়াছিল, তপস্যাদিই সেই পীড়াশান্তির সুপথ্য ছিল; আবার কলিযুগের প্রকৃতিতে বিষম ব্যাধি হইয়াছে, তাহার শান্তির জন্য শাস্ত্র নাম-সাধনার সদ্ব্যবস্থা করি-

য়াছেন। ফলতঃ সত্যের মহাত্মারাও যেমন কল্যাণলাভ করিয়াছিলেন, কলির ভগবৎ-সেবকগণও সেইরূপ সিদ্ধ-মনোরথ হইবেন। শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে—

"কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতোমখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥"

বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

"ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবম্॥"

সত্যযুগে বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া, ত্রেতায় জ্ঞানযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া, দ্বাপরে যজ্ঞেশ্বরের পরিচর্য্যা করিয়া, মানব-গণ যে ফললাভ করিতেন, কলিযুগে হরিনাম-সাধনা করিয়াও লোক সকল সেই মহাফল প্রাপ্ত হইবেন। আমরা কলিতে জন্মিয়াছি, যুগপ্রভাবে আমাদের যেমন বল, যেমন অধিকার, যতটুকু সামর্থ্য আছে, তদনুসারে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারিলেই আমাদিগের মানব জন্ম সফল হইবে। বর্ত্তমান কাল কলিযুগ বলিয়াই ঘৃণিত হইবে কেন? শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে—

"কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তিহ্যেকো মহদ্‌গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ॥
কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যাঃ গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সংকীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বঃ স্বার্থোঽপি লভ্যতে॥"

হে রাজন্! কলি অশেষ দোষের আকর লইলেও ইহার একটী মহৎ গুণ আছে এই যে, অন্যান্য যুগে বহুকষ্টে জীবের যে ভববন্ধন-মোচন হইত, কলিযুগে কেবল ভগবানের নাম

সংকীর্ত্তন করিলেই জীবের সেই সংসার-বন্ধন-মোচন হইয়া যাইবে। সারগ্রাহী গুণজ্ঞ সজ্জনগণ বলিয়া থাকেন যে, কলিযুগে ভগবানের নাম-সংকীর্ত্তনেই মানবের সমস্ত মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। অতএব যুগধর্ম্ম-সাধনে নানা কারণে আমাদিগের মধ্যে যতটুকু অযথোচিত মলিনতা আসিয়াছে, সেই মলিনতাটুকু যেরূপ উপদেশে, যেরূপ প্রথাবলম্বনে, ও যেরূপ উপায়-নির্দ্ধারণে বিদূরিত হইয়া যাইবে, তাহাই 'ভারতে ধর্ম্ম-প্রচার'।

অনেকে হয়ত বলিবেন—

> "হতে ভীষ্মে হতে দ্রোণে কর্ণে চ বিনিপাতিতে।
> আশা বলবতী রাজন্ শল্যঃ জেষ্যতি পাণ্ডবান্॥"

যে পাণ্ডবদিগের মহারণে ইচ্ছামৃত্যু মহাবীর ভীষ্ম, যুদ্ধবিদ্যার পরমগুরু দ্রোণাচার্য্য, অক্ষয়কবচ-কুণ্ডলধারী কর্ণ নিপাতিত হইলেন, হে রাজন! আশা এমনই বলবতী যে, শল্যের ন্যায় সামান্য সেনাধীশ সেই পাণ্ডবগণকে পরাভব করিবে, ইহাও মনে স্থান পাইল। যে ভারতের ধর্ম্ম নানা জটিল তর্কজালের তাড়নায় পড়িয়া কত কুসংস্কার-বিজড়িত হইয়া গিয়াছে, বারংবার পরাধীনতার পদাঘাতে যে ভারতীয় ধর্ম্মের উজ্জ্বল মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহার পূর্ব্বদশা পুনর্লাভের আর কি সম্ভাবনা আছে? যে ভারতের ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য জগদ্গুরু স্বয়ং শঙ্কর শঙ্করাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া শাস্ত্র ও শস্ত্রের সাহায্যে বিধর্ম্মীর দলবল বিমর্দ্দন করিয়াও সাময়িক উপকার ভিন্ন স্থায়ী উপকার সাধন করিতে সক্ষম হয়েন নাই, যে ভারতে মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ,

নিত্যানন্দ প্রভৃতি বৈকুণ্ঠের বিজয়-শঙ্খ বাজাইয়া হরিনামের সুধাবৃষ্টি করিয়াও সমস্ত লোকের মন ভিজাইতে পারেন নাই, সেই পাপ-পাষাণ হৃদয় গলাইতে, সেই বজ্রলেপময় কঠিন হৃদয়ের স্তর ভেদ করিতে, কি তোমার আমার ন্যায় কোন ক্ষুদ্র ব্যক্তি কখন সমর্থ হইবে? আমারা এ সমস্ত আপত্তি অবনত মস্তকে অঙ্গীকার করিয়াও সাহসে ও উৎ-সাহে হৃদয়কে বাঁধিব এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ মাত্রকে ভরসা করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইব। পূর্ব্বোক্ত মহাপুরুষ-গণ সকল লোকের মনের মত কাজ না করিয়া গেলেও তাঁহারা যাহা করিতে আসিয়াছিলেন, তাহা সুসম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন।

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্॥"

এই মহামন্ত্ররূপ মহাবাক্যকে আশ্রয় করিয়া অকূল সমুদ্রে ঝাঁপ দিব, অকূলের কাণ্ডারী হরি কূলে উঠাইয়া দিবেন, ইহাই আমাদিগের বিশ্বাস।

একবার আমি তীর্থযাত্রাকালে একটী পাষাণ-নির্ম্মিত অতিশয় সুদৃঢ় প্রাচীন দুর্গদ্বার দর্শন করিয়াছিলাম। উহা যে কখনও বন্যার বেগে, বর্ষার বেগে, প্রবল বায়ুর বেগে, অথবা গোলার আঘাতে, ভাঙ্গিয়া পড়িবে, এরূপ আশঙ্কা ছিল না। প্রতিষ্ঠাতা বহু ব্যয়ে, বহু যত্নে উহাকে দৃঢ় হইতেও দৃঢ়তর করিয়াছিলেন। কিন্তু দেখিলাম, কি জানি, কোন্ ক্ষণে একটী বটের বীজ তাহার উপর পড়ি-য়াছিল, আকাশে প্রবহমান বায়ু হইতে রসকণিকা পান-

করিয়া ধীরে ধীরে ঐ বীজটী তথায় অঙ্কুরিত হইয়াছে। তাহার মূল ধীরে ধীরে যোড়ের মুখের ভিতর দিয়া ভিতরে ভিতরে বিস্তারিত হইয়াছে। ক্ষুদ্রাবয়বে একটী বৃক্ষ আকাশকে লক্ষ্য করিয়া উপরের দিকে উঠিল। ক্রমে ক্রমে তাহার কাণ্ড ও মূল পুষ্ট ও বিশাল হইতে লাগিল, বজ্রলেপ-ময় পাষাণের যোড়ের মুখ খুলিয়া গেল। সেই দুর্জ্জয় দ্বার একটী বীজের প্রবল পরাক্রম-পূর্ণ বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়াছে। শিক্ষিত সভ্য মহোদয়গণ! বিধর্ম্ম ও কদাচারের দুর্গদ্বার যতই দুর্জ্জয় হউক না কেন, কিন্তু যদি পবিত্র আর্য্যকুলের একটী মাত্র জীবন্ত বীজও ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে নিশ্চয় জানিবেন, তিনি ব্রহ্মাণ্ডপুরীর ঊর্দ্ধ আকাশের ঊর্দ্ধতন পরম ধামের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইবেন। তাঁহারই তেজস্বিনী বাণী শুনিয়া, তাঁহারই সদাচারকে আদর্শ করিয়া, লোকের হৃদয় মন নাচিয়া উঠিবে, বিধর্ম্মের বিজয়-পতাকা উৎপাটিত হইয়া ভূমিতে পড়িবে, দুর্দ্ধর্ষ দুরাচারের পাষাণ-রাশি খণ্ড খণ্ড হইয়া ধরার ধূলি-রাশিতে মিশাইবে। আবার সনাতন স্বধর্ম্মের সিংহনাদে এই দুরাচারের দুর্জ্জয় ও দুর্ভেদ্য দুর্গ সাধু সজ্জনের অধিকৃত হইয়া, শিষ্টাচার-বিহিত নিয়ম নিষেধের ব্যবস্থা বিস্তৃত হইবে। তখন ধর্ম্মের বিজয়-ভেরী বাজিয়া আকাশ পাতাল পুলকিত করিবে।

ব্রহ্মলোক-নিবাসি তেজস্বি তপস্বি মুনি মহাত্মাগণ! তোমা-দিগকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অভিবাদন করি। একবার তোমরা সকরুণ দিব্য দৃষ্টিতে তোমাদের ভারতের প্রতি নেত্রপাত কর, এক-

রার তোমাদের কুলজাত দুর্ব্বলাধিকারী কদাচারী আমাদের ন্যায় সন্তানগণের প্রতি কৃপাদৃষ্টি কর, তোমাদের সেই দিব্য তেজঃ, তোমাদের সেই পবিত্র বল, তোমাদের নির্ম্মল বুদ্ধি, তোমাদের সেই স্বধর্ম্ম-সাধন-সামর্থ্য, তোমাদের সেই শক্তি, সেই ভক্তি, আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত করিয়া দাও, তোমাদের আশীর্ব্বাদরূপ স্পর্শমণি-স্পর্শে লৌহরূপ আমাদের মলিন মন নির্ম্মল কাঞ্চন হইয়া যাউক। হে ধর্ম্মস্বরূপ! হে পতিত-পাবন ভগবন্! তোমাকে বারংবার প্রণাম করি, তুমি এই পতিত ভারতে ধর্ম্ম-প্রচারের সুপথ দেখাইয়া দাও। তোমার চিরসেবক ভারতবর্ষ কৃতার্থ হইয়া যাইবে।

ওঁ হরিঃ ওঁ।

ভারতের আর্য্যভাব।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। হরিঃ ওঁ॥

ডুবিল—সমস্তই ডুবিল—ক্রমে ক্রমে কালসাগরে সমস্তই ডুবিল! ডুবিয়া কালসাগরের অধস্তন প্রদেশের কোন্ গুহ্য স্থানে সমস্ত লুক্কায়িত হইল, তাহা অনুসন্ধান করিয়া আর পাওয়া যায় না। * পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি কত জীব জন্মিল, কত ঘটনা ঘটিল, কালস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে আবার তত্তাবৎ মহাকালসাগরে ডুবিয়া গেল। সমস্তই যেন নাট্য-শালার অভিনয়ের ন্যায়, ভোজবাজী, ছায়াবাজীর ন্যায়, ক্ষণ জন্য কিয়ৎ পরিমাণে কার্য্য করিয়া—ক্রীড়া কৌতুক খেলা করিয়া লীলাময়ীর লীলা-পটের অন্তরালে প্রবেশ করিল। এ কুহক কে বুঝিবে?

এক সময় যে স্থান হিংস্রজন্তু-সমাকীর্ণ গহন বিজন কানন ছিল, তাহাই আবার কাল-সহকারে সুরম্য হর্ম্ম্যমালা-মণ্ডিত রাজরথ্যা-পরিশোভিত সুবিস্তৃত মনোহর নগর হইয়া উঠিল;

---

* মুঙ্গের-আর্য্যধর্ম্ম-প্রচারিণী সভার বার্ষিক উৎসবকালে এই শাস্ত্রার্থ-পূর্ণ সুললিত বক্তৃতা হইয়াছিল। শ্রোতা মাত্রেই নিস্পন্দ ভাবে আদ্যোপান্ত শুনিয়া পরম সুখী হইয়াছিলেন।

যে স্থান এক সময়ে রাজন্যবর্গের পুলকময়ী পুরী ও সুশোভনা রাজসভা ছিল, কাল-প্রভাবে সেই স্থান জনশূন্য অরণ্য ও প্রান্তরে পরিণত হইল। চিরদিন একভাবে যায় না। কোন লোক বা কোন দেশ এক অবস্থাকে আলিঙ্গন করিয়া চির-দিন দুঃখে বা সুখে যাপন করে না, ইহা স্বভাব-সিদ্ধ সত্য। এই পরিবর্ত্তনই বিধাতার বিচিত্র মহিমার পরিচয় প্রদান করিতেছে। আমাদের এই ভারতবর্ষই বিপুল বিপ্লবের একটী প্রধান আদর্শ-স্থল। ইহার অভ্যুদয়-দর্শনে একদিন ভুমণ্ডল বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল। আজ সেই ভারতবর্ষের সেই শুভদিনের সুচিহ্ন-রাশি কোথায় তিরোহিত হইল! রাজপুরী আজ শূন্য শ্মশান-ভূমি হইয়া দাঁড়াইল! সুমধুর সামগান-শ্রবণে একদিন বনের পশু পর্য্যন্ত স্তব্ধ ও বিমোহিত হইয়াছিল; যজ্ঞধূমে একদিন ভারতীয় গগন-মণ্ডলে সুধা-কণাবর্ষী মেঘমালা বিরচিত হইয়াছিল; একদিন গাণ্ডীবের জ্যানির্ঘোষে দিগ্দেশ কাঁপিয়া উঠিয়াছিল; একদিন গদায়ুধ-ধারী বীরবর্গের গগনভেদী গভীর গর্জ্জনে ভারত টলমল করিয়া উঠিয়াছিল; বিজয়ভেরী-নিনাদে বিপক্ষবর্গের কর্ণ বধির করিয়া একদিন ভারত নৃত্য করিয়াছিল। আজ সেই ঋষি তপস্বী ও বীরগণের প্রসূতি ভারত-ভূমি অকুল-কাল-তরঙ্গে উলটি পালটি খাইয়া কলিমল মহাসাগরের অতল-গর্ভে ডুবিয়া গেল! যোগীন্দ্র, যতীন্দ্র, মুনীন্দ্র, সিদ্ধ সাধক-গণ দৃষ্টির অগোচর মার্গে অন্তর্হিত হইলেন। দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপে প্রচণ্ড-তাপবর্ষী রণধীর বীরবর্গ অস্ত্র, শস্ত্র, স্বার্থ সামর্থ্য সহিত কোথায় অদৃশ্য হইলেন। সসাগরা বসুন্ধরার

একচ্ছত্রী ভূপতিগণ তেজোহীন, বীর্য্যহীন, শৌর্য্য ও সাহস-বিহীন, অবশেষে চৈতন্য-শূন্য হইয়া একে একে অতীত কালের নিভৃত ক্রোড়ে শয়ন করিলেন। দুর্গোৎসবের বিজয়া-দশমীদিনের ন্যায়, ভারতের চারিদিক যেন শোভা, সৌন্দর্য্য, ও আনন্দ-পরিশূন্য হইয়া উঠিল। শ্রুতি, স্মৃতির কার্য্যকলাপ প্রায় লুপ্ত হইয়া আসিল। দেবভাষার অনুশীলনে লোকের অনাদর জন্মিল। লোক সকল ব্রহ্মচর্য্য-সাধনে পরাঙ্মুখ হইয়া উঠিল। সদাচারের ভাণ করিয়া শঠগণ কপটাচার করিতে লাগিল। ব্রহ্মবিচারণা হৃদ্‌কমলাসন হইতে বিতাড়িত হইয়া রসনাসনে উপবিষ্ট হইলেন। হরি-প্রিয়া লক্ষ্মী আর ভারত-প্রকৃতির কোমল-ক্রোড়ে বসিয়া ক্রীড়া করিতে চাহেন না। ভারতের গুণগৌরব-রাশি দিন দিন উপেক্ষার প্রবল পদাঘাতে বিচূর্ণ ও বিনষ্ট হইতে লাগিল। পাপাতপের প্রচণ্ড জ্বালামালা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য লোক সকল আর সদ্ধর্ম্মকল্পতরুর শীতল ছায়ায় বসিতে চায় না। লোভে, দুরাচারে, নিষ্ঠুরতা, ও বৃথা বিবাদে মনের বেগ প্রধাবিত হইয়া উঠিতেছে। সৎ-কার্য্য ও সৎকথার প্রসঙ্গ শুনিলে লোকের শ্রুতিপীড়া উৎপন্ন হইতেছে। অসন্তোষ, অভিমান, দম্ভ, মাৎসর্য্যরূপ সুরাপানে লোক প্রমত্ত হইয়া উঠিতেছে। আলস্য, ঔদাস্য, শোক, রোগ, দ্বেষ, দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, বিষাদ, বিলাস আদিতে ভারতীয় আর্য্যভাবের মূলদেশ উৎখাত হইতেছে। নীচা-শয়তা, অনৃতভাষণ, বিপুল তৃষ্ণা আদিতে আর্য্যহৃদয় ক্রমে মলিন হইয়া উঠিতেছে। নারীগণের স্বেচ্ছাচারিতায়,

বেদের অযথার্থ ব্যাখ্যায়, প্রজাদুঃখ দূরীকরণে রাজার উপেক্ষায়, ব্রাহ্মণগণের বেদ বিদ্যার অশিক্ষায়, সাধনমার্গের অবৈধ দীক্ষায়, ভারতীয় আর্য্যভাবের তীব্রতেজঃ ক্রমে মলিন হইয়া আসিতেছে। ধর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া কেবল জল্পনা মাত্রে, বিহিত কালে, বিহিত পাত্রে, ও বিহিত স্থানে দান না করিয়া কেবল খ্যাতি-বৃদ্ধি ও পদবী-প্রাপ্তির আশয়ে ভুরী ব্যয় করিয়া আর্য্যহৃদয়ের আর্য্যভাব ক্রমশঃ ক্ষুণ্ণ হইয়া যাইতেছে। নির্লজ্জতা, ধূর্ত্ততা, কপটতা, দুঃসাহস, ও দুঃশী-লতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, এবং পরোপকার ভাণ করিয়া স্বার্থপরতা-সাধনের প্রচণ্ড উদ্যমে আর্য্যভাব মলিন হইয়া যাইতেছে। পরমায়ু, পরাক্রম, মেধা ও পবিত্রতা, সত্যানু-রাগ ও তপস্যাচার, এবং সৌভাগ্যসুখ ও শারীরিক স্বাস্থ্য, কি জানি, ভারতের ভাগ্যে কোথায় তিরোহিত হইতে লাগিল। ধনবান্‌কেই জ্ঞানবান্, গুণবান্, আচারবান্, ও কুলীন বলিয়া লোকে ব্যাখ্যা করিতেছে। গুরুগণের মর্য্যাদা-লাঘব, নির্দ্ধন পণ্ডিতের গৌরব-হ্রাস, অধিক বয়স্কের প্রতি অমর্য্যাদা আদির কুবাতাসে আর্য্যভাবের গৌরবতরী বুঝি কালসাগরের অগাধ গর্ভে ডুবিয়া যায়! কুল গোত্রা-দির বিচার উঠিয়া গেল, নিজের অভিরুচি হইলেই পতি-পত্নীভাব সংস্থাপিত হইতে লাগিল। শাস্ত্রের শাসন কে মানে? নিজের অমার্জ্জিত বুদ্ধি শ্রুতি বিধি ব্যবস্থার-স্থান অধিকার করিল। সূত্র থাকিলেই ব্রাহ্মণ, দরিদ্র হইলেই অমানুষ, বহুভাষণ করিতে পারিলেই পণ্ডিত, এইরূপ ধারণা লোক মধ্যে অধিক প্রচলিত হইয়া উঠিল।

আত্মবিচ্ছেদে, অন্তর্ব্বিবাদে, এবং গৃহ-কলহের কুজ্‌ঝটিকায় আর্য্যভাবের স্বরঞ্জিত রবিচ্ছবি ছাইয়া গেল। পিতা মাতা পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রীকেই পরিবার বোধে পরিপালন করিতে পারিলেই পৌরুষ। পিতা, মাতা, ভ্রাতা আদিকে অনাদর করিয়া ননন্দা ও শ্যালকের সহিত আত্মীয়তা-স্থাপনই পরম সভ্যতা, এই অভিনব রীতির প্রবল তরঙ্গে ভারতীয় আর্য্যভাব অতি বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে। সংসারকে সার মনে করিয়া লোকের চিত্ত ভগবদ্বিমুখ হইয়া উঠিতেছে। অশেষ ক্লেশে পড়িয়াও লোকের ভগবৎ-স্মরণ হইতেছে না। বারবনিতা-বিলাসে ও বারুণীর বিষম উচ্ছ্বাসে ভারতীয় আর্য্যভাবের প্রতিভা মলিন হইয়া আসিতেছে। মহর্ষি ও মহাত্মাগণের পবিত্র ধাম ভারতের পবিত্র নাম, আজ আমাদের অদৃষ্ট-দোষে বুঝি, চিরদিনের জন্য কালসাগরের গভীর গর্ভে ডুবিয়া যায়!

শরীরের কিঞ্চিন্মাত্রও স্পন্দন থাকিতে মনুষ্য জীবনের আশা পরিত্যাগ করিতে পারে না। ভারতের দুর্দ্দমনীয় দুর্দ্দশারাশি উপস্থিত হইলেও ভারতবাসী তাহার জীবনের সম্পূর্ণ আশা পরিত্যাগ করিতে এখনও প্রস্তুত নহে। এখনও যে সাগরাম্বরা বসুন্ধরার মানচিত্রের দক্ষিণাংশে ভারতের চিত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে, এখনও যে সমুচ্চশীর্ষ হিমাচল-চূড়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ভারতের ধূলিরাশিতে মিশ্রিত হয় নাই, ইহার কারণ কি? এখনও যে ভারতীয় নদ নদী বিশুষ্ক হইয়া বালুকাস্তূপে পরিণত হয় নাই, এখনও যে ভারতের বিশাল ভূভাগ রসাতলে প্রবেশ করে নাই, ইহার কারণ কি? ভারত শ্মশান-শয্যায় শয়ন করিয়া বলবীর্য্য-বিহীন ও

নিস্তেজ হইয়া এখনও যে জীবিত রহিয়াছে, ইহার কারণ কি? ভারত দুর্ব্বল ও অচেতন হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও ইহার প্রাণ মজ্জাভেদ করিয়া বহির্গত হয় নাই। ভারত অমৃতপানে অমর হইয়া রহিয়াছে।

ধর্ম্মই ভারতের প্রাণ, ধর্ম্মই ভারতের জীবন, ধর্ম্মই ভারতের বলবীর্য্য, ধর্ম্মই ভারতের সৌন্দর্য্য, ধর্ম্মই ভারতের সম্পত্তি, ধর্ম্মই ভারতের সর্ব্বস্ব। ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া ভারত জীবনধারণ করিয়া থাকে। এত দুর্দ্দশায় পড়িয়াও, এত দুর্ব্বিপাকে নিপীড়িত হইয়াও, অকাতরে বিঘ্ন-বজ্রাঘাত মস্তকে সহ্য করিয়াও ভারত যে এখনও জীবিত আছে, ভারতের ধর্ম্মপরায়ণতাই তাহার কারণ। ধর্ম্মশূন্য হইয়া ভারত মুহূর্ত্তমাত্রও জীবিত থাকিতে পারে না, কেননা ধর্ম্মশূন্য হইলেই ভারত প্রাণশূন্য হইবে। ধর্ম্ম ছাড়িয়া ভারত কোন কর্ম্মই করিতে পারে না। ভারতের প্রত্যেক কার্য্যই ধর্ম্মমূলক। ভারত ভোজনে, শয়নে, স্বপ্নদর্শনে, জাগরণে, গমনে, ও আগমনে ভগবানের নাম স্মরণ করে। ভারত বিবাহে ও উৎসবে, সম্পদে ও বিপদে, সমরে ও প্রিয়সঙ্গমে ভগবানের নাম করিয়া থাকে। ভারত বিদ্যাশিক্ষাকালে, এমন কি, একখানি ক্ষুদ্র লিপি লিখিতে হইলেও, বলিতে কি, ভারত যে কোন কার্য্যেই প্রবৃত্ত হউক না কেন, ভগবান্‌কে স্মরণ না করিয়া, ধর্ম্মভাবে নিমগ্ন না হইয়া, ভারত কখনই থাকিতে পারে না। ভারতই আপনার জীবনকে সার্থক করিয়া প্রেমাবেশে বিভোর হইয়া জগজ্জননীর নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে বলিয়াছিল—

"প্রাতরুত্থায় সায়াহ্নং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ
যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্।"

প্রাতরুত্থানপূর্ব্বক সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত, ও সন্ধ্যা হইতে প্রাতঃ-কাল পর্য্যন্ত, আমি যাহা কিছু করিয়া থাকি, হে জগন্মাতঃ! সে সমুদয়ই তোমার পূজা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এরূপ ভগবদ্ভাবে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক প্রণতি সহ স্তুতি করিতে ভার-তীয় আর্য্যমহাপুরুষগণ ভিন্ন আর কে পারিয়াছে? শরীর রক্ষা, পরিবার-পরিপালন, সমাজ-সংরক্ষণ প্রভৃতি সকল কার্য্যই আর্য্যজাতির ধর্ম্মভাব-প্রসূত। ভূতভাবন ভগবা-নের প্রীত্যর্থেই আর্য্যজাতির যাবৎ কার্য্যই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই জন্যই আর্য্যকণ্ঠ গাহিয়াছিল—

"প্রত্যক্ষধর্ম্মো ভগবান্ যস্য তুষ্টো হি কর্ম্মভিঃ।
সফলং তস্য জন্মাহং মন্যে সদ্ধর্ম্মচারিণঃ॥"

ধর্ম্মসাক্ষী ভগবান্ যাঁহার কর্ম্মে পরিতুষ্ট, সেই ধর্ম্মচারী ব্যক্তিরই জন্ম সফল। ধর্ম্মলাভ করিতে হইলে যদি নানা প্রকার হানি, গ্লানি, ও ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়, আর্য্যজাতি তাহাতে কখনও বিমুখ নহেন। ধর্ম্মের জন্য তাঁহারা সমাজ ত্যাগ করিয়াছেন, পারিবারিক সুখৈশ্বর্য্য-সম্ভোগে জলাঞ্জলি দিয়াছেন, ইচ্ছাপূর্ব্বক বিষয়, বিলাস, ও বাসনা বিসর্জ্জন দিয়াছেন, সংসারের সমস্ত সুখকে তৃণবতুচ্ছ করিয়াছেন, কঠোর ব্রতনিয়মের অনুষ্ঠানে দেহকে বিশুষ্ক, এমন কি, সময়ে সময়ে ধর্ম্মের জন্য মৃত্যুকেও আনন্দপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়াছেন। ধর্ম্ম ভারতের পরম আদরের বস্তু। ধর্ম্মানু-রাগে রঞ্জিত হইয়া আর্য্যজাতির জয়-পতাকা অষ্টকুলাচলের

চূড়ায় চূড়ায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কর্ম্মের দোষে, মনের দোষে আর্য্যজাতির ভাব-প্রতিষ্ঠার চিহ্নচয় ক্রমে মলিন হইয়া আসিতেছে। আবার পূর্ণ উদ্যমে, পূর্ণ উৎসাহে, পূর্ণ প্রযত্ন করিতে পারিলে এই বিশ্ববিজেত্রী আর্য্যজাতির গৌরব সংরক্ষিত হইতে পারে।

আর্য্যজাতির রীতি নীতি ও ধর্ম্মভাবাদি স্মরণ হইলে এখনও আমাদিগের পাষাণ হৃদয় আনন্দের আবেগে বিগলিত হইয়া নৃত্য করিতে থাকে। তাঁহাদিগেরই সুচারু-চরিত কথার প্রসঙ্গাধীন আলাপ করিয়া এখনও আমরা ভারতের আত্মগৌরব প্রকাশ করিয়া থাকি। তাঁহাদের সন্তান বলিয়া আমরা এখনও লোক-সমাজে মুখ দেখাইতে পারিতেছি। আমাদের ত নিজ কীর্ত্তি, নিজ গুণ, নিজ লোক-বিস্ময়কর ভাব কিছুই নাই, কেবল তাঁহাদের নামেই আমরা এখনও লোক-মণ্ডলী মধ্যে পরিচয় দিবার অধিকারী রহিয়াছি। আমাদের যে বল, যে বীর্য্য, যে সাহস, যে তেজ, যে জ্ঞান, যে রীতিনীতি, যদি তাঁহাদের বংশ-সম্ভূত বলিয়া আমাদের পরিচয় দিবার অধিকার না থাকিত, যদি তাঁহাদের পরম তেজোবীর্য্যশোণিতের কণামাত্রও আমাদিগের ধমনীতে না বহিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এতদিন বিদেশীয় প্রতাপে, বিদেশীয় সভ্যতায়, বিদেশীয় তেজঃপ্রভাবে আমাদিগকে পবিত্র ভারতক্ষেত্র পরিহারপূর্ব্বক পৃথিবীর কোন অরণ্য বা লোকসমাগম-শূন্য ভূমিকে আশ্রয় করিতে হইত। "আর্য্য" এই বিচিত্র বীর্য্য-গর্ভ শব্দটী শুনিবামাত্র যেন হৃদয়ে একটী জাতীয় অনুরাগের উদয় হইয়া থাকে।

যেন সেই ভাবের সহিত ধর্ম্মভাব মিশ্রিত হইয়া, হৃদয়ের ভাবরাশিকে মধুর হইতেও মধুরতর করিয়া তোলে। "আর্য্য" শব্দটী জিহ্বাগ্রে উচ্চারিত হইতে না হইতে, যখন ভারত সত্নুৎসাহের উত্তালতরঙ্গে নৃত্য করিতে থাকিবে, যখন "আর্য্য সন্তান" বলিয়া ডাকিবামাত্র দেখিব, আর্য্যাবর্ত্ত, ব্রহ্মাবর্ত্ত, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি ভারতের দিঙ্মণ্ডল-নিবাসিগণ ধর্ম্মভাবে উত্তেজিত ও উৎসাহিত হইয়া একস্বরে উত্তর প্রদান করিবে, তখনই আমরা কৃতার্থ হইব; তখনই আমরা তাঁহাদিগের সৎকীর্ত্তি-কল্পলতিকার সুরভিকুসুমা-ঘ্রাণের উপযুক্ত অধিকারী হইব। • • •

যে দিন আমরা গ্রাসাচ্ছাদনাদির জন্য পরাধীন ও পর-মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিব না, যে দিন স্বদেশ শাসন করিবার জন্য আমরা সম্পূর্ণ সমর্থ হইব, যে দিন পীড়া-শান্তির জন্য পাশ্চাত্য জগতের ঔষধ-প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিব না, যে দিন দেশীয় রীতিনীতির সংশোধন আবশ্যক হইলে বিজাতীয় প্রথা ও সভ্যতাকে আদর্শ না করিয়া আপনা আপনি দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনাপূর্ব্বক স্বধর্ম্মকে অব্যাহত রাখিয়া স্বদেশ সংস্কার করিতে শিক্ষা করিব, যে দিন তত্ত্ববিদ্যায় পারদর্শী হইয়া জগৎকে বিমোহিত করিতে, এবং জগতের সভ্য জাতিমাত্রেই জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিক্ষার জন্য ভারতের নিকট ঋণী, ইহা সকলকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা প্রদর্শন করিতে পারিব, সেই দিনই আমরা আর্য্যসন্তান বলিয়া পরিচয় দিবার উপযুক্ত হইব। যে দিন আমরা

"তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈর্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ।"

তৃণরাশি-বিনির্ম্মিত রজ্জুতে মত্তমাতঙ্গকেও বদ্ধ করা যায়; একতার এই মহাবীজমন্ত্রে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা দীক্ষিত হইয়া ভারতের প্রত্যেক শুভানুষ্ঠানে অনুরাগের সহিত যোগ-দান করিব, যে দিন আমরা

"ন বিভেতি রণাৎ যো বৈ সংগ্রামেঽপ্য পরাঙ্‌মুখঃ।
ধর্ম্মযুদ্ধে মৃতোবাপি তেন লোকত্রয়ং জিতং॥"

যিনি শত্রুকর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইয়া সম্মুখ সংগ্রামে কখনই ভীত বা পরাঙ্‌মুখ হয়েন না, ধর্ম্মযুদ্ধে দেহ বিনষ্ট হইলেও তিনি ত্রিলোক-বিজয়ী বীর বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়েন; এই বীর হৃদয়ের সুগভীর কথাগী যখন আগ্রহপূর্ণ হৃদয়ে ধারণা করিতে শিখিব, যে দিন আমরা

"সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্"

পরবশ হইয়া যাহা কিছু করিতে হয়, সে সমস্তই দুঃখের কারণ, এবং আত্মবশ বা স্বাধীন চিত্ততার সহিত যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হয়, সমস্তই সুখের কারণ; এই নীতি-উপদেশানু-সারে কার্য্য করিতে শিখিব, তখনই আর্য্যসন্তান বলিয়া পরিচয় দিবার সুযোগ্য অধিকারী হইব।

"দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ।
সত্যপূতং বদেৎ বাচং মনঃপূতং সমাচরেৎ॥"

পথে কোন দুর্ব্বল পতিত জীব পদ-বিমর্দ্দিত হইয়া না যায়, অথবা কোন বিষদংষ্ট্রাযুক্ত জীব পথচারীর পদে দংশন না করে, এরূপ দেখিয়া, এবং কোন অশুচি বস্তু পথে পড়িয়া আছে কিনা, তাহা বিচারপূর্ব্বক সাবধানে পদনিক্ষেপ করিবে, বস্ত্রদ্বারা জল ছাঁকিয়া পান করিবে

সত্যতা দ্বারা পবিত্র করিয়া বচন প্রয়োগ করিবে, যাহাতে অন্তরাত্মা পরিতুষ্ট থাকেন, তদ্রূপ আচরণ করিবে; যে দিন আমরা এই সারগর্ভ হিতোপদেশ জীবনের কর্ত্তব্য কার্য্যে পরিণত করিতে থাকিব,

"আপদুন্মার্গগমনে কার্য্যকালাত্যয়েষু চ।
কল্যাণবচনং ব্রুয়াদপৃষ্টোঽপি হিতং নরঃ॥"

কেহ বিপদে পড়িলে, সুপথ পরিহারপূর্ব্বক কেহ অপথ বা কুপথে গমনের উপক্রম করিলে, কার্য্যকাল অতীত হয়, এরূপ দেখিলে, সুজন ব্যক্তি জিজ্ঞাসিত না হইয়াও লোক সকলকে হিতকর পরামর্শ দান করিবেন; যে দিন আমরা এই সাধুবাক্য নিজ নিজ অনুষ্ঠানে প্রদর্শন করিতে পারিব,

"বিরলে শয়নং বাসং ত্যজেৎ প্রাজ্ঞঃ পরস্ত্রিয়া।
অযুক্তভাষণঞ্চৈব স্ত্রিয়ঃ শৌর্য্যং ন দর্শয়েৎ॥"

অসম্পর্কীয় পরদারা সহ একত্রে নির্জ্জনে শয়ন বা বাস করিবে না, কোন স্ত্রীকে কখনও শ্রুতিকটু বা কুৎসিত ভাষা ব্যবহার, ও বীরত্ব প্রদর্শন করিবে না; এই সুনীতিপূর্ণ উপদেশটী যে দিন দেখিব প্রতি গৃহে গৃহে আচরিত হইতেছে, সেই দিন বুঝিব, আমাদিগের হৃদয়ে আর্য্যভাবের প্রতিবিম্ব পতিত হইয়াছে।

"ঔদ্ধত্যং পরিহাসঞ্চ তর্জ্জনং বহুভাষণম্।
পিত্রাদ্যগ্রে ন কুর্ব্বীত যদীচ্ছেদাত্মনোহিতম্॥"

আজকাল লোকের সামান্যমাত্র গুণ থাকিলেই সেই অভিমানে অন্যকে তৃণবৎ তুচ্ছ মনে করিয়া থাকে, কিন্তু পিতা বা তাদৃশ সম্মান-ভাজন গুরুগণের সম্মুখে ঔদ্ধত্য

প্রকাশ করিতে নাই; গুরুগণের সহিত বা তাঁহাদের সম্মুখে অন্য কাহারও সহিত পরিহাস করিতে নাই, তাঁহাদের সম্মুখে তর্জ্জন বা বহু বাগ্‌বিন্যাস ও বাচালতা করিতে নাই; যে দিন আমরা আত্মহিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া এই নীতি-বাক্যের সম্পূর্ণ সম্মাননা রক্ষা করিতে পারিব,

"দুষ্কুলীনঃ কুলীনোবা মর্য্যাদাং যো ন লঙ্ঘয়েৎ।
ধর্ম্মাপেক্ষী মৃদুর্হ্রীমান্ স কুলীনশতাদ্বরঃ॥"

দুষ্কুলজাত হউন বা সংকুল-সম্ভূতই হউন, যিনি কখনও কাহারও বৈধী মর্য্যাদা লঙ্ঘন না করেন, যিনি ধর্ম্মানুকূল কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করেন, যিনি বিনয়বিনম্র, যিনি লজ্জাশীল, তিনি যে শতকুলীন অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; যে দিন আমরা এই উচ্চ হৃদয়ের উদার সিদ্ধান্তটীকে শিরোধার্য্য করিয়া সমাজের কল্যাণ কামনা করিব, সেই দিনই বুঝিব, আর্য্যপ্রতিভার বিমল কিরণমালা আমাদিগের মুখ উজ্জ্বল করিবে।

"বৃদ্ধবালধনং রক্ষ্যমন্ধস্য কৃপণস্য চ।
ন খাতপূর্ব্বং কুর্ব্বীত ন রুদন্তি ধনং হরেৎ॥
কৃতং কৃপণবিত্তং হি রাষ্ট্রং হন্তিনৃপশ্রিয়ম্।"

বৃদ্ধ, বালক, অন্ধ, ও দীন ব্যক্তির ধন রাজা যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবেন; প্রজারা কূপাদি খনন করিয়া জল সংস্থান করিলে, তাহার কর লইবেন না; রাজকর-প্রদানে নিতান্ত কাতরা স্ত্রীলোকের নিকট কর গ্রহণ করিবেন না, ও দীন জনের অত্যল্প মাত্র ধন হইতেও কর গ্রহণ করিলে রাজার রাজ্য ও রাজশ্রী অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়; এই রাজনৈতিক কৌশলপূর্ণ উপদেশটীর যে দিন আমাদিগের দেশের

রাজা ও ভূস্বামিবর্গ অতি কর্ত্তব্যানুরোধে অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, সেই দিন বুঝিব, আর্য্যজাতির নির্ম্মল প্রতিভা আমাদিগের দেশে পুনঃ প্রকাশিত হইতেছে।

"শান্তাঃ সন্তঃ সুশীলাশ্চ সর্ব্বভূতে হিতেরতাঃ।
ক্রোধং কর্ত্তুং ন জানন্তি এতদ্ ব্রাহ্মণলক্ষণম্॥
সন্ধ্যোপাসনশীলশ্চ সৌম্যচিত্তো দৃঢ়ব্রতঃ।
সমঃপরেষু চ স্বেষু এতদ্‌ব্রাহ্মণলক্ষণম্॥"

যে দিন বর্ত্তমান ভারতের ব্রাহ্মণগণ বুঝিবেন, শান্ত ও সুশীল হওয়া, সর্ব্বভূতে দয়াদৃষ্টি করা, কাহারও প্রতি ক্রোধ করিতে না জানা, ইহাই ব্রাহ্মণের লক্ষণ ; যে দিন ভূদেবগণ বুঝিবেন, সন্ধ্যা ও উপাসনায় নিরত থাকা, সৌম্যপ্রকৃতি ও দৃঢ়ব্রত হওয়া, পরার্থ ও স্বার্থে সমদৃষ্টি করাই ব্রাহ্মণের লক্ষণ, সেই দিনই জানিব, আর্য্যজাতির ব্রহ্মতেজ আবার আমাদিগকে উদ্ভাসিত করিবে।

"একাহারশ্চ সন্তুষ্টঃ স্বল্পাশী স্বল্পমৈথুনঃ।
ঋতুকালাভিগামী চ এতদ্‌ব্রাহ্মণলক্ষণম্॥
পরান্নং পরবিত্তঞ্চ পথি বা যদি বা গৃহে।
অদত্তং নৈব গৃহ্ণাতি এতদ্‌ব্রাহ্মণলক্ষণম্॥"

একবার মাত্র ভোজনে পরিতৃপ্ত, অল্পমাত্র আহারে পরিতুষ্ট, অল্প বা অধিক প্রাপ্তির দিকে না তাকাইয়া সদা সন্তুষ্ট, স্বল্পমাত্র মৈথুনে প্রবৃত্তিযুক্ত, ঋতুকাল ব্যতীত অন্য সময়ে স্ত্রীসঙ্গমে নিবৃত্ত, পরের অন্ন অথবা পরের ধন পথেই পড়িয়া থাক, বা কাহারও গৃহেই থাক্, স্বত্বাধিকারী প্রদান না করিলে তাহা গ্রহণ করিবে না ; বর্ত্তমান ভারতের

ভূসুরবর্গ ইহাই ব্রাহ্মণের লক্ষণ জানিয়া যে দিন আপনাদিগের হৃদয়কে পবিত্র ও উচ্চ করিয়া তুলিবেন, সেই দিনই বুঝিব, আর্য্যজাতির ব্রহ্মণ্যদেব শতসূর্য্য-বিজয়ী মহাতেজের সঞ্চার করিয়া ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিবেন।

"সত্যং ব্রহ্মঃ তপোব্রহ্মঃ ব্রহ্মশ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
সর্ব্বভূতদয়া ব্রহ্ম এতদ্ ব্রাহ্মণলক্ষণম্ ॥
যোগস্তপোদমোদানং সত্যং শৌচং দয়াশ্রুতম্।
বিদ্যাবিজ্ঞানমাস্তিক্যমেতদ্ ব্রাহ্মণলক্ষণম্ ॥"

সত্য ব্রহ্ম, তপস্যাই ব্রহ্ম, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ব্রহ্ম, সর্ব্বজীবে দয়া ব্রহ্ম, এইরূপ সাধুদৃষ্টি, এবং যোগ, তপ, দম, দান, সত্য, শৌচ, দয়া, বেদাভ্যাস, পরা বিদ্যা, ব্রহ্মানুভূতি, ও আস্তিক্য যে দিন আমাদিগের বর্ত্তমান ব্রাহ্মণজাতি সুরাসুরবন্দিত আর্য্যজাতির এই দিব্যানুষ্ঠানগুলিকে ব্রাহ্মণের প্রকৃত লক্ষণ বলিয়া তত্তাবতের যথাযথ অনুষ্ঠান করিতে থাকিবেন, সেই দিনই বুঝিব, আর্য্যভাবরূপ-কল্পতরুর ছায়ায় সন্তপ্ত ভারত সুশীতল হইবে।

"আর্জ্জবং ধর্ম্মমিত্যাহুরধর্ম্মো জিহ্ম উচ্যতে।
আর্জ্জবেনেহ সংযুক্তো নরো ধর্ম্মেন যুজ্যতে ॥"

সরলতাই ধর্ম্ম, কপটতাই অধর্ম্ম, যিনি সরলতা অবলম্বন করেন, তাঁহার ধর্ম্মলাভ হয়; ইহা জানিয়া যে দিন আমরা সরলান্তঃকরণে সমস্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব, সেই দিনই আমাদিগের হৃদয়ে আর্য্যভাব পরিস্ফুরিত হইবে।

"নাস্তি সত্যসমোধর্ম্মঃ ন সত্যাৎ বিদ্যতে পরম্।
ন হি তীব্রতরং কিঞ্চিদনৃতাদিহ বিদ্যতে ॥"

সত্য সদৃশ ধর্ম্ম নাই, সত্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তুও আর নাই, মিথ্যা অপেক্ষা তীব্র বস্তু ইহলোকে আর কিছু নাই ; যে দিন আমরা এই সারগর্ভ উপদেশটী হৃদয়ের ভূষণ করিয়া রাখিব,

"সত্যং ব্রহ্ম তপঃ সত্যং সত্যং বিসৃজতে প্রজাঃ।
সত্যেন ধার্য্যতে লোকঃ স্বর্গং সত্যেন গচ্ছতি ॥"

সত্যই ব্রহ্ম, সত্যই তপস্যা, এই সত্যই প্রজা-সৃষ্টি করিয়া থাকে, সত্যতেই ত্রিলোক স্থির রহিয়াছে, সত্য দ্বারাই লোক স্বর্গে গমন করিয়া থাকে ; যে দিন আমরা সত্যের এই শুদ্ধ আলোক দেখিয়া সংসারের তমোময় পথে আনন্দে বিচরণ করিতে পারিব, সেই দিনই জানিব আর্য্যমহিমা আবার ভারতে বিস্তারিত হইল।

"ন ধর্ম্মকালঃ পুরুষস্য নিশ্চিতো
ন চাপি মৃত্যুঃ পুরুষং প্রতীক্ষতে।
সদাহি ধর্ম্মস্য ক্রিয়ৈব শোভনা
যদা নরো মৃত্যুমুখেঽভিবর্ত্ততে ॥"

মৃত্যু মনুষ্যের সময় অসময় বুঝিয়া প্রতীক্ষা করে না, অতএব মনুষ্যের ধর্ম্মানুষ্ঠানের কোন নির্দ্দিষ্ট কাল নাই ; জন্মের পর হইতেই মনুষ্য যখন মৃত্যুমুখরন্ধ্রে প্রবেশ করিতেছে, তখন বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য, শুচি, ও অশুচি, সকল সময়েই যথাযথোচিত ধর্ম্মানুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য ; যে দিন আমরা শুদ্ধ হৃদয়ে এই মর্ম্মভেদী উপদেশ অনুসারে কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণ করিতে থাকিব,

"এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমন্নাশং সর্ব্বমন্যত্ত গচ্ছতি ॥"

যে শরীরের চিরকাল শুশ্রূষা করিলাম, যে শরীরের সম্বন্ধীয় বর্গের সহিত চিরদিন আত্মীয়তা করিলাম, যে সকল লৌকিক বস্তু লইয়া চিরদিন ভুলিয়া থাকিলাম, সে সমুদয়ই শরীর-পাতের সঙ্গে সঙ্গে এইখানেই পড়িয়া থাকিবে, কেবল একমাত্র ধর্ম্মই সুহৃদ্‌বৎ কল্যাণকারী হইয়া পরলোকে সহগামী হইবেন; যে দিন এই বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া ধর্ম্মই জীবনের সার বলিয়া ধারণা করিব,

"নামুত্র হি সহায়ার্থং পিতা মাতা চ তিষ্ঠতঃ।
ন পুত্র জ্ঞাতির্ন দারা ধর্ম্মস্তিষ্ঠতি কেবলঃ॥

পরলোক-গমনকালে পিতা, মাতা, পুত্র, দারা, জ্ঞাতি, কেহই কোন উপকারে আসেন না, এক মাত্র ধর্ম্মই কেবল সেই সময় প্রিয় বন্ধুর ন্যায় সহায়তা করিয়া থাকেন; যে দিন এই কথার সারবত্তা বুঝিয়া সংসারে অনাসক্তচিত্তে সকল কার্য্য করিব ও সর্ব্বথা ধর্ম্মের সেবা করিতে পারিব,

"একাকী চিন্তয়েন্নিত্যং বিবিক্তে হিতমাত্মনঃ।
একাকী চিন্তয়ানো হি পরং শ্রেয়োঽধিগচ্ছতি॥"

নির্জ্জন, নির্ম্মল ও নির্দ্বন্দ্ব স্থানে একাকী বসিয়া সর্ব্বদা আত্মহিত চিন্তা করিবে, নানামতের লোকের সহিত বৃথা বাগ্‌বিবাদে মত স্থির করিতে না গিয়া একাকী স্থিরচিত্তে চিন্তা করিতে করিতে মনুষ্য পরম মঙ্গললাভ করিয়া থাকে; যে দিন এই অগাধজ্ঞানগম্ভীর উপদেশটী শিরোধার্য্য করিয়া নিজ জীবনের পথ পরিষ্কার করিতে পারিব, সেই দিনই বুঝিব, আর্য্যপ্রকৃতির বিমল ভাতি ভারতের বাহ্যাভ্যন্তরে সঞ্চারিত হইল।

"ধর্ম্মং যো বাধতে ধর্ম্মো ন স ধর্ম্মঃ কুধর্ম্ম তৎ।
অবিরোধী তু যো ধর্ম্মঃ স ধর্ম্মঃ (সত্যবিক্রম !) ॥"

যে ধর্ম্ম অন্য ধর্ম্মের বিরোধী, তাহা কখনই প্রকৃত ধর্ম্ম নহে, উহা কুধর্ম্ম বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকে, অবিরোধী ধর্ম্মই যথার্থ ধর্ম্ম; ইহাই বিচার করিয়া যে দিন আমরা ধর্ম্মের সরল পথ—সরল গতি—বুঝিতে পারিব,

"সৌরাশ্চ শৈবগাণেশাঃ বৈষ্ণবাঃ শক্তিপূজকাঃ।
মামেব তে প্রপদ্যন্তে বর্ষাম্ভঃ সাগরং যথা ॥"

যেখানেই যত বৃষ্টি পতিত হয়, সকল জলই যেমন নানা পয়ঃপ্রণালী দিয়া নানা নদীকে আশ্রয় করিয়া পরিশেষে সাগরে আসিয়াই পতিত হয়, সেইরূপ সৌর, শৈব, গাণপত্য, বৈষ্ণব, শাক্ত, সকল উপাসক-সম্প্রদায়ই নিজ নিজ পদ্ধতিতে ইষ্টোপাসনা সিদ্ধ করিয়া অবশেষে আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে; ভগবানের এই নিগূঢ় মর্ম্ম-কথা হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক যে দিন আমরা সর্ব্বদেবে ও সর্ব্বসম্প্রদায়ে অভেদ বুদ্ধি স্থাপন করিয়া নির্দ্বন্দ্বচিত্তে ভগবানের সাধনা করিতে শিখিব; যে দিন আমরা এই কথাই মর্ম্মদ্বার-উদ্ঘাটনপূর্ব্বক ভাল করিয়া পুষ্প-দন্তের সিদ্ধস্বরে বলিতে পারিব—

"নৃণামেকোগম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব"

জলরাশির আশ্রয়স্বরূপ মহাসমুদ্রের ন্যায়, হে নাথ! তুমিই সমস্ত সম্প্রদায়ভুক্ত সাধকবৃন্দের একমাত্র গতি, সেই দিনই বুঝিব আর্য্যপ্রকৃতির বিমল বিদ্যুৎ-প্রবাহ আমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইতেছে।

"ধৃতীক্ষমাদমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্ব্বিদ্যা সত্যমক্রোধোদশকং ধর্ম্মলক্ষণম্॥"

ইন্দ্রিয়গণের বহির্ম্মুখীন বৃত্তির বিনিবৃত্তি, দণ্ড দিবার ক্ষমতা সত্ত্বেও প্রতিপক্ষের প্রতি ক্ষমা, বহিরিন্দ্রিয়সংযম, পরদ্রব্যগ্রহণে অপ্রবৃত্তি, অন্তর্বাহ্য শৌচ, জ্ঞানেন্দ্রিয়-রাশির ভোগলিপ্সা-প্রবাহের গতিরোধ, নির্ম্মলা বুদ্ধি, ব্রহ্ম-বিদ্যা, সত্য, ও অক্রোধ, এই দশটীকে যে দিন ধর্ম্মের লক্ষণ স্থির জানিয়া ধর্ম্মের বৃথা বাগ্‌বিতণ্ডা পরিহারপূর্ব্বক ধর্ম্মের প্রকৃত অনুষ্ঠানে যত্নশীল হইব,

"শ্রুতিস্মৃতিসদাচার স্ব স্ব চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণম্॥"

বেদকথিত ও বেদানুমোদিত কর্ম্ম ও জ্ঞানের, ও বেদানুকূল স্মৃতির উপদিষ্ট অনুষ্ঠান-রাশির লোকপরম্পরামান্য চির-প্রচলিত সদাচার-সম্মত ব্যবস্থা, এবং এতাবতানুকূল অনু-ষ্ঠানপূর্ব্বক নিজ-মার্জ্জিত-বুদ্ধি-বিনোদকর কার্য্য-কলাপের অনুষ্ঠানই ধর্ম্মের লক্ষণ; যে দিন শাস্ত্রসিদ্ধ এই কথার যথাযথ সম্মাননাপূর্ব্বক কর্ম্ম করিতে সমর্থ হইব, সেই দিনই বুঝিব, বর্ত্তমান ভারতে আর্য্যতেজের পুনরভ্যুদয় হইল।

আর্য্যজাতি স্বকপোল-কল্পনার বশবর্ত্তী হইয়া কোন কার্য্য করিতেন না। ভগবদ্বাক্য বেদের অনুমোদিত না হইলে, অথবা তপঃসিদ্ধবুদ্ধি মহাপুরুষগণের উপদেশ বা আদেশ না পাইলে, ভারতীয় আর্য্যজাতি কোন কার্য্যই করিতে প্রবৃত্ত হইতেন না। পবিত্রতাই তাঁহাদের কার্য্যের প্রেরয়িতা ছিল। দেহশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি, ও আত্মশুদ্ধির

ব্যাঘাতক কোন কার্য্যই তাঁহাদের প্রিয় বলিয়া বোধ হইত না। অনাদ্যাশক্তিস্বরূপিনী বিশুদ্ধা প্রকৃতির সুসন্তান তাঁহারা, যাহাতে প্রকৃতি মলিন হয়, এমন কোন কার্য্যেই তাঁহাদের মতিগতি ধাবিত হইত না। যে কার্য্য জীবকে ভগবানের দিকে আকর্ষণ না করে, যে কার্য্য জীবের হৃদয়ে ভগবানের চারুচরণ-চন্দ্রিকা-বিস্তারে বাধা প্রদান করে, সে কার্য্যে তাঁহাদের চিত্ত-বৃত্তি ধাবিত হইত না। তাঁহারা সকল কার্য্যকেই ঈশ্বরানুকূল করিয়া অনুষ্ঠান করিতেন।

শরীর, মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সমস্তকে একমাত্র ব্রহ্মে সমাধান করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহারা আর্য্য, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ, তাঁহারা ঊর্দ্ধগমনশীল, ও তাঁহারা উন্নত বলিয়া চিরদিন জগতে সম্মানিত হইয়া আসিতেছেন। তাঁহারা ভগবদ্ভাব-বর্জ্জিত কেবল পার্থিব উন্নতি-সাধনে পরিশ্রম করিতেন না। ভগবান্‌কে কর্ত্তা, ভর্ত্তা, ও বিধাতা জানিয়া সর্ব্বকার্য্য-মূলে তাঁহাকে অধিষ্ঠাতা বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তাঁহারা বাহুবল, বুদ্ধিবল, বিদ্যাবল, ও বিত্তবল অপেক্ষা তপোবল, ও তজ্জন্য ভগবানের করুণাবলকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল বল বলিয়া জানিতেন। ভগবান্‌কে তাঁহারা পার্থিব পিতা, মাতা, সুহৃদ্, দুহিতা আদি হইতেও পরমাত্মীয় বলিয়া প্রীতি করিতেন। আর্য্যজাতি পরমাত্মাকে ইহ-পরলোকের পরম সখা জানিয়া—"করামলকবং" প্রত্যক্ষ প্রতীয়মান জানিয়া—প্রাণের সহিত তাঁহাকে ভালবাসিতেন। ভাবশুদ্ধি না হইলে তাঁহাকে আত্মীয়-বোধে প্রীতি করা যায় না, এই জন্য তাঁহারা সর্ব্বদা শুদ্ধাচার-নিরত

থাকিতেন। তাঁহারা সদাচারকে পরম ধর্ম্ম বলিয়া জানিতেন। সদাচার-বর্জ্জিত হইলে পরলোকে আত্মার অসদ্গতি হয়; তপস্যা-ব্রত, ব্রহ্মচর্য্য, অগ্নিহোত্রাদি কোন উপায়েই অনাচারী বা কদাচারীর কল্যাণ হয় না, ইহাই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত ছিল, তাই বশিষ্ঠ বলিয়াছেন—

"আচারঃ পরমোধর্ম্মঃ সর্ব্বেষামিতি নিশ্চয়ঃ।
হীনাচারঃ পরীতাত্মা প্রেত্যচেহ বিনশ্যতি॥
নৈনং তপাংসি ন ব্রহ্ম নাগ্নিহোত্রং ন দক্ষিণা।
হীনাচারাশ্রিতং ভ্রষ্টং তারয়ন্তি কথঞ্চন॥"

সদাচারে শরীর, মন, ও ইন্দ্রিয়াদির চেষ্টা আদি বিশুদ্ধ ভাবাপন্ন হইলেই বাক্যের দ্বারা হউক, শরীরের দ্বারা হউক, বা মনের দ্বারাই হউক, নিজ নিজ অভীষ্টানুরূপ ভগবদারাধনা করাই তাঁহারা জীবনের যথাসর্ব্বস্ব মনে করিতেন। দানে, ধ্যানে, কর্ম্মে, ধর্ম্মে, করণে, অকরণে সর্ব্বথা প্রকৃতি-শুদ্ধি শুভদা ও ফলদা জানিয়াই বলিয়াছিলেন যে—

"বাচিকং কায়িকং চাপি মানসং বা যথামতি।
আরাধনে পরেশস্য ভাবশুদ্ধির্ব্বিধীয়তে॥"

তাঁহারা অণু-পরমাণুর ভিতরে বাহিরে পরমাত্মার দিব্য সত্তার বিদ্যমানতা-দর্শনে কৃতকৃত্য হইতেন। তাঁহারা সকল দিক দেখিয়া শুনিয়া বিচার করিয়া, যাঁহা হইতে সকল ভূত উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহাতে তত্তাবৎ জীবিত রহিয়াছে, আবার পরিশেষে যাঁহাতে সমস্ত প্রবিষ্ট হইবে, সেই ব্রহ্ম পরমাত্মাকে জানিবার জন্যই উপদেশ করিয়াছেন—

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ-প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্‌বিজিজ্ঞাস স্ব তদ্‌ব্রহ্ম।"

পরমাত্মা ছাড়িয়া তাঁহারা কোন পদার্থকে সুখকর বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না, তাই প্রেম-ভরে গাহিয়াছিলেন "রসোবৈ সঃ," সেই পরমাত্মা আনন্দকর ও তৃপ্তির হেতু। পরমাত্মাকে তাঁহারা এই ময়লা-মাটীমাখা ও মায়াজাল-জড়িত অসার সংসার সহ মিশাইতে চাহিতেন না। তিনি সংসারময়, সংসার তাঁহাতে, কিন্তু সংসারের মলিন স্বরূপের অবস্থায় তাঁহাকে দেখিতে আর্য্যগণ ভালবাসিতেন না, তাই বলিতেন—

"অন্যদস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ"

তিনি এই কার্য্যকারণ-বিশিষ্ট জগৎ হইতে বিভিন্ন,

"অন্যাদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি"

তিনি বিদিত ও অবিদিত সকল বস্তু হইতেই ভিন্ন,

"ন জায়তে ন ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ
নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।"

পরমাত্মা জন্মেন না, মরেন না, এই সকল বস্তু মধ্যে তিনি কোন বস্তুই নহেন, এবং তিনি কোন বস্তুই হয়েন নাই।

সভ্য মহোদয়গণ! আর্য্যজাতি বলে ও কৌশলে, সদাচারে ও শুশ্রূষায়, নিষ্ঠায় ও প্রতিষ্ঠায়, কর্ম্মে ও ধর্ম্মে, ধ্যানে ও জ্ঞানে, জীবনে ও মরণে, বাহিরে ও ভিতরে অমোঘ ব্রহ্মতেজের পূর্ণ পরিচয় দিয়া মানবোচিত মহত্ত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ আর্য্যচরিতেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে দিন আমরা তাঁহাদের ন্যায় তপস্তেজে তেজীয়ান, ব্রহ্মবলে বলীয়ান হইয়া পার্থিব ও অপার্থিব সকল

বিষয়েই ভগবানের সহিত ঘনসন্নিকর্ষ-সাধন বা সম্বন্ধ-স্থাপন করিব, সেই দিনই আমরা প্রকৃত আর্য্যভাব লাভ করিব; যে দিন তাঁহাদের ন্যায় প্রাণ ভরিয়া বলিতে পারিব—

"তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ
প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা।

তিনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, এবং অন্যান্য প্রিয় বস্তু হইতে পরম প্রিয়তম, সেই দিন আবার আমরা আর্য্য-ভাবাপন্ন হইয়া ধন্য হইব।

হে ব্রহ্মলোক-নিবাসি পবিত্রাত্মন্ আর্য্যগণ! আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা তোমাদের হৃদয়বল্লভ প্রাণ-সখার কৃপাদৃষ্টি হইতে বঞ্চিত না হই।

ওঁ হরিঃ ওঁ।

ভারতে উৎসব। *

"সর্ব্বাশ্রমাণাং সর্ব্বেষাং সর্ব্বকল্যাণহেতবে।
অত্রামুত্রৈক মিত্রায় নমো ধর্ম্মায় বেধসে॥"

সাধুহৃদয় মহোদয়গণ!

স্বপ্ন সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, দুঃখের দিনে সুখের স্বপ্ন মানবের বড় প্রীতিকর বলিয়া বোধ হয়। যখন দুঃখ দুর্ব্বিপত্তির দারুণ যাতনা আসিয়া মনঃপ্রাণকে মথিত করিতে থাকে, যখন ভয়ে ও দুর্ভাগ্যোদয়ে প্রাণমন শুকাইয়া যায়, হৃদয় যখন নিতান্ত নির্ব্বেদযুক্ত ও ব্যথিত হয়, সেই সময়ে যদি কেহ ভরসার ভাষায়, সুললিত মধুর কথায়, মানবকে প্রবোধ-বাণী শুনায়, তখন তাহার প্রাণ জুড়াইয়া যায়। পীড়ায় কাতর হইয়া রোগী যখন হা হুতাশ, ও জ্বালা-যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে থাকে, তখন যদি রোগ-শয্যার পার্শ্বে বসিয়া চিকিৎসক হাসিতে হাসিতে বলেন, ভয় কি, অস্থির হইও না, এই ঔষধ দিতেছি, এখনই ভাল হইয়া যাইবে, তখন রোগীর মন কত প্রফুল্লিত হয়, কত আশ্বস্ত হয়, তাহা

---

* ১৮১১ শকাব্দায় বীরভূম জেলার অন্তর্গত কুণ্ডলা গ্রামের হরিসভার বার্ষিক উৎসবের সময় এই বক্তৃতা হইয়াছিল। গ্রামস্থ ও ৮।৯ ক্রোশ দূরবর্ত্তী গ্রাম-সমূহের লোক সমস্ত বক্তৃতা-শ্রবণার্থ একত্রিত হওয়ায় সভা-স্থান অতিশয় জনাকীর্ণ হইয়াছিল। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, স্ত্রী ও পুরুষ, সকলেই পরিব্রাজক মহাশয়ের মুখ-নিঃসৃত ভাবাবেশ-পূর্ণ সৎকথা শ্রবণে বিমোহিত ও আনন্দে পুলকিত হইয়াছিলেন।

বলা যায় না; তাহার তখন বোধ হয়, যেন অর্দ্ধেক রোগ আরোগ্য হইয়া গেল। বিবিধ বিষম দুঃসহ যাতনায় যখন মানবের মন অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ ও অপ্রসন্ন হইয়া পড়ে, তখন যদি কেহ তাহার কর্ণকুহরে তাহার ভবিষ্যৎ সুখের আশার সংবাদ প্রদান করে, তবে তাহার সেই কালানল-সদৃশ দুঃখদাব-দাহের মধ্যেও যেন অমৃতের ধারা পতিত হইতে থাকে। বর্ষার বারিধারায় আকুল, রাত্রির ঘোরঅন্ধকারময় পিচ্ছিল পথে একাকী পথিক যদি একটী কোথাও দীপ-শিখাও দেখিতে পায়, অথবা ক্ষণার্দ্ধ জন্যও যদি একবার ক্ষণপ্রভার বিকাশ দেখিতে পায়, তাহা হইলেও তাহার ভয়-বিকলিত চিত্তে যথোচিত আশাভরসা ও স্ফূর্ত্তির উদয় হইয়া থাকে। ঘোরতিমিরময়ী মহানিশিতে যদি অস্ত্রশস্ত্রধারী দস্যুদল আসিয়া কাহারও গৃহ আক্রমণ করে, আর ভয়-বিহ্বল গৃহস্থ যদি সেই সময়ে চৌকীদারের চীৎকার শুনিতে পায়, তখন তাহার মনে কত যে আশাভরসার সঞ্চার হয়, তাহা কে বলিতে পারে? গৃহে অগ্নি লাগিলে যদি কেহ অযাচিতরূপে বন্ধুর ন্যায় জলধারা-প্রবাহের যন্ত্র লইয়া দৌড়িয়া আসে, তবে তখন গৃহস্থের যেরূপ আহ্লাদ হয়, তাহা অনির্ব্বচনীয়। সে বিপদে হতাশ হইয়াছিল, কিন্তু বারির বেগধারা দেখিয়া তাহার বিপুল বিপদ মধ্যেও শান্তির সঞ্চার হইল। মহোদয়গণ! আজ সভাগৃহকে সাজসজ্জায় সুসজ্জিত, শোভা সৌন্দর্য্যে বিভূষিত, ও আনন্দ-লহরীর লীলাভূমি দেখিয়া মনে হইতে পারে যে, ভারতের এই মহাদুর্দ্দিনে—বিষম বিপত্তিকালে—লোকে এত ধুমধাম করিতেছে কেন? ভার-

তের যে দিকে তাকাও সেই দিকেই দুঃখ দুর্ব্বিপত্তির করাল কালানল-কণিকা বিস্ফুরিত হইয়া দিগ্দাহ করিতেছে! এখন উৎসব কিসের? মহামারি ও অকাল মরণে, দুর্ভিক্ষে, ও দারিদ্র্য-দুঃখে ভারত জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইয়া যাই-তেছে! এখন উৎসবের এত ধুমধাম কিসের? রাজনৈতিক নানাবিধ উৎকট বিভীষিকাময় অত্যাচারের ভৈরব হুঙ্কারে ভারতের হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছে; ভারত শিক্ষায় দীক্ষায় বঞ্চিত হইয়া ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে করিয়া দিগ্দেশ-বাসিগণের দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছে; এই দুরবস্থার দিনে ভারতে আবার উৎসব কিসের? সমাজের অবস্থা অতি কলুষিত! ভ্রাতায় ভ্রাতায় সামান্য বিষয়-লোভে অন্তর্ব্বিবাদা-নল প্রজ্জ্বলিত করিয়া আপনাপনি দগ্ধ হইতেছে, স্ত্রীপুরুষের কুশল কথা প্রায়ই শ্রুত হওয়া যায় না, পিতা পুত্রে, মায়ে ঝিয়ে, শ্বাশুড়ী বৌয়ে, প্রীতির সংবাদ প্রায়ই পাওয়া যায় না; কন্যার বিবাহে বিপুল পণের বিষম জ্বালায় সমাজ অন্তঃসার-শূন্য হইয়া পড়িতেছে; সামাজিক এই ক্লেশের দিনে এত উৎসবের ধুম পড়িয়া গেল কেন? ধর্ম্ম-জগতের প্রতি অণু পরমাণু পর্য্যন্ত কত লোকের বিষাগ্নিজ্বালাময় বলিয়া বোধ হইতেছে। স্বধর্ম্মাচার ও ভগবদুপাসনা ইহা মূঢ়জনোচিত ও বিড়ম্বনা-বোধে কত লোকে পরিত্যাগ করিয়া অলক্ষিত ভাবে মহারৌরবের জ্বালামালাময় সন্তাপ-সাগরের দিকে ছুটিতেছে। এই দুঃখদুর্দ্দিনের ক্রীড়াভূমি বর্ত্তমান ভারতে এত উৎসবের ধুম পড়িয়া গেল কেন? কাঁদিবার দিনে পাগলের মত এত হাসিমাখা মুখ কেন? মাথায় হাত

দিয়া বসিয়া ভাবিবার দিনে এ প্রচণ্ড তাণ্ডব নৃত্য কেন? সুখ নাই, সমৃদ্ধি নাই, শ্রী নাই, সৌষ্ঠব নাই, তবে আজ আনন্দের ফোয়ারা উন্মুক্ত হইল কেন? ভারত যে পরাধীন, সেই পরাধীনই আছে, যে দুঃখ ক্লেশে কাতর, সেই কাতরই আছে, তবে আজ উৎসব কিসের? ভারতের ঘরে বাহিরে নিরানন্দের অগ্নিবৃষ্টি হইতেছে, ভারতের আপাদমস্তক দুর্দ্দশার ধূলায় মলিন হইয়া গিয়াছে, ভারতে সমস্ত সত্ত্ব সামর্থ্য একে একে তিরোহিত হইয়া যাইতেছে, তবে আজ আমরা উৎসব করিতেছি কিসে? কি নূতন সুখ, কি নূতন সম্পত্তি পাইলাম যে, আজ আনন্দে নৃত্য করিতে আসিয়াছি।

মহোদয়গণ! যাঁহারা এইরূপে চিন্তা করিয়া থাকেন, তাঁহারা ভারতের ভিতর ঘরে কখনও প্রবেশ করেন নাই, তাঁহারা ভারতীয় ভাবের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া ভারতের মর্ম্ম-কথা কখনও শ্রবণ করেন নাই। অন্য দেশের লোক সুখ পাইলে, সমৃদ্ধিলাভ করিলে, সম্পদ্ প্রাপ্ত হইলে উৎসব করিয়া থাকে। অন্তস্তলদর্শী ভারত—আর্য্যদিগের তপস্তেজ-গুপ্ত ভারত—অনুরক্ত ভক্তগণের প্রেমাশ্রু-বিধৌত ভারত—দুঃখ দূর হইলে নহে, দুঃখ দূর করিবার জন্যই, সুখপ্রাপ্ত হইলে নহে, সুখ পাইবার জন্যই উৎসব করিয়া থাকে। সমৃদ্ধি-বৃদ্ধি হইলে নহে, সমৃদ্ধি-প্রাপ্তির জন্য, সম্পদ্‌লাভ করিলে নহে, সম্পৎ-কামনায়, বিপদ-উদ্ধার হইবার জন্যই অশেষ-দুঃখ-বিস্তার-নিস্তারকারী ভক্তহৃদ্-নিকুঞ্জ-বিহারীর সেবক ভারত উৎসবে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষ—ভবভয়হারী ভক্তমণ্ডলমধ্যচারী ভগবানের ভক্ত ভারতবর্ষ—

বহু তপস্যার ফলে, বহু যাগ-যজ্ঞের ফলে, বহু শিক্ষা-দীক্ষার ফলে, বহু যোগ-সমাধির বলে, বহু ধ্যান-ধারণার কৌশলে বুঝিয়াছেন যে, কাঁদিতে কাঁদিতে হাসি কেমন করিয়া আসে, ঘোরঅন্ধকার মধ্যে আলোকের বিজলী কেমন করিয়া চমকিয়া উঠে, গ্রীষ্মের দুঃসহ তাপ ভোগ করিতে করিতে বর্ষার শীতল বারি-ধারার কেমন করিয়া বৃষ্টি হইয়া থাকে। সুদূরদর্শী ভারতবর্ষ জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাগরের অগাধ শীতলতাময় গুহ্য গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিয়াছেন যে, জলধির অতল তলে শুক্তিকার গর্ভ মধ্যে মুক্তা কেমন করিয়া লুকাইয়া থাকে। অন্য দেশের লোক সুফল পাইলে তবে ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত ভারতবর্ষ সুফল পাইবার পূর্ব্বেই ভগবানের পূজা মানিয়া থাকে। অন্য দেশে ফল পাইলে পূজা, ভারতবর্ষে আগে পূজা, পরে ফল। প্রেম-রাজ্যের ইহাই পদ্ধতি। যেমন অগ্নি-কণিকার স্পর্শমাত্রে তৃণরাশি বিদগ্ধ হইয়া যায়, সেইরূপ পুঞ্জায়মান নিরানন্দ-কুঞ্জের মধ্যে আনন্দ-উৎসবের একটী জ্বলন্ত কণিকা পতিত হইলে নিরানন্দ-রাশি চিরদিনের জন্য তিরোহিত হইয়া যায়। প্রবল দুঃখ-দাব-দাহ-শিখা নিবাইবার জন্যই ভারতে ধর্ম্মের এই উৎসবরূপ উৎস উৎসারিত হইয়াছে। নিরানন্দের কালিঝুলিমাখা ভারতবর্ষ তাই এই উৎসবের নির্ম্মল জলে আনন্দের প্রবাহে অবগাহন করিতে আসিয়াছে। সৎ যাহা, তাহা কিঞ্চিন্মাত্রায়ও লব্ধ হইলে অশেষ অসৎ-রাশিকে নিঃশেষিত করিতে পারে।

সভ্যগণ! এই সময় একটী হাসির গল্প মনে পড়িল।

কোন গ্রামে একজন অতি দুর্দ্দান্ত দুষ্ট কৃপণ ব্রাহ্মণ বাস করিত। ব্রাহ্মণের দৌরাত্ম্যে গ্রামবাসীমাত্রেই সদা চকিত ও ভীত থাকিত। ব্রাহ্মণ যাহা বলিবে, সে আজ্ঞা লঙ্ঘন করে কাহার সাধ্য! তাহার কথা যে অমান্য করিত, তাহাকে ব্রাহ্মণ বিবিধ প্রকারে অতিশয় উদ্বেজিত করিত; সুতরাং ভয়ে ডরে সকলেই তাহাকে মানিত। একদিন ব্রাহ্মণের গৃহ-পালিত একটী বলীবর্দ্দ (বলদ) মুমূর্ষু দশাপন্ন হইল। ব্রাহ্মণ গরুটীকে এখন মরে তখন মরে দেখিয়া ভাবিল, গরুটী মরিলেই ত উহাকে ফেলিবার জন্য অন্ততঃ একটী টাকা ব্যয় হইবে, অতএব এটী বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে ইহা একটী ব্রাহ্মণকে দান করিয়া ফেলি, তাহাতে গো-দানের ফলও হইবে, এবং মৃত বলদ ফেলিবার ব্যয়ও লাগিবে না, যাহা কিছু ব্যয় হয়, তাহা ব্রাহ্মণের ঘাড়েই পড়িবে। এই স্থির করিয়া একজন ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া বলিল, আমি এই গরুটী তোমাকে দান করিতেছি, দুই আনা দক্ষিণা সহ ইহা গ্রহণ কর। ব্রাহ্মণ বলিল, গরুটী যে মরে! তাহাতে দুষ্ট উত্তর করিল যে, মরে তোমার ঘরে মরিবে, শীঘ্র লইয়া যাও। ব্রাহ্মণ ভয়ে কোন উত্তর করিতে না পারিয়া একখানি গো-শকটে করিয়া গরুটীকে বাড়ী লইয়া গেল; এক ঘণ্টা অতীত হইতে না হইতে গরুটী গতাসু হইল। এই ত গেল দুষ্ট ব্রাহ্মণের জন্মের মধ্যে দান-পুণ্য। ক্রমে তাহার কাল সমাগত হইল, যমরাজ-ভবনে যমদূতগণ-কর্ত্তৃক পাশাবদ্ধ হইয়া দুরাত্মা নীত হইল। চিত্রগুপ্ত তাঁহার সমস্ত খাতা উলটি পালটি করিয়া দেখিলেন যে, ব্রাহ্মণের

জীবন পাপে চিরকলঙ্কিত, পুণ্যের মধ্যে কেবলমাত্র মুমূর্ষু-গো-দান। যমরাজ ব্রাহ্মণকে বলিলেন, দেখ, তোমার জীবনে কেবলই পাপ, পুণ্যের মধ্যে কেবল একটী মুমূর্ষু-গো-দান। তাহাতে ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিল যে, এই পাপপুণ্যের ফল আমায় কিরূপে ভোগ করিতে হইবে? যমরাজ উত্তর করিলেন, তোমার পাপের জন্য কোটীকল্প রৌরব ও কুম্ভী-পাক প্রভৃতি মহানরক ভোগ করিতে হইবে, এবং তোমার দানের গরুটী যতক্ষণ জীবিত ছিল, ততটুকু কালের জন্য অর্থাৎ একঘণ্টার জন্য তুমি একটী সুতীক্ষ্ণশৃঙ্গ হৃষ্টপুষ্ট-কলেবর বলিষ্ঠ বলীবর্দ্দ পাইবে, এই একঘণ্টার মধ্যে এই গরুটীর নিকট যাহা চাহিবে তাহাই পাইবে, যাহা তাহাকে করিতে বলিবে, তাহাই সে করিবে। অতএব তুমি পূর্ব্বে নরক ভোগ করিয়া, পরিশেষে গরুর সুখসৌভাগ্য ভোগ করিবে, অথবা পূর্ব্বে এই ক্ষণকাল ভোগ্য গরুর সুখ-সৌভাগ্য ভোগ করিয়া কোটীকল্প নরক ভোগ করিবে? দুষ্ট ব্রাহ্মণ নিজ কুটীল বুদ্ধি এখনও পরিত্যাগ করে নাই; সে বলিল, আমার সুখ ত অল্প ক্ষণের জন্যই, অতএব এটুকু প্রথমেই ভোগ করিয়া লই, তার পর নিশ্চিন্ত হইয়া নরক ভোগ করিব। যমরাজ তথাস্তু বলিয়া একটী অলোকসামান্য সৌর্য্যবীর্য্য-সম্পন্ন সুতীক্ষ্ণশৃঙ্গ বলীবর্দ্দ তাহার সম্মুখে দিয়া বলিলেন, বলীবর্দ্দ! তুমি একঘণ্টার জন্য এই ব্রাহ্মণ তোমাকে যাহা আজ্ঞা করিবে, তাহাই অসঙ্কোচে সাধন কর। বলীবর্দ্দ তাহাই করিতে প্রস্তুত হইল। তখন ব্রাহ্মণ ভাবিল, এই যম বেটাই আমায় শাস্তি দিবার জড়, শেষে ত

নরক-ভোগ আছেই, এই বেলা এই বেটাকে জব্দ করিয়া দিই, লোকের যম-যাতনা পাইবার জড় মিটাইয়া দিই, আর বলিল, বলীবর্দ্দ! তুমি বলপূর্ব্বক তোমর সুতীক্ষ্ণ শৃঙ্গা-ঘাতে এই যমরাজকে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া দাও। আজ্ঞাবহ বলীবর্দ্দ বেগে যমরাজের দিকে ছুটিল, যমরাজ ভয়ে ভীত হইয়া দৌড়িয়া পলাইলেন, বলীবর্দ্দও পশ্চাতে বেগে ছুটিল। যমরাজ ভয়ে যমলোক ছাড়িয়া এ লোকে সে লোকে ছুটা-ছুটি করিতে লাগিলেন, বলীবর্দ্দও তাঁহাকে মারিবে বলিয়া তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে দৌড়িতে লাগিল। ভয়-বিহ্বল যমরাজ কোন লোকে কাহারও দ্বারা এই বিপদে নিজের রক্ষার উপায় না দেখিয়া প্রাণভয়ে দৌড়িয়া বিষ্ণুলোকে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ বলীবর্দ্দ সহ মার মার শব্দে বৈকুণ্ঠে গিয়া উপস্থিত। যমরাজের চীৎকারে, ব্রাহ্মণের মার মার শব্দে, এবং ঊর্দ্ধপুচ্ছে ধাবমান বলীবর্দ্দের গম্ভীর নিনাদে বৈকুণ্ঠে একটা মহাহুলস্থূল পড়িয়া গেল। রত্নবেদিকায় বসিয়া পদ্মালয়া লক্ষ্মী ভগবান্ বিষ্ণুর পদসেবা করিতে-ছিলেন। ব্রাহ্মণ বলীবর্দ্দকে বলিল, যমরাজকে ছাড়িয়া এই মেয়েটীকে তাড়া কর। অমনি বলীবর্দ্দ লক্ষ্মীর দিকে দৌড়িল। লক্ষ্মী ভয়-বিহ্বলা হইয়া কোথায় যান, কি করেন, কিছুই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলেন না, অবশেষে রক্ষা কর রক্ষা কর বলিয়া বিষ্ণুর কাছে করযোড়ে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। বিষ্ণু ত্রিলোক-জননীর বিপদে ব্যস্ত হইলেন। বৈকুণ্ঠের রত্নসিংহাসন টলিয়া উঠিল। যমের চীৎকারে, বলী-বর্দ্দের চীৎকারে, মহালক্ষ্মীর চীৎকারে, ব্রাহ্মণের কোলা-

হলে বৈকুণ্ঠ একটা উৎকণ্ঠাময় স্থান হইয়া উঠিল। ভক্ত-বৎসল ভগবান্, যমরাজ ও ক্ষীরাব্ধিতনয়ার রক্ষার্থ বলীবর্দ্দকে নিবারণ করিতে গেলেন; কিন্তু তাঁহারই বিধিতে বাধ্য বলীবর্দ্দ বিনিবৃত্ত হইল না। সে কর্ম্মফল-ভোক্তা ব্রাহ্মণের আজ্ঞাকারী, লক্ষ্মীকে মারিবেই মারিবে। লক্ষ্মীর প্রাণ যায়, ভয়ে আকুল, বিষ্ণুকে করযোড়ে বলিলেন, শীঘ্র রক্ষা কর। বিষ্ণু তখন আর কি করেন, ভক্তকে রক্ষা করিবার জন্য ব্রাহ্মণকে বলিলেন, তুমি কি চাও? আমি বরদাতা বিষ্ণু, তুমি বলীবর্দ্দকে থামাইয়া লও, তুমি যাহা চাহিবে তাঁহাই দিব। ব্রাহ্মণ দিব্য দর্শনে ভগবানের দেবদুর্লভ মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া করযোড়ে বলিল, প্রভো! তোমার অপরূপ রূপ-দর্শনেই আমার সমস্ত কামনা পরিপূর্ণ হইয়াছে, মনের সমস্ত ময়লা কাটিয়া গিয়াছে; এই বর দাও, যেন তোমার এই বৈকুণ্ঠ-পুরীতে থাকিয়া তোমার সেবায় চিরদিন কৃতার্থ হইতে পারি। দীনদয়াল প্রভু অমনি বলিলেন, তথাস্তু। ব্রাহ্মণের আজ্ঞায় বলীবর্দ্দ স্থির হইল; যমরাজ কুশলপূর্ব্বক বলীবর্দ্দকে লইয়া নিজ লোকে চলিয়া গেলেন; ব্রাহ্মণ বৈকুণ্ঠবাসী হইয়া রহিলেন।

সভ্য মহোদয়গণ! গল্পটীর সত্যাসত্যের দিকে বিচার করিবেন না; কিন্তু এই মাত্র দেখিয়া লইবেন, যে কোন ক্ষুদ্র পুণ্যবলেই হউক, সৎস্বরূপের ক্ষণিক দর্শনেই ব্রাহ্মণের চির দুঃখ মিটিয়াগেল। ক্ষণজন্য স্বর্গ-সমাগমে চিরদিনের নরক-যন্ত্রণা মিটিয়া গেল। আমাদের সহস্র অশান্তি সত্ত্বেও যদি একবার মনঃপ্রাণ খুলিয়া ক্ষণজন্যও ধর্ম্মোৎসবে

মাতিতে পারি, যদি মুহূর্ত্ত জন্যও ধর্ম্মোৎসবরূপ উৎসের প্রবাহিত পবিত্র ভাবের নির্ম্মল সলিলে অবগাহন করিতে পারি, তাহা হইলে জানিবেন, ত্রিতাপ-জ্বালা জন্মের মত নিবারিত হইয়া যাইবে।

যে খানে জ্বলন্ত উৎসাহ, যে খানে নানা শোভন সামগ্রীর আয়োজন, যে খানে আনন্দের মহারোল, সেই স্থানই উৎসবময়। উৎসব নানা সুখের জনয়িতা। উৎসব কেবল বাহিরের ব্যাপারই নহে, উহা ভিতরের তরঙ্গ-স্তবকের বিকাশ মাত্র। কার্য্যকারণ-ঘটনার ভিতরে যে ছবি অঙ্কিত হয়, বাহিরে তাহার প্রতিচ্ছবি আপনিই প্রকাশিত হয়। ভিতরে দুঃখ হইলে বাহিরে চক্ষে জল-ধারা বহিতে থাকে। ভিতরে ক্রোধ হইলে বাহিরে ওষ্ঠাধর বিকম্পিত ও নয়ন আরক্তবর্ণ হয়। ভিতরে স্ফূর্ত্তির উদয় হইলে, বাহিরের মুখখানি ঢল ঢল ও হাসি হাসি হইয়া পড়ে। অরণ্যের ভিতরে ফুল ফুটিলে বনের বাহিরের চারি দিকও আমোদিত করিয়া তুলে। ভিতরে সুখের বাতাস বহিতে থাকিলে বাহিরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পুলকে পূর্ণিত হয়। আমাদিগের বাহিরে নিরানন্দের অন্ধকার ঘিরিয়া থাকিলেও ভিতরে অবশ্যই আনন্দের আকরভূমি বিদ্যমান আছে, সেই আনন্দধাম হইতেই উৎসবের উৎস উদ্গিরিত হইয়া আজ বাহিরে প্রবাহিত হইয়াছে। আমরা কিন্তু সাধারণতঃ আমাদের সম্মুখে সংসাররূপ মহাশ্মশানানল হইতে দুঃখের চিতা-ধূমই অনবরত উদ্গীর্ণ হইতে দেখিতেছি। স্থূল দৃষ্টিতে আপাততঃ এইরূপ বোধ হইলেও যখন তত্ত্ব-সাগরের গভীর হইতেও গভীরতর গর্ভে

ডুবিয়া যাই, যখন তলাতল ভেদ করিয়া অতল তলে তলাইয়া যাই, তখন সুখ-সাগরের মহামূল্য রত্নরাজি দেখিতে পাই। বাহিরে বালুকা-রেণু ছাইয়া থাকিলেও ফল্গুনদীতে তলে তলে জল বহিয়া যাইতেছে। বাহ্য বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞানের বালুকা-স্তর ভেদ করিয়া দেখ, কেমন সুশীতল জল দেখিতে পাইবে। আমরা যখন জলের জন্য কূপ খনন করিয়া থাকি, তখন অনেক দূর পর্য্যন্ত কঠিন মাটি কাটিতে হয়, তখন জলের নাম গন্ধও দেখিতে পাওয়া যায় না। ধৈর্য্য ধরিয়া যখন আরও মাটি কাটিতে থাকি, তখন ভূগর্ভস্থ বালুকা-স্তর বাহির হইয়া আইসে, তখনই বা জল কোথায়? আশার যষ্টি অবলম্বন করিয়া আরও ভূতল ভেদ করিয়া চলিয়া গেলে কর্দ্দমময় দল দল দেখা দেয়। কাদামাটি মাখিয়া আর একটু কাটিয়া তলায় চলিয়া যাও, ঝির্ ঝির্ নির্ম্মল নীর-ধারা দেখিতে পাইবে। সেইরূপ মানবের অন্তস্থল-গর্ভে আনন্দের সুধা-ধারা-প্রবাহ আছে। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় কোষ উদ্ঘাটিত করিয়া ভিতরে প্রবেশ কর, আনন্দময় কোষ দেখিতে পাইবে, তাহারই তলে ত্রিতাপজ্বালা জুড়াইবার গুপ্তধারা বহিয়া যাইতেছে। মানব! এই ধারার তুফান উঠিলে, এই ধারার তরঙ্গ ছুটিলে, দশদিক প্লাবিত হইয়া যায়; স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল এক হইয়াযায়। কূপ-খননের প্রথমেই যেমন মাটি, তেমনি প্রথমে পঞ্চভূতময় অন্নময় কোষ, তার পর বালুকা-স্তর প্রাণময় কোষ, তার পর দল দল কর্দ্দম মনোময় কোষ, তার পর ঝির্ ঝির্ জলধারা বিজ্ঞানময় কোষ, তৎপরে আনন্দ-

ময় কোষ ভেদ করিলেই চিরপ্রেমানন্দের ফোয়ারা খুলিয়া যায়। সদ্‌গুরুর কৃপায় আত্মার নিত্য নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ-লহরী যখন জীবের দৃষ্টিগোচর হইবে, তখনই জীবের জীবন উৎসবময় হইয়া যাইবে।

তোমার একটী স্বকুমার কুমার জন্মগ্রহণ করিলে তোমার সুখের সীমা থাকে না, আবার তাহার কর্ম্মাবসানে সে কাল-কবলিত হইলে তোমার শোক-সাগর উথলিয়া উঠে। পুত্র ত তোমার পূর্ব্ব-পরিচিত নহে, তাহার সহিত ত কখন দেখা শুনা ছিল না, তবে তাহাকে পাইয়া তোমার এত আহ্লাদ হইল কেন? সে জীব কোন্ দেশ হইতে আগন্তুক অতিথির ন্যায় আসিয়া তোমার পুত্রত্ব স্বীকার করিল, তাহা কে জানে? অতিথি আসে, আবার চলিয়া যায়, কৈ তাহার জন্য কেহ ত কখনও কাঁদিয়া আকুল হয় না। তবে তুমি এই পুত্রকে পাইয়া সুখী, এবং হারাইয়া দুঃখী হও কেন? যদি বাহ্যশরীর-রূপী পুত্রকে পাইয়াই তুমি সুখী হইয়া থাক, তবে তোমার দুঃখ করিবার কোন কারণ নাই; কেন না, পুত্রের শরীর ত তোমার কাছেই পড়িয়া রহিল, পুত্রের যে জিনিস বাহির হইয়া গিয়াছে, কৈ তাহার সহিত ত কখনও তোমার আলাপ বা আত্মীয়তা হয় নাই। অপরিচিতের বিয়োগে তুমি শোকার্ত্ত হইলে কেন? তোমার বালক-পুত্র যখন কৈশোর অতিক্রম করিয়া যৌবন দশায় উপস্থিত হইল, তখন বালক-পুত্রের অভাবে তুমি কাঁদিলে কৈ? আবার যৌবন অতিক্রম করিয়া তোমার পুত্র যখন বৃদ্ধ হইল, তখন যুবা পুত্রের জন্যই বা তুমি কাঁদিলে কৈ? এক্ষণে বিচার-

বুদ্ধিতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, বাহ্যশরীর রূপী পুত্রকে আমরা ভালবাসি না; আমরা ভালবাসি সেই জিনিসটীকে যাহার সহিত আমাদিগের কখনও দেখা শুনা নাই, যাহা না থাকিলে শরীর থাকে না। বস্তুতঃ, কেবলমাত্র শরীরে কাহারও পুত্র-বুদ্ধি নাই। বিদ্যালয়ে শিক্ষাকালে বালক যদি গুরুকর্ত্তৃক তাড়িত, শাসিত, ও দণ্ডিত হয়, তবুও পুত্র বিদ্যাবান্ হইবে বলিয়া তাহার শারীরিক ক্লেশের দিকে কেহ তাকাইল না। এ সময় পুত্রের মনের উৎকর্ষের দিকে সকলের দৃষ্টি, অথবা মনোময় পুত্রের দিকে সকলের যত্ন। আবার লেখাপড়া-শেখা পুত্র যদি নীতিপরায়ণ ধর্ম্মপরায়ণ বা জ্ঞানবান্ না হয়, তাহা হইলেও বড় দুঃখ, তখন আত্মারূপী পুত্রকে সকলে ভালবাসিয়া থাকে। ধীরে ধীরে দৃষ্টি দূর দেশে সঞ্চারিত করিলে সকলেই দেখিতে পায় যে, পুত্র বল, কন্যা বল, পতি বল, পত্নী বল, পিতা বল, মাতা বল, প্রভু বল, ভৃত্য বল, সখা বল, আর সুহৃদ্ বল, সকলই ভালবাসার রশ্মি-রাশি আত্মারূপ কেন্দ্র হইতে নিঃসারিত হইতেছে। একটা গুরুভার পদার্থ-পিণ্ডকে আকাশের দিকে যতই বল ও বেগ সহ উৎক্ষেপ কর না কেন, সে ঊর্দ্ধাতিঊর্দ্ধ দেশে যত দূর পারে উঠিয়া যাউক না কেন, পৃথিবীর দিকে আবার তাহাকে আসিতেই হইবে। তাহার গুরুত্ব পৃথিবীর আকর্ষণশক্তির সহিত চিরসম্মিলিত। এই আকর্ষণ—এই ভালবাসার গুণে তাহার গতি ধরাভিমুখে না হইয়া থাকিতেই পারে না। বাহ্য হইতে অভ্যন্তরের দিকে ধাবমান হওয়া ভালবাসা-প্রকৃতি। ভালবাসা অন্তর্মুখী, তাই পুত্রের শরীর

হইতে মনকে, মন হইতে আত্মাকে মানব অধিক ভালবাসিয়া থাকে। ঐ যে হাস্য-বিকসিত পুত্রের ঢল ঢল চন্দ্র-মুখখানি দেখিয়া তুমি আনন্দে আটখানা হইতেছ, তাহার কারণ, পুত্রের অন্তরাত্মার বিশুদ্ধ বিকাশের ছবি বাহিরে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে বলিয়া। ঐ যে সাধ্বী সতী যুবতীর আগুল্ফ-লম্বিত কেশ-পাশ, আকর্ণ-ভ্রূযুগ-বিভূষিত মৃগ-লোচনদ্বয়, স্বর্গীয় শুভ্রহাস্যিমাখা বিম্ব-বিনিন্দিত ওষ্ঠাধর, এবং নানা সুলক্ষণ ও সৌষ্ঠব-যুক্ত সুঠাম শরীর দেখিয়া তোমার হৃদয়ে যে পবিত্র আনন্দের লহরী খেলিতেছে, তাহা সেই মহামায়া মহাদেবীর বিভূতিস্বরূপা রমণীর অন্তরাত্মার স্বচ্ছ সুধা-বিধৌত চারুচন্দ্রিকার কিরণ-মালা বাহিরে বিকাশ পাইয়াছে বলিয়া। প্রীতি অন্তরাত্মার অন্তস্তল হইতে উদ্গত প্রেম-নির্ঝরিণীর সুধাধারার প্রবাহ মাত্র। ভিতরে ভাল-বাসার ফুল ফুটিলেই বাহিরে তাহার আনন্দরূপ সুগন্ধ ছুটিয়া আইসে। ভিতরে আনন্দের ছটা ছুটিতে থাকিলে বহির্জগতে সুখের—উৎসবের—মহামহোৎসবের মহাহিল্লোল বহিয়া যায়। আত্মা আনন্দস্বরূপ; আত্মার যাহা প্রিয়, তাহাই পরম সুখময়।

আত্মানন্দের শীতল বায়ু যে পরিমাণে মন ও বুদ্ধিকে স্পর্শ করে, সেই পরিমাণে মন ও বুদ্ধিতেও আনন্দের অনু-ভব হইয়া থাকে। বাহিরের কোন বিষয়ে সুখ নাই। সুখ বা দুঃখ বাহিরের কোন পদার্থেরই ধর্ম্ম নহে। মনের যখন যেমন অবস্থা থাকে, বহির্বিষয়-রাশিও তখন সুখকর বা দুঃখকর বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। মনে দুঃখোদয় হইলে

সংসার দুঃখময় বলিয়া বোধ হয়, মনে সুখের বাতাস বহিলে সমস্ত সংসার সুখময় বলিয়া বোধ হয়। যদি বাহিরের বিষয় বা পদার্থের ধর্ম্ম সুখ বা দুঃখ হইত, তাহা হইলে একই বিষয় বা একই পদার্থ কখনও সুখকর বা কখন দুঃখকর বলিয়া বোধ হইত না। বালককালে ক্রীড়া-কন্দুক-রাশি দেখিলে কত আহ্লাদ হইত, যৌবন বা বার্দ্ধক্যে তাহার প্রতি অত তাচ্ছিল্য ও উপেক্ষা হয় কেন? গৃহস্থ যখন সংসারের সুখ-সৌভাগ্য ভোগ করিবার জন্য মায়াতে ডুবিয়া থাকে, তখন সে বিলাসময় সামগ্রীতে কত সুখের প্রতিবিম্ব দেখিতে পায়, এবং বৈরাগ্য-বিচারবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া যখন সেই গৃহস্থ সর্ব্বত্যাগী যোগী সন্ন্যাসী হয়, তখন সংসারের সামগ্রী গুলি তাহার সম্মুখে শ্মশানের অঙ্গার বলিয়া বোধ হয়। এক সময়ে যাহাতে কত আনন্দের উদয় হইত, তাহাতেই আবার অন্য সময়ে বিষদৃষ্টি হইল কেন? যদি বিষয় সুখ-দাতা বা দুঃখ-দাতা হইত, তাহা হইলে অগ্নি কখন তপ্ত, কখন শীতল হইত। তাপ অগ্নির প্রকৃতিগত ধর্ম্ম, তাই অগ্নির যতদিন সত্তা থাকিবে, তাহাতে তাপ ভিন্ন শীতলতা কখনই জন্মিতে পারে না; সেইরূপ পদার্থ বিশেষের বা বিষয় বিশেষের সুখ বা দুঃখ যদি তাহার স্বভাবগত ধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে সুখ বা দুঃখ চিরদিনই তাহাতে বিদ্যমান থাকিত। কিন্তু সুখ দুঃখ মনেরই অবস্থা বিশেষ বলিয়া মন যখন সংসার-মায়ায় মোহিত থাকে, তখন মনের যে ভাব, বিষয়-বৈরাগ্যর উদয় হইলে মনের সে ভাব আর থাকে না। মনের মায়া-মোহিত অবস্থায় সংসারে মনের যে প্রীতি-

কণিকা বিকীর্ণ হইয়া পড়ে, বৈরাগ্য-দশায় সে ভাবের বিপর্য্যয় হইয়া থাকে; তখন সংসার মহাশ্মশান, তখন সংসার কালানল-দগ্ধ ভস্মীভূত কঙ্কাল-সদৃশ বলিয়া বোধ হয়। সুখ দুঃখ, অনুরাগ বিরাগ, মিত্রতা শত্রুতা আদি সমস্তই মানবের মনের ধর্ম্ম। কেহ ভাল বলিয়া তাহাকে আমি ভাল বলি না, কিন্তু আমি তাহাকে ভাল মনে করি বলিয়া তাহাকে আমি ভাল বলিয়া থাকি। কাহারও যখন আমরা নিন্দা করি, তখন সে প্রকৃত নিন্দিত কি না, তাহা ভগবান্ ভিন্ন আর কেহই জানে না; কিন্তু আমার মনের গতি অনুসারে তাহাকে আমি নিন্দিত এবং মন্দ ভাবি বলিয়া তাহার নিন্দা করিয়া থাকি। তুমি যাহাকে সুন্দর বলিয়া জান, আমি তাহাকে কুৎসিত বলি কেন? তোমার মনের সৌন্দর্য্যের সিদ্ধান্ত অনুসারে দেখিয়া তাহার রূপকে তোমার মনোমত বলিয়া বোধ হয়, তাহাই তুমি তাহাকে সুন্দর বলিয়া থাক; আর আমার মনের অবস্থানুসারে সৌন্দর্য্যের সিদ্ধান্তমতে আমার নিকট তাহার রূপ মনোমত বলিয়া বোধ হইল না, তাই তাহাকে আমি কুৎসিত বলিলাম। তুমি সুন্দর বলিলে সে সুন্দর নহে, আর আমি কুৎসিত বলিলেও সে কুৎসিত নহে; সে যাহা তাহাই আছে, তাহার স্বরূপ সিদ্ধান্ত করা তোমার আমার কর্ম্ম নহে। যখন মনের সমস্ত অবস্থা কাটিয়া যাইবে, তপস্তেজে যখন তোমার আমার প্রকৃতি নিতান্ত নির্ম্মল হইবে, মনঃপ্রকৃতিতে যখন অবিদ্যা-মায়ার ছায়ামাত্রও থাকিবে না, তখন ধর্ম্মাধর্ম্মের অতীত অবস্থায় দাঁড়াইয়া তোমার আমার মন—

তোমার আমার চক্ষু—যাহা দেখিবে তাহাই পদার্থের স্বরূপ, তখন তুমি তাহাকে সুন্দর, আমি তাহাকে কুৎসিত আর বলিব না, তখন আমরা উভয়েই দেখিব, সে সুন্দরও নহে, কুৎসিতও নহে, সে চিদ্ঘনানন্দ বিগ্রহ। ঐ দেখ বহুদিন তুমি বৈরীবুদ্ধি বশতঃ যাহার মুখাবলোকন করিতে না, দুর্গোৎসবের বিজয়া-দশমীর দিন সে তোমার গৃহে গিয়া সম্পর্ক অনুসারে তোমাকে প্রণাম করিল, তুমিও তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলে—প্রেমালিঙ্গন করিলে, আবার তাহাকে স্বচক্ষে দেখিলে। যদি শত্রুতা সেই ব্যক্তির প্রকৃতিগত ধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে বিজয়া-দশমীর উৎসবের দিনে সেই শত্রুকে আবার মিত্র-বোধ করিলে কিরূপে? তোমার মনের বৈরিতা-বুদ্ধি দুর্গোৎসবের পবিত্রশক্তির মহিমায়, বিজয়া-দশমীর পবিত্র অবকাশে বিনষ্ট হইয়া গেল, মৈত্র-ভাবের উদয় হইল, তাই যাহাকে শত্রু বলিয়া প্রথমে বুঝিতে, তাহাকেই আজ মিত্র বলিয়া স্বীকার করিলে।

উৎসব অলসকে উৎদ্যোগী করিয়া দেয়, অভাবযুক্তকে প্রভাবযুক্ত করে, অচেতনকে সচেতন করিয়া দেয়, উগ্রকে মৃদু করিয়া দেয়। উৎসব কঠোরকে কোমল করিয়া দেয়, খলকে সরল করিয়া দেয়, গরলকে সুধা করিয়া দেয়। উৎসব চ্যুতকে অচ্যুত স্থানে লইয়া যায়, ছিন্ন বিচ্ছিন্নকে একত্রিত ও সম্মিলিত করিয়া দেয়, জড়কে গতিযুক্ত করিয়া দেয়। উৎসব তিক্তকে মিষ্ট করিয়া দেয়, দীনকে সম্পন্ন করিয়া দেয়, ধৃষ্টকে শিষ্ট করিয়া দেয়, নিদ্রিতকে জাগ্রত করে, ও নষ্টকে বিশিষ্ট করিয়া দেয়। উৎসব পৈশুন্যের পরিবর্ত্তে ঋজুতার

বৃদ্ধি করে, বদ্ধকে মুক্ত করে, ব্যথিতকে আনন্দযুক্ত করে, ভয়ানককে আমোদপ্রদ করে, মলিনকে উজ্জ্বল করে, ও মৃতকে পুনর্জীবিত করে। উৎসব যন্ত্রণাযুক্তকে উৎফুল্ল করে, রোরুদ্যমানকে হাস্যযুক্ত করে, লালসাযুক্তকে সন্তোষ-যুক্ত করে। উৎসব শত্রুকে মিত্র করে, শূন্যকে পূর্ণ করে, সন্তপ্তকে সুশীতল করে, হীনকে প্রধান করে, এবং ক্ষীণকে তেজীয়ান করিয়া থাকে। উৎসবের শক্তি আশ্চর্য্য ও অনি-বার্য্যবীর্য্য-প্রসূতি।

সভ্য মহোদয়গণ! সুখ পাইবার যাঁহাদিগের ইচ্ছা, তাঁহারা বাহিরে অন্বেষণ করিলে কোথাও তাহা পাইবেন না। সুখের ভাণ্ডার ভিতরে আচ্ছাদিত রহিয়াছে। বাহি-রের উপায় দ্বারা দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা বৃথা। দুঃখের মূল ভিতরে—মনের ভিতরে রহিয়াছে, তাহা উৎখাত করিতে না পারিলে সুখের দেখা পাইবেন কোথা? ভগবান্ দয়া করিয়া সুখের সুধা-ভাণ্ডার সকলেরই নিজ নিজ মনোময় মণিমন্দিরে সংস্থাপিত করিয়া রাখিয়াছেন, সে ভাণ্ডার সর্ব্বদা ভরপূর জানিবেন। দুঃখ মিটাইবার জন্য ও সুখলাভের নিমিত্ত কাহাকেও পরমুখাপেক্ষা করিতে হয় না। অভিমানী জীব আমরা, লোকের কাছে নিজ মর্য্যাদা রক্ষা করিতে গিয়া কত সময়ই যে আমরা নিতান্ত উদ্বেজিত হই, তাহা বলিতে পারি না। তুমি যদি 'গভর্ণর জেনারলের লেভিতে' বসি-বার অধিকার নাই পাইলে, তাহাতে তোমার অমর্য্যাদা কি? তুমি যদি সভা মধ্যে একটা উচ্চ আসন না পাইলে, তাহা-তেই বা ক্ষতি কি? কত কীট পতঙ্গ ত মন্দিরের উচ্চ চূড়ায়

আসিয়া বসে, কত বানর ত বৃক্ষের উচ্চ শাখায় বসে, কত পক্ষী ত উচ্চাতিউচ্চ গগন-মার্গে বিচরণ করিয়া থাকে, তাহাতে কি তাহারা অতি মর্য্যাদাপন্ন জীব বলিয়া পরিগণিত হইবে ? কাজ কি তোমার লোক-মর্য্যাদায়? কাজ কি তোমার বাহিরের প্রতিষ্ঠায় ? কাজ কি তোমার বৃথা অভিমানের গৌরবে ? একবার বাহির হইতে চক্ষু ফিরাইয়া অন্তর্জগৎ দর্শন কর ; দেখিতে পাইবে, সকল ঈশ্বরের ঈশ্বর রাজরাজেশ্বর তোমার হৃদয়রূপ রত্নবেদীতে বসিয়া ত্রিলোকের তত্ত্ব লইতেছেন, মহারাজ দরবারে বসিয়া চতুর্দ্দশ ভুবনের শাসন করিতেছেন। তাঁহার ভয়ে ভীত হইয়া সকল লোকে সকল কার্য্য করিতেছে—

"ভয়াদস্য অগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥"

সেই ত্রিভুবন-বন্দিত মহারাজাধিরাজ রাজরাজেশ্বর শাসনদণ্ড করে লইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহারই শাসন-ভয়ে ভীত হইয়া অগ্নি উত্তাপ প্রদান করিতেছে, মার্ত্তণ্ড প্রচণ্ড কিরণ বর্ষণ করিতেছেন, মেঘবাহন ইন্দ্র বারিবর্ষণ করিতেছেন, প্রবল পবন দেশে দেশে ছুটিতেছে, ও মৃত্যু চারিদিকে ধাবিত হইতেছে। সাধুহৃদয়গণ ! এই রাজরাজেশ্বরের দরবারে স্থান পাইবার জন্য চেষ্টা করুন। সেখানে মান আছে, কিন্তু অভিমান নাই ; সেখানে গৌরব আছে, কিন্তু অহঙ্কার নাই ; সেখানে ঐশ্বর্য্য আছে, কিন্তু লোভ নাই ; সেখানে প্রতাপ আছে, কিন্তু নিষ্ঠুরতা নাই ; সেখানে মহত্ত্ব আছে, কিন্তু অন্যের প্রতি তাচ্ছল্য নাই। এই রাজাধিরাজ মহারাজ মহাপ্রভু

যাঁহাকে দয়া করিয়া চরণে স্থান দিয়াছেন, তাঁহার জগতে আবার অভাব কি ? তাঁহার আবার দুঃখ কি ? আনন্দ ও উৎসবের উচ্ছ্বাস তাঁহার হৃদয়ে সদাই খেলিতেছে। বাহিরের অবস্থার দিকে তাকাইলে দীনদুঃখী ভারতবর্ষের—পরপদ-বিদলিত ঘৃণিত ভারতবর্ষের—আজ উৎসব করিবার কথা নয় বটে ; কিন্তু অন্তর্জগতের দিকে তাকাইলে, অলৌকিক অধ্যাত্ম রাজ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, ভারতবর্ষের সদাই উৎসাহ-পূর্ণ উৎসব করিবার কথা। বাহিরের দুইদিনের ছার সংসার দুঃখময় বটে, বাহিরের অবস্থা ব্যবস্থা অতি শোচনীয় বটে ; কিন্তু সাধুহৃদয়গণ ! ভারতীয় আর্য্যজাতি চিরদিনই অন্তর্জগতে বিচরণ করিয়াছেন, অন্তর্জগতেরই সুখ দুঃখ বিচার করিয়াছেন, অন্তর্জগতের দিব্যজ্যোৎস্নায় তাপিত অঙ্গ শীতল করিয়াছেন। মানব বাহিরের তপ্ত ধূলায় দগ্ধদেহ হইলে অন্তঃসলিলা শীতলাম্বু-বাহিনী ফল্গুনদীতে অবগাহন করিয়া নিজকুল, পিতৃকুল পবিত্র করিয়া থাকেন ; তাই বলি, ভিতরের ব্যাপার দেখিতে পাইতেছেন না বলিয়া, অন্তরের অন্তরে প্রবেশ করিতে পারিতেছেন না বলিয়া, প্রাণের প্রাণ সুধাসিন্ধুতে ডুবিতে পারিতেছেন না বলিয়া, ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়-স্বরূপের দ্বার উদ্ঘাটিত হইতেছে না বলিয়া, সেই নিত্যানন্দময়, সেই পরম সুখময়, সেই মহামহোৎসবময় ধামের সুবাসিত বাতাসে সুখী হইতে পারিতেছেন না। এই উৎসবের অধিষ্ঠাতা যিনি, যাঁহার নামে আজ সভা-স্থান পরিপূর্ণ, তাঁহারই প্রেম-কিরণ-মালাকে মণিময় মালা করিয়া হৃদয়ে ধারণ করুন। পতিত দুঃখপূর্ণ সংসার আজ হাসি-

মাখা সুনির্ম্মল শুভ্র মূর্ত্তি ধারণ করিবে, আজ মহাশ্মশান কাশী-স্বর্ণপুরী হইবে। আনন্দ বল, উৎসব বল, সমস্ত তাঁহা-কেই লইয়া। পবিত্র ভারতবর্ষ—তপস্তেজঃপূর্ণ ভারতবর্ষ—বিচার-বৈরাগ্য-যুক্ত ভারতবর্ষ— সাধন-সিদ্ধ ভারতবর্ষ—তাঁহাকে ফেলিয়া, তাঁহাকে ভুলিয়া, কখনও উৎসব করে নাই। ভারতের সমস্ত উৎসবই মহামহোৎসবময় অধ্যাত্ম জগতের আলোক-ছটায় পরিপূর্ণ সুচারু পূর্ণচন্দ্রের সুশীতল কিরণ-মালা মাত্র। ভারতের ভিতরে মহোৎসব, তাই ভারতের বাহিরেও তাহার মৃদু মধুর বাদ্যধ্বনি শ্রুত হওয়া যায়। ভিতরের উৎসবের সৌরভ না ফুটিলে বাহিরের উৎসবে চিত্ত আমোদিত হইবে কেন? ভিতরের ঝরণা না ফুটিলে বাহিরে শীতল ধারা বহিবে কেন? যাঁহারা এই বিষ্ণুপাদো-দকী উৎসব-গঙ্গায় অবগাহন করিতে আসিয়াছেন, এবং স্নানে হৃদয় স্নিগ্ধ করিবেন, তাঁহারাই ধন্য, তাঁহারাই কৃতার্থ।

জড়বাদিগণ বাহিরের পদার্থ ও তন্নিহিত শক্তি ব্যতীত আত্মশক্তি বলিয়া একটা বিশেষ শক্তি স্বীকার করিতে চাহেন না। জড়বাদী অবশ্যই ইহা স্বীকার করেন যে, আমাদের সম্মুখে যত বস্তু রহিয়াছে, সেই বস্তু স্বরূপতঃ আমাদিগের নেত্র-গোচর হয় না। বস্তু কি, আমরা দেখিতে পাই না। বস্তুর গুণের দ্বারাই বস্তুর তত্ত্ব নিরূপিত হইয়া থাকে। বস্তুকে আশ্রয় করিয়া যে রূপ, যে ব্যাপকতা, যে উচ্চতা, যে দীর্ঘতা, যে প্রশস্ততা আদি গুণ রহিয়াছে, তাহাই আমাদিগের ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হয়। বস্তুর গুণ ও বস্তুর শক্তি বুঝিলাম বটে, কিন্তু বস্তুর স্বরূপ দেখিতে পাইলাম

কৈ ? বস্তুর শক্তিকে আমরা আদর করি বটে, কিন্তু বস্তুকে আমরা আদর করিতে পাই কৈ ? আমরা পদার্থকে ভালবাসি না, আমরা পদার্থের শক্তি লইয়াই—গুণ লইয়াই কার্য্য সাধন করিয়া থাকি। পদার্থ নহিলে গুণ বা শক্তি স্বতন্ত্র ভাবে ব্যবহার করিতে পারি না, তাই পদার্থের যাহা কিছু খাতির করিয়া থাকি। জ্বর হইলে 'কুইনাইন' খাও কেন ? কুইনাইনে জ্বরঘ্নতারূপ শক্তি আছে বলিয়া। কুইনাইন অতি পুরাতন হইয়া গেলে যখন ঐ শক্তি কমিয়া যায়, তখন সে কুইনাইনকে আর কে আদর করে ? কোন্ ডাক্তার তাহাকে আর 'আলমায়রূম্ব্র' মধ্যে রাখে ? কোন্ রোগী বা সেই কুইনাইন পয়সা দিয়া ক্রয় করে ? বস্তুতঃ জগৎ বস্তু-প্রিয় নহে, বস্তু-শক্তিরই উপাসক ; জগৎ শক্তিরই সেবা করিয়া থাকে। শক্তি-শূন্য বস্তু অবস্তু, আবর্জ্জনা মাত্র। বাহিরের জগৎ একটা আবরণ বা খোসা মাত্র। শক্তিজ্বল-সঞ্চারের একটা যন্ত্র মাত্র। বাহিরের স্তর ভেদ করিয়া শক্তির অনন্ত স্তরের অভিমুখে ধাবিত হও, দেখিতে পাইবে, সূর্য্য হইতে যেমন কিরণ-জাল বিকীর্ণ হইয়া জগতের অণু-পরমাণুর দিকে ছুটিতেছে, সেইরূপ ত্রিজগৎ-প্রকাশক অন্তরাত্মারূপ ভানু হইতে এই শক্তির কিরণ-মালা বহির্জ্জগতের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে, ও জগৎকে স্থিত ও প্রকাশিত রাখিয়াছে। তাঁহারই লোকালোক-বন্দিত সুচারুসত্তা-সুধাসিন্ধু হইতে উচ্ছলিত হইয়া মহানন্দের প্রবল প্রবাহ অবিদ্যার কালিঝুলিমাখা জীবকে ধোয়াইয়া, নাহাইয়া, সাজাইয়া, গুছাইয়া দিতেছে ; তাই

সেই সাধুজীবের বর্ণ ফুট্‌ফুটে হইয়াছে, মুখ ঢল ঢল—প্রেমে টল টল, ও নেত্র সজল হইয়াছে, তাই উৎসবে—আহ্লাদে—প্রেমানন্দে অঙ্গ ঢলিয়া পড়িতেছে। আমরা আধারকে আদর করি কেন? আধেয় শক্তি তাহা হইতে পাইব বলিয়া। ইক্ষুকে মিষ্ট বলি কেন? ইক্ষুরূপ আধারে রসরূপ মিষ্টশক্তি আছে বলিয়া। চক্ষুকর্ণাদি-যুক্ত এই শরীর ইক্ষুদণ্ড-স্বরূপ, আত্মা মধুর হইতেও সুমধুর রস-স্বরূপ। শ্রুতিও আত্মাকে "রসো বৈ সঃ" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভগবানের নাম-সাধন করিয়া যাঁহার জিহ্বা নির্ম্মল হইয়াছে, তিনিই এই রসাস্বাদনে সমর্থ, তিনিই এই রসের মধুরতা বুঝিতে পারেন। যে দিনই কেহ এই রসসিন্ধুর সুধাবিন্দু পান করিবেন, সেই দিনই তাঁহার ত্রিতাপ-তপ্ত মনঃপ্রাণ জুড়াইয়া যাইবে, নীরস জীবন সরস হইয়া উঠিবে। হৃৎকন্দরে লুক্কায়িত নিভৃত এই নিত্যানন্দ-নির্ঝরিণী হইতে যে দিন সুখ-সুধার ধারা বহিয়া বাহিরে আসিবে, সেই দিনে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আনন্দে আপ্লাবিত হইয়া যাইবে।

সংসারে যাহা আপাততঃ সুখ বলিয়া আমাদের প্রতীতি হয়, তাহা হইতেই পরিণামে দুঃখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যাহাতে দুঃখের লেশমাত্র নাই, এমন সুখ জগতে কোনও ভোগী পুরুষ ভোগ করিতে পায় না। মহাসুখসম্ভোগ-কালেও দুঃখের স্মৃতি ও নানা প্রকার ভয়ভাবনা আসিয়া সুখ-ভোগের বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া থাকে। সুখের সমাগমে সুখ, ভোগকালে সুখ, কিন্তু বিয়োগকালে দুঃখ; আবার দুঃখের সমাগমে দুঃখ, দুঃখ ভোগকালে দুঃখ, কিন্তু দুঃখ

বিয়োগকালে সুখ হইয়া থাকে। ত্রিকালে কেবল সুখ এমন সুখ সংসারে নাই। দুঃখমাখা সুখ যে সুখের নহে, ইহা কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। যাহার প্রারম্ভে সুখ, প্রবাহে সুখ, এবং পরিণামে সুখ, তাহাই প্রকৃত সুখ। বরফ যেমন পূর্ব্বেও জল, মধ্যেও জলময়, পরিণামেও জল, সেইরূপ যে সুখ দুঃখলেশ-পরিবর্জ্জিত ও নিত্য নিরবচ্ছিন্ন, সেই সুখই জীব প্রার্থনা করিয়া থাকে।

আর্য্যজাতি প্রকৃতির সমস্ত স্তর ভেদ করিয়া দেখিয়াছিলেন, গুহ্যাতিগুহ্য নিভৃত তত্ত্ব-বিচার করিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত কোন মতেই প্রকৃত সুখের মুখ দেখিতে পাওয়া যায় না। কোন ধর্ম্মানুরাগী পুরুষ যখন একাদশীর উপবাসরূপ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তখন বাহিরের লোক হয়ত ভাবিতে পারে, উপবাসে তাঁহার যথেষ্ঠ কষ্ট হইতেছে; কিন্তু ধার্ম্মিক পুরুষ তাহাতে কষ্টবোধ করেন না, বরং তিনি ইহাই মনে করেন যে, আজ তাঁহার বড় শুভ দিন যে, আজ তিনি হরিপদ-আরাধনার জন্য আহার সংযম করিবার অবকাশ পাইয়াছেন। প্রেমের দৃষ্টিতে তাঁহার অন্তরাত্মা অতিশয় প্রফুল্ল হয়। যাঁহার বাড়ীতে দুর্গোৎসব, তিনি যখন ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইতে ও দীন দুঃখীকে অন্ন বিতরণ করিতে ব্যস্ত থাকেন, তখন সমস্ত দিনের মধ্যেও হয়ত তাঁহার বিন্দুমাত্র জলগ্রহণও ঘটিয়া উঠে না, ইহাতে তিনি কি কষ্ট অনুভব করিয়া থাকেন? বরং সেই উপবাসে তিনি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়া আনন্দিত হইয়া থাকেন। এইরূপ ব্রত ও ব্রাহ্মণ-ভোজনাদি

ব্যাপারের প্রারম্ভকালে মনের সুখ, সাধনকালেও মনের সুখ, এবং পরিণামেও মনের সুখ; কারণ, পুণ্য-প্রতাপে স্বর্গাদি-সুখলাভ হইয়া থাকে। এই সুখময় ব্যবস্থাকে পরিহার করিয়া মূর্খ ব্যতীত আর কে অন্য কাল্পনিক সুখের জন্য বাধিত হইবে? ধর্ম্মনিষ্ঠ ভারতবর্ষ ছিন্নকন্থাধারী, ভিক্ষা-ভারী হইয়াও ধর্ম্মের সুখ ব্যতীত আর কোন সুখ-প্রার্থনা করেন না। সংসারের ক্ষণিক সুখ তাঁহার চক্ষে চিরদিনই উপেক্ষিত। আমাদিগের সামাজিক ও পারিবারিক ব্যবস্থাও শাস্ত্রের দ্বারা এইরূপ নিরূপিত হইয়াছে যে, বিধি-পূর্ব্বক কার্য্য-ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে পারিলে নিত্য সুখের পন্থাই উন্মুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদিগের দুরদৃষ্ট-দোষে, অদূরদর্শী আমরা, আমাদের ব্যবহার-দোষে, মূঢ় আমরা, আমাদিগের কুশিক্ষার দোষে, অনবরত অবৈধ কার্য্য করিতে করিতে আমাদের ধর্ম্ম-তৃষ্ণা কমিয়া আসিতেছে। এই উৎসবোপলক্ষে শাস্ত্রের আলোচনা, ধর্ম্মের আলোচনা দ্বারা আমাদিগের সদসদ্বিবেচনা-বুদ্ধি মার্জ্জিত হইবে, এবং ক্রমশঃ আমরা নিত্য সুখের অধিকারী হইতে থাকিব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আনন্দস্বরূপ আত্মারূপ সূর্য্যের কিরণ-মালা বিকীর্ণ হইয়াই সুখের বিস্তার হইয়া থাকে, শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—

> "আনন্দময়োহ্যাত্মা এতস্যৈব আনন্দস্য
> মাত্রা উপজীবন্তি সর্ব্বে আনন্দাঃ।"

যে আনন্দের ছায়ামাত্র পাইয়াই জীব আনন্দে আটখানা হইয়া থাকে, না জানি সেই স্বরূপানন্দ লাভ করিলে জীবের

কত সুখই হইয়া থাকে। কিন্তু মায়া-মুগ্ধ জীব, সে দিকে মতি গতি কৈ? দারুণ শীতে তুমি থর থর কাঁপিতেছ, রৌদ্র পোহাইতে তোমার বড় ইচ্ছা, তাই তুমি ঘরের দুয়ার খুলিয়া সেই দিকে পিঠ দিয়া বসিয়া আছ, ঐ দ্বার দিয়া সূর্য্য-রশ্মি আসিয়া তোমার গায়ে লাগিবে, জড়সড় শীতার্ত্ত দেহ কর্ম্মঠ ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইবে। সূর্য্যের গতি যে দিক দিয়া, তোমার দ্বার যদি তদভিমুখী হয়, তবেই ত তোমার ঘরে রৌদ্র আসিবে, আর যদি সূর্য্যরশ্মি আসিতেছে এক দিকে, আর তোমার দুয়ার হয় অন্য দিকে, তবে রৌদ্র পোহাইবে কিরূপে? সংসারের যন্ত্রণা কাতরতায় আমরা জড়সড়, আমাদের ইচ্ছা হয়, ঘরে বসিয়া সুখ-সূর্য্যের রৌদ্র পোহাইয়া লই; তাই চক্ষু, কর্ণাদি নবদ্বার খুলিয়া বসিয়া আছি। যিনি সূর্য্যস্বরূপ জ্যোতির্ম্মণ্ডলময়, তাঁহা হইতেই সুখের কিরণমালা অবিরল বিকীর্ণও হইতেছে সত্য, তবে আমরা সুখের রৌদ্র-সম্ভোগ করিতে পাই না কেন? মনের বিলাস-দ্বারগুলি ধর্ম্মকার্য্যের সমসূত্রপাতে উন্মুক্ত থাকে না বলিয়া। সকল ইন্দ্রিয়ের কার্য্যই যদি ঈশ্বরাভিমুখী হয়, তাহা হইলে জীবের সুখের সীমা থাকে না। মনের গতি, ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার, সকলই সংসার লইয়া, সেই জন্য সেই নিত্য সুখ আমরা প্রাপ্ত হই না, সেই সুখের ছায়ামাত্র পাইয়াই আমরা ভুলিয়া থাকি। যে কিরণের স্পর্শমাত্রে সমস্ত জড়তা বিলুপ্ত হইয়া যায়, যে তড়িন্ময়ী শক্তি সঞ্চারিত হইলে সংসার-জ্বালায় জড়ীভুত, বিষয়-বিষে জর্জ্জরিত, ও মোহ-মূর্চ্ছায় অচেতন মনঃপ্রাণ সতেজ ও সচেতন হইয়া উঠে, আমরা

সে দিকেই একবার তাকাইলাম না, তদভিমুখে দুয়ার খুলিয়া রাখিলাম না, কেবল কায়া ফেলিয়া ছায়ায় মুগ্ধ হইলাম, আসল ফেলিয়া নকল লইয়া ভুলিয়া গেলাম, সুতরাং সুখী হইতে পারিলাম না। কুমুদিনী সুধার জন্য চন্দ্রের কাছেই চাহিয়া থাকে, চাতক পিপাসার শান্তির জন্য মেঘের কাছেই ভিক্ষা করে, অন্যের কাছে নহে। সরোবরে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের দিকে কুমুদিনী ফিরিয়াও চায় না, নদনদী ও সাগরে অগাধ জল থাকিতেও চাতক সে জল পান করে না। জীব! তোমার অন্তর-গহনআকাশ আলো করিয়া যে সুচারু চন্দ্রিমা সুস্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার ছটায় হাসিয়া ভাসিতেছে, একবার তাহার দিকে নেত্রপাত কর, পূর্ণ চন্দ্রের মধুর সুধারাশিতে তোমার মনঃপ্রাণ শীতল হইয়া যাইবে, তোমার ত্রিতাপ-জ্বালা মিটিয়া যাইবে। সংসারের বাহিরে বাহিরে চিরকাল অন্বেষণ করিলেও সে সুধালাভ করিতে পারিবে না। ধর্ম্মোৎসবের স্বর্গীয় উৎস-বারিতে চক্ষু ধুইয়া লও, দিব্য দৃষ্টি হইবে, প্রেম-সুধাকরের বিমল ছবি দেখিতে পাইবে।

ইতিপূর্ব্বে প্রতিপন্ন হইয়াছে, পরম সুখের পথ খুলিবার জন্যই উৎসবের অবতারণা বা আবশ্যকতা। সংসারের দুঃখ-দাবানলের তীব্র শিখা নির্ব্বাণ করিবার জন্যই উৎসবের উৎস বিনির্ম্মুক্ত হইয়াছে। ভগবৎ-সেবা-সম্বন্ধ লইয়াই ধর্ম্মিষ্ঠ ভারতে উৎসব। পার্থিব সম্পত্তি বা বিলাস-বৈভব লইয়া ভারতীয় উৎসবের প্রতিষ্ঠা নহে। উৎসবে এইরূপ ব্যাপার সমূহই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, যাহাতে ক্ষুন্ন চিত্তও প্রসন্ন হইয়া উঠে। পূজার সময় যখন শঙ্খ ঘণ্টার

নিনাদ হইয়া উঠে, চারিদিকে ধূপ ধুনার সৌগন্ধ ছুটে, আরতির দীপমালা যখন জ্বলিয়া উঠে, তখন অবসন্ন চিত্তও প্রসন্ন হইয়া দাঁড়ায়। আর্য্য ঋষিমুনিগণ দীনদুঃখীর প্রতি দয়া করিয়াই অন্তর্জ্জগতের গুপ্ত গৃহে আনন্দ-ছটার ছায়া লইয়াই উৎসব-রাশির ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। যোগী, মুনি পরমানন্দ-সাগরে ডুবিয়া রস-সাগরে আপনাকে নিমগ্ন করিয়া যে রত্নমালা পাইয়াছিলেন, তাহাই দীনদুঃখীকে বিনা মূল্যে বিতরণ করিবার জন্য উৎসবের উদ্যোষণা করিয়াছেন। ভগবৎ-সেবা করিতে করিতে যে গুপ্ত ভাণ্ডারের অমূল্য গুপ্তনিধি পাইয়াছিলেন, যে অধ্যাত্ম যাগে পূর্ণাহুতি দিয়া মহোৎসবে মত্ত হইয়াছিলেন, দীনদিগের প্রতি দয়া করিয়া তাহারই অধিকারী করিবার জন্য উৎসবের সঙ্কেতে সেই গুপ্ত গৃহের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা দয়ালু ছিলেন, তাই আমরা না চাহিতে, আমাদের সুখের সোপান খুলিয়া দিয়া গিয়াছেন। সংসারে বিপুল ধনের অধিকারী তুমি, কয় জন দীনদুঃখীকে তাহা তুমি বিতরণ করিয়া থাক। দয়ার সাগর ঋষিগণ কত পরিশ্রম করিয়া কত সাধের ধন পাইয়াছিলেন, প্রাণ ভরিয়া স্বয়ং তাহা ভোগ করিয়াছেন, এবং দুই হাত তুলিয়া আমাদিগের ন্যায় দীনদুঃখীকে বিলাইয়া গিয়াছেন। যেমন নিজের একটা দুর্ঘটনা ঘটিলে নয়নে অশ্রুধারা বহিয়া থাকে, সেইরূপ শোক-সন্তপ্ত অন্য কোন মণ্ডলীর মধ্যে বসিলেও তোমার হৃদয়ে শোকাবেগ সঞ্চারিত হইয়া থাকে। যেখানে সকল লোকেই আমোদ করিতেছে, তুমি উদাসচিত্ত হও না কেন,

সেইখানে গিয়া ক্ষণেক কাল বসিয়া থাকিলে তোমারও চিত্ত আমোদিত হইবে। সেইরূপ যে উৎসবে কতিপয় ব্যক্তিও হৃদয়ের কপাট খুলিয়া আপনার প্রাণের সখার গুণগান-কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, যে উৎসবে কতিপয় ব্যক্তিও উৎসাহ সহ সম্মিলিত হইয়াছেন, সেই আনন্দ-মণ্ডলীর মধ্যে এক জন আমার ন্যায় জন্ম-দুঃখী আসিয়া প্রবেশ করিলে, আমার ন্যায় ত্রিতাপ-তপ্ত কোন ব্যক্তি আসিয়া বসিলে, তাহার মনে উৎসবের অমৃত-কণিকা প্রবেশ করিবে, উৎসবের আনন্দ-লহরী তাহাকে পরিতৃপ্ত করিবে, উৎসবের আনন্দ-ঝঙ্কারে হৃদয়-নিকুঞ্জ-কানন নিনাদিত হইবে। দুঃখ-পূর্ণ সংসারে সুখ-লাভ করিবার জন্যই উৎসব সম্পাদিত হইয়া থাকে। দুঃখময় সংসাররূপ মরুভূমিতে ধর্ম্মোৎসব সুস্নিগ্ধ সরোবর-সদৃশ। সাংসারিক দুঃখরূপ কালনিশিতে উৎসবই শুকতারা। উপ-সর্গ ও উপদ্রব-পূর্ণ সংসার-রোগ-বিনাশে উৎসব একটী মহা-মহৌষধ। চিন্তাশীল ভারতবর্ষ উৎসবের মহাশক্তির তত্ত্ব বুঝিয়াছিলেন, তাই মাসে মাসে কত পর্ব্বোৎসবের ছটা বাঁধিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষ বাহিরে ধুমধাম করিয়াই উৎসব সমাপন করেন না, ভিতরে বাহিরে উৎসবে উন্মাদিত হইয়া ভারতবর্ষ নৃত্য করিয়া থাকেন। বাহিরের উৎসবের দিকে দৃষ্টি করিলে বোধ হয়, ইহা আমোদ আহ্লাদ ও ধুম-ধাম মাত্র; কিন্তু ভিতরের দিকে তাকাইলে দেখিতে পাওয়া যায়, এতাবৎ সাধনার স্তর-রাশি। আর্য্য ঋষিমহাত্মাগণ বাহিরের উৎসবের ঠাট রচনা করিয়া তন্মধ্যে গভীর সাধ-নার গুপ্তরত্ন লুকাইয়া রাখিয়াছেন। উৎসব কাল্পনিক নহে,

ছেলে-খেলা নহে, প্রকৃতির নিয়ম-রেখাবলী-বিজড়িত, অগাধ সাধনার তত্ত্ব ইহার মধ্যে অবগুণ্ঠিত।

গ্রহ নক্ষত্রাদির সহিত পৃথিবীর যে নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে, তাহা শিক্ষিত সভ্যমাত্রেই অবগত আছেন। রাশিচক্রের সহিত পৃথিবীর ও শরীরের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহা আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। এই রাশিচক্রের বিঘূর্ণনেই মাস, ঋতু আদির বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। রাশিচক্রাদির গতিবিধিতে যেমন বৃহদ্ব্রহ্মাণ্ডের অবস্থা-পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয়, সেইরূপ ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডরূপ দেহেরও অবস্থা-চক্র বিঘূর্ণিত হইয়া থাকে। যে মাসে বা যে ঋতুতে জল, বায়ু, শীত, তাপ যেরূপ জগৎ-যন্ত্রে পরিচালিত হইয়া থাকে, তদনুসারে শারীর প্রকৃতি ও মনঃপ্রকৃতির অবস্থান্তর হইয়া থাকে। বাহ্য প্রকৃতির অবস্থানুসারে মনঃপ্রকৃতি যদি সংযমিত এবং পরিচালিত হয়, তাহা হইলে প্রকৃতি সদা বিশুদ্ধ থাকে, মানব তাহা হইলে প্রশান্ত অন্তঃকরণে স্বচ্ছন্দ শরীরে ভগবদ্বিভুতির পূর্ণ বিকাশ দেখিতে সমর্থ হয়। আহার ব্যবহারের দোষে ও নানা কারণে বিশাল ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপিনী প্রকৃতির সহিত যখন মানব প্রকৃতি যথানিয়মে চলিতে না পারে, তখনই শরীর ও মনের নানা যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। ভব-যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইবার জন্যই মূল প্রকৃতির চরণ-সেবা করা কর্ত্তব্য। যখন গঙ্গার সহিত নহরের মুখ সম্মিলিত থাকে, ও নহরের দ্বার উন্মুক্ত থাকে, তখনই গঙ্গার নির্ম্মল জল প্রবল ধারায় নহরে প্রবেশ করিয়া দেশ দেশান্তরে প্রবাহিত হইয়া বিশুষ্ক ভূমিতল সুশীতল

করিতে থাকে। সেইরূপ অনাদ্যা প্রকৃতি-রূপিণী আদি-গঙ্গার সহিত যতদিন জীব-প্রকৃতিরূপ নহরের মুখ সম্মিলিত থাকিবে, যতদিন এই সঙ্গমদ্বার ময়লামাটি পড়িয়া বন্ধ হইয়া না যাইবে, ততদিন অনাদ্যা প্রকৃতির নির্ম্মল শক্তি-ধারা জীব-প্রকৃতিতে প্রবাহিত হইবে। জীব-প্রকৃতি যখন এইরূপ ভাগবতী প্রকৃতি লাভ করিবে, তখনই তাহার সিদ্ধি, তখনই তাহার মুক্তি, তখনই তাহার পরমানন্দ। প্রাকৃতিকী [illegible] চৈতন্যস্বরূপকে আশ্রয় করিয়া লীলা করিয়া [illegible] হাকে লাভ করিতে হইলে প্রকৃতির যথাযথ উপা-[illegible]শ্যক। প্রকৃতির স্রোতের যে অবস্থায় যে ময়লা মাটি ভাসিয়া আসিবার সম্ভব, তাহা তত্ত্বজ্ঞ যোগীন্দ্র, মুনীন্দ্র-গণ তপোবলে বিশেষরূপে বিদিত ছিলেন, তাই কোন্ কৌশল করিলে, কোন্ সময়ে কোন্ উপাসনারূপ উপায় অবলম্বন করিলে, মানব প্রকৃতির দ্বারে কোন ময়লামাটি প্রবেশ করিতে পারিবে না, তাহা বিদিত হইয়াছিলেন, এবং তজ্জন্যই মাসে মাসে পর্ব্বোৎসব-পদ্ধতির ব্যবস্থা করিয়াছেন।

অবিদ্যার অধিকার হইতে যখন মানব ব্রহ্মবিদ্যার রাজ্যে বাস করিতে যায়, সেই মহাবিষুব সংক্রান্তির দিনে, সেই অতীত ও ভবিষ্যতের শুভ সাক্ষাৎকারের দিনে চড়ক-পূজার মহামহোৎসব হইয়া থাকে। মায়াচক্রে বিঘূর্ণিত জীব চড়কের অশেষ পাক খাইয়া আনন্দ-স্বরূপের দর্শন করিতে উদ্যত হয়। নাক ফুঁড়িয়া, পিঠ ফুঁড়িয়া, জিহ্বা ছেদ করিয়া, জলে ডুবিয়া, অগ্নি-ক্রীড়া করিয়া, অর্থাৎ হঠ-পূর্ব্বক নানা শারীরিক ক্লেশ সহ্য করিয়া, যাঁহার জন্য জগতে

আসিয়াছে, জীব তাঁহাকেই দেখিতে ব্যস্ত হয়। যেমন কাঁটা দিয়া পদবিদ্ধ কাঁটাকে নিষ্ক্রান্ত করিতে হয়, সেইরূপ এই চড়ক-পূজার দুঃসহ তপস্তাপ সহ্য করিলে সংসারের ত্রিতাপ-জ্বালা বিনষ্ট হয়, এই উদ্দেশে মহাবিষুব সংক্রান্তিতে দেবাদি-দেব মহাদেবের আরাধনা ও মহামহোৎসব হইয়া থাকে। এই উৎসবে ঢাকের প্রচণ্ড ভৈরব নিনাদে নিদ্রিত সংসার জাগ্রত হইয়া উঠে। দিগ্‌দিগন্তে শৈবোৎসবের আনন্দ-লহরী জয়বিজয়-তরঙ্গে প্রবাহিত হইয়া যায়। বৈশাখের দারুণ তাপে যখন মনুষ্য-মণ্ডল উদ্বেজিত হইয়া উঠে, মার্ত্তণ্ড যখন প্রচণ্ড বেগে রৌদ্রের সমোষ্ণধারা বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, যখন তাপের তীব্রতায় ভূতল, রসাতল, ও নভঃস্থল নিতান্ত শুখাইয়া উঠে, জীবের ক্লেশের সীমা থাকে না, সেই সময়ে আর্য্য ঋষিগণ শীতলাম্বু-বাহিনী ত্রিতাপ-তারিণী গঙ্গাদেবীর আরাধনার ব্যবস্থা দিয়াছেন। শীতকালে গঙ্গা-পূজার বিধি হয় নাই। ত্রিতাপজ্বালায় কাতর হইলে প্রাণ মন শীতল করিবার জন্য ত্রিজগন্মাতা, সুখদা, মোক্ষদা, গঙ্গাই মকর-বাহনে জীব-নিস্তারণে দর্শন দিয়া থাকেন। গঙ্গার ন্যায় ভক্তবৎসলা আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না; ভগী-রথের ব্রহ্মশাপানলে বিদগ্ধীভূত ভস্মকায়াকারিত পিতৃ-পুরুষগণকে অমৃত-বারিতে সুশীতল ও বৈকুণ্ঠ-বাসী করিবার জন্য তাপত্রয়-বিনাশিনী মা ব্রহ্মলোক ছাড়িয়া ধরাধামে অবতীর্ণ হইলেন। শিবের ভক্ত শৈব, বিষ্ণুর ভক্ত বৈষ্ণব, এইরূপ নামে প্রসিদ্ধ হইয়া থাকে; কিন্তু দ্রবময়ী মা আপনার নামে ভক্তের গৌরব-বৃদ্ধি করেন নাই, বরং ভক্তের গৌরব

বাড়াইবার জন্য ভক্তের নামে আপনি নাম ধারণ করিয়াছেন। ভগীরথের নাম গাঙ্গেয় না দিয়া ভক্ত ভগীরথের নামে আপনার নাম ভাগীরথী বলিয়া প্রসিদ্ধ করিয়াছেন। মা ছেলের নামেই, যথা 'হরির মা', 'গোপালের মা', এইরূপে প্রসিদ্ধ হইতে ভালবাসেন। জন্মজন্মান্তরের ত্রিতাপজ্বালায় দগ্ধ হইয়া আসিয়াছে জীব, তাই নিদারুণ তাপে তপ্ত বৈশাখে সুশীতল হইবার জন্য, মনঃপ্রাণ জুড়াইবার জন্য, ভগবতী ভাগীরথীর মহাপূজার মহামহোৎসব। মা গঙ্গা সুশীতলতার নির্ঝরিণী। তাপত্রয়ে কাতর জীব! তাঁহার চরণে শরণাগত হও। বৈশাখে গঙ্গার পূজা হইয়াগেল। জৈষ্ঠ-মাসে স্নান-সুখের মহামহোৎসব—জ্যৈষ্ঠে জগন্নাথের স্নান-যাত্রা। জগন্নাথ আত্মাস্বরূপ, এই মাসে কলসে কলসে তাঁহার শিরে অমৃত কুণ্ডের জলধারা ঢালিতে হয়; জন্মজন্মান্তরের নানা আবরণ-বিক্ষেপের মলিনতায়, আবর্জ্জনায় আত্মা অব-গুণ্ঠিত ছিলেন; আজ শুভলগ্নে, শুভক্ষণে তাঁহাকে বিধৌত ও পরিমার্জ্জিত করিয়া লইতে হইবে; ময়লামাটি ধুইয়া গেলেই আত্মার স্বচ্ছ, সুন্দর তেজ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। জগন্নাথের স্নানজল-পানে মনঃপ্রাণ জুড়াইয়া যায়, আশা-পিপাসা বিনিবৃত্ত হয়। এই স্নানযাত্রার উৎসব হইয়া গেলেই জগন্নাথ-দেবের রথযাত্রা। স্নানের জলে ধৌত হইয়া জ্ঞানের চক্ষু নির্ম্মল হইয়াছে যাঁহার, তিনিই জগন্নাথের রথযাত্রারূপ মহামহোৎসবে আনন্দিত হইয়া থাকেন। জন্মজন্মান্তরের জ্বালা-যন্ত্রণা নিবারণ করিবার জন্য রথস্থ জগন্নাথ দেবকে দর্শন করাই একমাত্র উপায়।

"রথস্থং বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।"

জগন্নাথ দেবকে শাস্ত্রে বামনরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। কঠোপনিষদে উক্ত হইয়াছে—

"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা।
সদা জনানাং হৃদয়ে নিবিষ্টঃ॥"

অঙ্গুষ্ঠমাত্র এই অন্তরাত্মা-পুরুষ সকল জনের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছেন। যতদিন পর্য্যন্ত অন্তর্দৃষ্টি জীবের না হয়, চিত্ত যতদিন পর্য্যন্ত বহির্বিষয়-ব্যাপারাভিমুখী থাকে, ততদিন বাহ্য পূজার নিতান্ত প্রয়োজন, ততদিন বাহিরের রথে আত্মার স্বরূপ দর্শন করিতে হয়। স্নানের—জ্ঞানের জলে ধুইয়া যাঁহার চক্ষু নির্ম্মল হইয়াছে, তিনিই এই শরীররূপ রথেই ভগবান্‌কে দর্শন করিয়া থাকেন। শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে—

"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃপ্রগ্রহমেবচ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ॥
যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্ব ইব সারথেঃ॥
যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ॥
যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাশুচিঃ।
ন স তৎপদমাপ্নোতি সংসারঞ্চাধিগচ্ছতি॥
যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সঃ মনস্কঃ সদাশুচিঃ।
স তু তৎপদমাপ্নোতি যস্মাদ্‌ভূয়ো ন জায়তে॥

বিজ্ঞান সারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্ নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥

আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ বলিয়া বিদিত হও, বুদ্ধিকে সারথি এবং মনকে প্রগ্রহস্বরূপ অবগত হও। ইন্দ্রিয়গণ অশ্ব, বিষয়-ব্যূহ তাহাদের চলিবার পথ, আর ইন্দ্রিয়-মনোযুক্ত যে আত্মা (জীব), সেই ভোক্তা, মনীষিগণ এই প্রকার বলিয়া থাকেন। যে সকল ব্যক্তি অবিজ্ঞানবান্, অর্থাৎ অনিপুণ বা অবিবেকী, আর সর্ব্বদা অযুক্তমনা বা অসমাহিতচিত্ত, তাহাদের ইন্দ্রিয় সকল সারথির দুষ্ট অশ্বের ন্যায় বশীভূত থাকে না। যে ব্যক্তি বিজ্ঞানবান্, অর্থাৎ সুনিপুণ বিবেকবান্, সর্ব্বদা যুক্তচিত্ত বা সংযতমনা, সারথির সুশিক্ষিত অশ্বের ন্যায়, তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল সর্ব্বদা বশীভূত থাকে। যে ব্যক্তি অবিবেকী ও অবিজ্ঞানবান্, অবশচিত্ত, ও সর্ব্বদা অশুচি, সে সেই পরমপদ প্রাপ্ত হয় না, সংসারের দিকেই তাহার গতি হইয়া থাকে, অর্থাৎ বারংবার জন্মমরণরূপ যন্ত্রণায় নির্যাতিত হইতে থাকে। যিনি বিজ্ঞানবান্, স্ববশ, ও সদা শুদ্ধচিত্ত, তিনি সেই অচ্যুত ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহাকে আর পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। বিজ্ঞানই যাঁহার সারথি, মন যাঁহার প্রগ্রহ, অর্থাৎ যিনি বিবেকী, শুদ্ধ সমাহিতচিত্ত, তিনি সংসারের জ্বালাযন্ত্রণাময় সীমা অতিক্রম করিয়া পরমাত্মার পরমপদ লাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা ভাগ্যবান্, এই রথযাত্রার মহামহোৎসবে তাঁহাদিগেরই চিরমনোরথ পরিপূর্ণ হইয়া থাকে।

অস্তি, ভাতি, প্রীতি এই ত্রিবিধরূপে আত্মা অনুভূত

হইয়া থাকেন, ইহা শ্রুতি-সিদ্ধান্ত। জ্ঞানের স্থানে সমুজ্জ্বল হইয়া দিব্যকান্তি কলেবরে রথে প্রকাশিত হইলেন যিনি, আজ তিনিই যে প্রীতির সামগ্রী, আজ তিনিই যে অঞ্চলের নিধি, আজ তিনিই যে সোহাগের সম্পত্তি, কাঙ্গালের জীবন-সর্ব্বস্ব, তাই দেখাইবার জন্য সেই আত্মাস্বরূপ মা যশোদার কোলে খেলিতে আসিলেন। সাধের সামগ্রীকে বুকে রাখিয়া তাপিত প্রাণ জুড়াইবার জন্য জন্মাষ্টমীর নন্দোৎসব, ভক্তগণের মহামহোৎসব। আজ কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ণ বিকাশে জীবের ত্রিপাতজ্বালা মিটিয়া যায়। বর্ষার বারি-ধারায় প্রকৃতির সমস্ত ময়লামাটি ধুইয়া গেলে তরু, লতা, গুল্ম প্রভৃতি সমস্ত যেন সুসজ্জিত হইয়া উৎসবে প্রবৃত্ত হইবার জন্য প্রস্তুত হয়; সমস্ত বৃক্ষলতা কত পত্রপল্লব-স্তবক লইয়া কাহাকে যেন দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব ও উপহারের গুরুভারে অবনতমস্তক হয়; শারদীয় নির্ম্মল নভোমণ্ডলে উজ্জ্বল নিশাকর ও তারকা-স্তবক ফুট্ ফুট্ করিয়া ফুটিয়া চারুচন্দ্রিকা বিতরণ করে; বনের মাঝে কুসুমরাশি হাসিহাসি মুখে সুরভির ছটা বিলাইতে থাকে; নিশির শিশির-রাশির বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি হইয়া তৃণমণ্ডলময় ভূমিতল সমুজ্জ্বল করিয়া তুলে। আজ দশভুজা মাকে দেখিবার জন্য সমস্ত লোক হাসিতে ভাসিতে থাকে। বালগোপালের কমনীয় কান্তি দর্শন করিয়া শরৎকালে প্রকৃতির বিশুদ্ধ মাতৃভাবের রাজ্যে জীব প্রবেশ করিয়া থাকে। সাধন-সিদ্ধির সুগম পথ দেখাইবার জন্যই মা আমার মহিষমর্দ্দিনীরূপে দশ হস্তে দশ দিক অধিকার করিয়া ভক্ত-হৃদয়ে দেখা দিলেন। অভিমানরূপ অতি দুর্জ্জয় দৈত্যকে সংহার

না করিলে মুক্তিলাভ অসম্ভব। 'অহং মমেতি'-রূপ অভিমানই জীবকে জ্ঞান-রাজ্যে প্রবেশ করিতে দেয় না। দশানন রাবণকে বধ করিবার সময়েও ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র ঐ মহা-শক্তির আরাধনা করিয়াছিলেন, সহস্রদল কমলে তাঁহার চরণকমল পূজা করিয়াছিলেন। যাঁহার সহস্রদলে মায়ের পদকমলতল বিরাজ করে, তিনিই অহঙ্কার-অভিমানরূপ মহা-দৈত্যদলকে সংহার করিতে সমর্থ হন। এই শরতের মহা-মহোৎসবে সমস্ত ভারতবর্ষে বিজয়-ভেরী বাজিয়া উঠে। এ উৎসবে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার হৃদয়ের অন্তস্তল ভেদ করিয়া আনন্দের লহরী-লীলা খেলিতে থাকে। নূতন বসন-ভূষণে সকলেই যেন নূতন সজ্জা ধারণ করে, প্রত্যেক জীব নবজীবন লাভ করে। এই শরৎ-শশীর হাসিখুসিময় রাজ্যাধিকারে দুর্গোৎসব হইয়া গেল। আবার ঘোর অমাবস্যার অন্ধকারে জীব যখন অন্ধীভূত, নিদ্রার নিবিড়তায় জীব যখন আত্মহারা হইয়া যায়, তখন সেই প্রসুপ্ত জীবকে জাগ্রত ও প্রবুদ্ধ করি-বার জন্যই ভক্তজন-পালিকা, করালাকালিকা, মুণ্ডমালিকা মূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে। ভারতের ঘনঘোরঅন্ধ তামসাচ্ছন্ন দুর্দ্দিনে হত-চেতন ভারতকে ভীম ভৈরব নিনাদে জাগ্রত করিবার জন্যই সমর-তরঙ্গে রণরঙ্গে মা নৃত্যকালী নাচিয়া থাকেন। নিদ্রিত ভারতবর্ষ! নিশ্চেষ্ট ভারতবর্ষ! নীরব নিস্পন্দ ভারতবর্ষ! যদি সিদ্ধিসাধন করিতে চাও, যদি চিরদিনের মনোভীষ্ট সাধন করিতে চাও, এই অন্ধকারে কেহ দেখিবে না, ধীরে ধীরে মহাশ্মশানের মধ্যভূমিতে, ভারতীয় বীরবর্গের শবাসনে উপবিষ্ট হও, মহাশক্তির মহামন্ত্র

জপ কর, ভারতীয় ভাবের মৃতদেহে নবজীবনের সঞ্চার হইবে, অচেতন ভারতে চেতনা-সঞ্চার করিয়া করালবদনা লোলরসনা নর-কপাল-বিভূষণা দিগ্‌বসনা মায়ের সঙ্গে একবার মহামহোৎসবে নৃত্য করিয়া লও। ভক্তগণ! মায়ের এই করালমূর্ত্তি ভক্তগণের শত্রু-সংহারার্থ জানিবে। ভক্ত-সাধকের জন্য মা বরাভয়দাত্রী। করালদ্রংষ্ট্রা সিংহী যেমন অন্য জন্তুর পক্ষে সদ্য সংহারমূর্ত্তি, কিন্তু নিজের শিশুর পক্ষে সেই সিংহীই স্নেহময়ী জননী। নরসিংহমূর্ত্তি হিরণ্য-কশিপুর পক্ষেই করাল কৃতান্ত, কিন্তু ভক্ত প্রহ্লাদের নিকট তিনি ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু, দয়ার অগাধ জলধি। অন্ধকারে মা শ্যামারূপে স্বয়ং সাজিলেন বটে, কিন্তু মায়ের সমাগমে দীপমালিকার দিব্য ছটায় সমস্ত দেশ আলোকাকীর্ণ হইয়া উঠিল। মায়ের আবির্ভাবে সমস্ত আঁধার দূর হইল, মলিন মুখে হাসি ফুটিল, মায়ের পূজার মহামহোৎসবে সমস্ত লোক জাগ্রত হইয়া রহিল, আর ঘুমাইল না। কালনিশি ফুরাইল, কালনিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, উৎসবে—আনন্দে ধরা ঢলিয়া পড়িল। তাহার পরেই মা মহাষ্টমীতে আবার সিংহবাহনে হেমকান্তি কলেবরে জগদ্ধাত্রীরূপে দর্শন দিয়া থাকেন। এক উৎসবের নেশা ছুটিতে না ছুটিতে ভারত আবার উৎ-সবে মাতিয়া উঠিল। পাছে মায়ের সাধক-সন্তানগণ কাম ক্রোধাদি দুর্জ্জয় দৈত্যদলের প্রতাপে বিমর্দ্দিত ও হত-চেতন হইয়া পড়ে, সেই জন্য দুর্ব্বলের বলবিধাতা সংযতচেতা মহসেনা-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পার্ব্বতী-নন্দন কার্ত্তিকেয়ের আবির্ভাব হইয়া থাকে। তাঁহার মুখচন্দ্র-দর্শনে অপুত্র-

বতীর পুন্নাম নরক হইতে উদ্ধার হইয়া থাকে, জীবের আর যম-যাতনা ভোগ করিতে হয় না। কার্ত্তিকেয়-সমাগমে কৌমার-ব্রত-ধারণে যখন জীবে জিতেন্দ্রিয়তা শক্তি জন্মে, যখন ভোগবিলাস-শয্যায় শয়ন করিয়াও জীব মোহ-নিদ্রায় অভিভূত হয় না, তখনই পরমাত্মার বড় সাধের খেলা রাস-লীলার মহামহোৎসব। বিষয়-ভোগে আসক্তি সত্ত্বে এ লীলা-রহস্য লোকের হৃদ্গত হয় না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চিদ্ঘনানন্দ বিগ্রহ, এবং সাধকের আরাধিকা শক্তি প্রেম-ঘনাকারাকারিত হইয়া শ্রীরাধিকারূপে প্রেমলক্ষণা ভক্তি-শক্তিরূপিণী গোপিকাগণ সহ এই রাসোৎসবে প্রবৃত্ত হইয়া-ছিলেন, অনাদ্যা প্রকৃতি চৈতন্য সহ অভিন্নভাবে মিলিত হইয়াছিলেন। আরাধিকা সাধিকা শক্তিই রাধিকারূপে উদ্ভাসিত হইয়া রাসরসিক রাসেশ্বর যোগেশ্বরের রসময় তরঙ্গে ডুবিয়া গিয়াছিলেন। এই রাসোৎসবে যাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছে, তিনি ভগবানের প্রেম-সুধারস পানে কৃতার্থ হইয়া গিয়াছেন। এই মিলন যাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়াছে, তাঁহার জড়কণ্ঠ ভগবল্লীলা-গাথা-গানে ধন্য হইয়া যায়, তাই বাগ্বাদিনী আসিয়া বীণা-পুস্তক-রঞ্জিত হস্তে বসন্তোৎসবের উদ্বোধন করিয়া থাকেন। পরাবিদ্যা বীণায় ঝঙ্কার দিয়া যখন ত্রিজগদুন্মাদনকারী তান ধরিয়া থাকেন, তখন ভরা বসন্তের মলয় মারুত-হিল্লোলে সাধক-হৃদয়ে প্রেমোল্লাস-তরঙ্গ উথ-লিয়া উঠে। সেই সময়েই দোলযাত্রার মহামহোৎসব। এখানে প্রকৃতি-পুরুষের অভিন্ন অধিকারে অপূর্ব্ব সম্মিলন। সখীগণ প্রাণের সখাকে হৃদয়-দোলায় দোলাইয়া কতই

আমোদ করিয়া থাকে। সিদ্ধ-সাধক সকলে মিলিয়া ফল্গু-চূর্ণ লইয়া ভগবানের দিব্য অঙ্গে উপহার দিতেছেন, আর মনঃপ্রাণে প্রেমের স্বর মিলাইয়া বলিতেছেন—

"ফল্গুস্ত্বং সর্ব্বদেবানাং চিরভার্য্যাসি সর্ব্বদা।
হরেঃপ্রীতিস্ত্বয়া কার্য্যা নমস্তেঽরুণচেতসে॥
দামোদর হৃষিকেশ লক্ষ্মীকান্ত জগৎপতে।
গোবিন্দ দোলয়ামি ত্বাং সুপ্রীতো ভব কেশব॥
নারায়ণং মহাদেবং বৈকুণ্ঠং পুরুষোত্তমম্।
লীলয়া খেলয়া দেবং গোপীভিঃ পরিবারিতম্॥
গোপীভির্বেষ্টিতো নাথো খেলয়েৎ পরমেশ্বরঃ।
লোকযাত্রাহিতার্থায় ফল্গুদানং করোম্যহম্॥
ফল্গুং গৃহাণ দেবেশ! ক্রীড়াকৌতুকমঙ্গলৈঃ।
শোভার্থং তে শরীরস্য স্বেচ্ছয়া চাত্র দোলয়ে॥
পুরা দেবাসুরৈর্যুদ্ধে ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং স্বয়ং।
অসুরাণাং বিনাশায় গৃহ্ণ ফল্গুং সুরোত্তম॥"

সকল উৎসবের পর এই শেষ উৎসবে পরমাত্মাকে সাধের সামগ্রী করিয়া লইয়াছেন। ভগবান্‌কে খেলার সহচর করিয়াও তাঁহার মর্য্যাদা বিস্মৃত হন নাই। আজ সঙ্গের সাথীকে চিরদিনের সঙ্গী রাখিবার জন্য বলিতেছেন, প্রভো!

"কল্যাণং কুরু মে দেব গৃহাণ ফল্গুমুত্তমং।
ত্বৎপ্রসাদাৎ জগন্নাথ তব পূজাং করোম্যহং॥
জগন্নাথাচ্যুতানন্ত জগদানন্দবর্দ্ধকঃ।
ফল্গুক্রীড়াভিরেতাভিস্ত্রাহি মাং ভবসাগরাৎ॥"

প্রাণের সখার সহিত খেলিতে খেলিতে উৎসবে উন্মত্ত হইয়া ভগবানের জয়গাথা গাহিতে লাগিলেন—

"জয় কৃষ্ণ জগন্নাথ জয় চানুরসূদন।
ফল্গুক্রীড়াভিরেতাভিস্ত্রাহি মাং ভবসাগরাৎ॥
জয় গোপীমুখাম্ভোজ-মধুপানমধুব্রত।
ফল্গুক্রীড়াভিরেতাভিস্ত্রাহি মাং ভবসাগরাৎ॥
জয় দেব দিনেশান রজনীশবিলোচন।
নিরাকার নিরাধাস নির্গুণ ত্রাহি মাং প্রভো॥"

সাধক সিদ্ধি-সাধনের উচ্চতর মঞ্চে উঠিয়া দোল-মঞ্চের এই রাগানুগ প্রেমবিলাসের মোহন ছবি দর্শন করিয়া থাকেন। ভারতের সমস্ত উৎসবই আনন্দস্বরূপের সহিত পরমানন্দ-সম্ভোগ মাত্র।

শুশ্রূষু সভ্য মহোদয়গণ! যে ভারতে এত উৎসবের তরঙ্গ-মালা, সেখানে আজিকার সভার উৎসবকে একটী অভিনব ব্যাপার বলিয়া বোধ হইবে কেন? যত উৎসবের কথা বলিলাম, সকল উৎসবেই ধর্ম্ম কর্ম্ম, যোগ যাগ, ধ্যান জ্ঞান, বিধি নিষেধ আদির ব্যবস্থা আছে। এ সকল উৎ-সবই সাধকগণের জন্য—সকল উৎসবেই শক্তি সামর্থ্যের প্রয়োজন। কলিযুগে নিতান্ত নিকৃষ্টাধিকারী আমরা, শক্তি-হীন জীব আমরা, যাহাতে এতাবৎ উৎসবগুলির উপযুক্ত অধিকারী হইতে পারি, তাহাই শিক্ষা করিবার জন্য, ভগ-বানের নিকট সামর্থ্য ভিক্ষা করিবার জন্য হরিসভা, ধর্ম্মসভা আদির সূচনা হইয়াছে। যে শুভ দিনে এই শুভানুষ্ঠানের শুভ সূচনা হইয়াছে, বর্ষের আজ সেই দিন উপস্থিত। যাঁহার কৃপায় মূকের মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হয়, যাঁহার কৃপায় পঙ্গু গিরি উল্লঙ্ঘন করে, মন্দাধিকারী আমরা, আমাদের অসাধ্য

সাধনের জন্য তাঁহারই লোকালোক-বন্দিত চরণারবিন্দ-বন্দনে আজ উপস্থিত হইয়াছি। নারদাদি দেব দেবর্ষি-গণও যে নামগাথা কীর্ত্তন করিয়া ত্রিভুবন-নিবাসীকে উন্মা-দিত করিয়া থাকেন, যোগীন্দ্র, মুনীন্দ্র পুরুষগণ যে নাম-সুধা-পান করিয়া মহাযোগ-নিদ্রায় অচেতন হইয়া পড়েন, আজ সেই তারকব্রহ্ম নামকে অবলম্বন করিয়া আমরা সকলে এই উৎসবে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এমন দিন অপেক্ষা আমাদের সৌভাগ্যের দিন আর কবে হইবে? তাই আজ মনে বড় আহ্লাদ হইয়াছে, তাই আজ উৎসব করিতেছি। পাতক, মহাপাতক, অতিপাতক আদি যে পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবানের স্মরণমাত্রই বিদূরিত হইয়া যায়, আজ সেই কৃপা-কল্পতরু ভগবানের গুণ-গানে কৃতার্থ হইবার জন্য, আজ তাঁহার মহি-মার কথা শুনিয়া সার্থকজীবন হইবার জন্য, আজ ভক্তগণ সঙ্গে তাঁহার নাম-সুধা-রস-পানে প্রমত্ত ও প্রেমে বিভোর হইয়া মনঃপ্রাণকে শীতল করিবার জন্য, এই উৎসবের অব-তারণা। সাধুহৃদয়গণ! এই উৎসবের শুভদিনে সকলে প্রাণ ভরিয়া প্রাণ-সখার চরণ চুম্বন করিয়া লউন, স্বর্গীয় পিতৃপুরুষগণের আশীর্ব্বাদ চাহিয়া লউন, আত্মীয় স্বজন, শত্রুমিত্র সকলে আজ সম্মিলিত হইয়া এক তানে, এক প্রাণে **হরি হরি** ধ্বনি করিয়া জীবন সফল করিয়া লউন। ভগবন্নামের জয় জয় ধ্বনিতে জগৎ পরিপূর্ণ হউক, প্রত্যেক গৃহ উৎসবময় হউক, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার প্রত্যেক হৃদয় ভগবানের চরণ-চিহ্নে অঙ্কিত হউক।

হে ভক্তজনমনোহারিন্! তুমি এই উৎসবে অধিষ্ঠিত

হইয়া সকলের প্রাণ মনে নৃত্য করিতে থাক, আমরা তোমার কৃপায় কৃতার্থ হইয়া যাই। পতিতপাবন! তুমি আমাদিগের ন্যায় পতিত ভারতবাসিগণকে উদ্ধার কর, তোমাকে বারবার নমস্কার।

ওঁ হরিঃ ওঁ।

অন্ধের যষ্টি। *

যস্য স্মরণমাত্রেণ ন মোহো নচ দুর্গতিঃ।
ন রোগো নচ দুঃখানি তমনন্তং নমাম্যহম্॥

সভ্যমহোদয়গণ! মনের বিলাস-ভুমি সংসার। সংসারের সুখ-স্বচ্ছন্দতা উপভোগ করিবার জন্য মনের প্রেরণায় চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা, ত্বক্, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়-দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে। বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহায়তায় ক্ষিত্যপ্‌তেজমরুদ্ব্যোম এই পঞ্চভুত প্রসূত। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, পঞ্চতন্মাত্রকে অবলম্বন করিয়া মন সংসাররূপ লীলাভুমিতে—বিলাসভুমিতে বিচরণ করিয়া থাকে। এই বিশাল ভোগ-বিতান মধ্যে মনের কখনও তৃপ্তিলাভ হয় কি না, তাহা এ পর্য্যন্ত কেহই বিদিত হয়েন নাই। এই ভোগ-ভুমি সৎ কি অসৎ, মিথ্যা কি সত্য, অথবা মায়া-মরীচিকাময়ী মরুভুমি, তাহার বিচার আজ করিব না। কায়া মায়া হউক, বা ছায়া হউক, তাহা মায়াতীত পুরুষ ব্যতীত কেহই বলিতে পারেন না। আমরা মায়িক জগতের ক্ষুদ্র জীব, মায়াতীত রাজ্যের সমাচার উদ্ঘোষণ করিবার সামর্থ্য

* কাশী ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম-প্রচারিণী সভার বার্ষিক উৎসব-কালে এই বক্তৃতা হইয়াছিল। এই বক্তৃতা শ্রবণার্থ বহুতর শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, পণ্ডিত ও অপণ্ডিত, স্ত্রী ও পুরুষ আগ্রহপূর্ণ হৃদয়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বক্তৃতা-শ্রবণে অনেক বিপথগামী সুপথে আসিয়াছেন, ও অনেক পাষাণ-হৃদয়ের নেত্রে অশ্রু-ধারা বহিয়াছিল। প্রকাশক।

আমাদিগের নাই। আমরা যেখানকার, সেইখানকার কথাই আমাদিগের আলোচ্য। আমরা মনের অগম্য স্থানের কথা বলিতে সমর্থ নহি। মন যতটুকু কার্য্যক্ষেত্রে রাজ্য করিয়া থাকে, আমরা সেই রাজ্যেরই সমাচার আলোচনা করিব। মনের মানুষ যিনি, মনের ভিতরে বসিয়া মনোময় রাজ্য পরিচালন করেন যিনি, মনের ভিতরে বাহিরে বিদ্যমান থাকিয়া এই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মহামায়া বিস্তার করেন যিনি, তাঁহারই প্রসাদপ্রার্থী হইয়া, তাঁহার এই অন্ধতাম-সাচ্ছন্ন জগতে অন্ধীভূত হইয়া, যাহা স্বপ্নবৎ দেখি বা বুঝি, তাহাই শ্রোতৃবর্গের নিকট অদ্য নিবেদন করিব।

দেখিতে মনের বড় সাধ, দেখিলে যত মনের তৃপ্তি হয়, শ্রবণাদির দ্বারা তত হয় না। বস্তুতঃ দেখিতে পাইলে কেহ শুনিতে চায় না। চক্ষুর সঙ্গে মনের যত নিকট আত্মীয়তা, যত প্রিয়ভাব, এমন অন্য ইন্দ্রিয়ের সহিত নাই। দেখিবার সাধ মানবকে যত উন্মাদিত করে, শুনিবার ইচ্ছা তত বলী-য়সী হয় না। অদ্ভুত ও উপাদেয় যত কিছু বিষয় মানবের শ্রুতিগোচর হইবে, মন সেই গুলিকে চক্ষুর গোচর করিতে অতিশয় আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। যাঁহার দেখিবার শক্তি আছে, যে বস্তুকে যেরূপে দেখিতে হয়, সেইরূপ যাঁহার দেখি-বার শক্তি আছে, তিনিই জগতে ধন্য। দেখিবার সাধ থাকিতে যাঁহার দেখা ঘটে না, দেখিতে গিয়া যিনি দেখিতে পান না, যে বস্তুকে যেরূপে দেখিতে হয়, সেরূপ যিনি দেখিতে জানেন না, তিনি অন্ধ। অন্ধের মনের সাধ মনেই উঠিয়া মনেই মিলাইয়া যায়। যাঁহারা জন্মান্তরীণ মহাপাপে অন্ধ,

তাঁহারা ত কষ্ট পাইয়াই থাকেন ; কিন্তু যাঁহারা চক্ষু থাকিতে অন্ধ, তাঁহাদের দুঃখ রাখিবার আর স্থান নাই। যাঁহারা দেখিবার উপযুক্ত সময়ে দেখেন না, যেখানে যাহা দেখিতে হয়, সেখানে তাহা দেখেন না, চক্ষুকে দেখিবার উপযুক্ত করিয়া যাঁহারা দেখেন না, দেখিবার জিনিষ দেখাইয়া দিলেও যাঁহারা দেখিতে চান না, দেখার মত দেখিবার সময় যাঁহারা চক্ষু নিমীলিত করিয়া থাকেন, সেই মহামহান্ধ জীবের ক্লেশের শেষ ইহপরলোকে দেখিতে পাওয়া যায় না। চক্ষু থাকিলেই যে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নহে। পদার্থের রূপ-রশ্মি চক্ষুর গোলকে কেন্দ্রীভূত না হইলে পদার্থের সত্তা মনুষ্যের গোচরীভূত হয় না। পদার্থের যেমন তেমন একটা আকার দর্শন করা, আর তাহার স্বরূপ-সত্তা অবলোকন করা, দুটী বিভিন্নজাতীয়। যাঁহার চক্ষু আছে এবং যিনি দেখিতে জানেন, যিনি দেখিতে পারেন এবং যিনি দেখিয়া থাকেন, তিনিই চক্ষুষ্মান্। যাঁহার চক্ষু নাই, অথবা যাঁহার চক্ষু থাকিয়াও যিনি দেখিবার মত দেখিতে শেখেন নাই, তিনিই অন্ধ। যিনি চক্ষুষ্মান্, তাঁহার সম্মুখে অনন্ত প্রকাশ-মালা ; আর যিনি অন্ধ, তাঁহার সম্মুখে ঘনঘোরনিবিড় অন্ধকার। যাঁহারা চক্ষুষ্মান্, তাঁহারা সকল কথা বুঝাইয়া দিলেও, সকল বিষয় দেখাইয়া দিতে চেষ্টা করিলেও, অন্ধ তাহা বুঝিতেও পারে না ও দেখিতেও পায় না। আমরা অন্ধ, তাই চক্ষুষ্মান্‌দিগের সকল কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না, ও বুঝাইতেও জানি না। অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে পড়িয়া কি দেখিতে

হয়, কি বুঝিতে হয়, তাহাও বুঝিতে পারি না। অন্ধ আমরা, তাই চিরদিন চক্ষুষ্মান্‌দিগের কৃপাপাত্র। তাঁহারা যে চক্ষে যাহা দেখিয়া থাকেন, তাহা আমরা দেখিতে না পাইলেও দেখিবার আকাঙ্ক্ষা কিন্তু আমাদিগের বিনিবৃত্ত হয় নাই। কতকাল ধরিয়া লক্ষ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া অন্ধবৎ আমরা বিচরণ করিতেছি। কখনও কিছু দেখি নাই সত্য; কিন্তু কি জানি, কি দেখিবার জন্য মন কেন সদা কাঁদিয়া উঠে। লোকে যাহা কখনও দেখে নাই, তাহা যদি কখনও অকস্মাৎ দর্শন-গোচরও হয়, তবু তাহাকে চিনিতে বা জানিতে পারে না। আমি যাঁহার কথা শুনিয়া, যাঁহার অশেষ গুণানুবাদ অবগত হইয়া, যাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছি, পথের মধ্যে হঠাৎ হয়ত তিনি আমার সম্মুখে আসিলেন, কিন্তু তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম কৈ? সাধের সামগ্রী দেখিয়া সাধ মিটিল কৈ? অচিন্ত্য যিনি, তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম না বলিয়া পাইয়াও পাইলাম না, দেখিয়াও রাখিতে পারিলাম না। দেখা দিলেই বা দেখিতে পারি কৈ? দেখিতে পাইলেই বা রাখিতে পারি কৈ? ভগবান্ যখন নিজ শরণাগত পরমভক্ত অর্জ্জুনকে দেব-দানব-মানবের অগোচর, তপ, জপ, পূজা, পাঠের অগম্য, ধ্যান, ধারণা, সমাধির অবিষয়ীভূত, নিজ ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদর বিরাট মূর্ত্তি দেখাইতে গেলেন, অর্জ্জুন তাহা চর্ম্ম চক্ষে দেখিতে পাইলেন কৈ? তাই ভক্তের সখা ভাল করিয়া দেখা দিবার জন্য বলিলেন—

"দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্॥"

আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু দান করিতেছি, তুমি আমার যোগৈশ্বর্য্য দর্শন করিয়া লও। ভগবৎ-কৃপায় অর্জ্জুন দেখিতে পাইলেন বটে, কিন্তু দেখিতে পারিলেন কৈ? ভগবানের অনন্ত উদ্ভাসিত বিরাট মুর্ত্তি-মণ্ডল দর্শন করিয়া অর্জ্জুন চকিত চমকিত হইয়া অমনি বলিয়া উঠিলেন—

"দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো।"

হে বিভো! তোমার এই বিরাট মুর্ত্তি দর্শন করিয়া আমার অন্তরাত্মা বিচলিত হইয়াছে, আমি কোন ক্রমেই ধৈর্য্য ও শান্তি অবলম্বন করিতে পারিতেছি না।

"অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোস্মি দৃষ্ট্বা ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেবরূপং প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥"

হে দেবেশ! তোমার এই অদৃষ্টচর অপূর্ব্ব রূপ দর্শন করিয়া আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি বটে, কিন্তু ভয়ে প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, হে জগন্নিবাস! তোমার সেই মনোহর পূর্ব্ব (কৃষ্ণ) রূপ দেখাইয়া আমার প্রতি প্রসন্নতা বিস্তার কর। তাই বলি পদার্থের স্বরূপ-সত্তা আমরা দেখিতে সমর্থ নহি।

যাহার যতটুকু দেখিবার অধিকার আছে, সে ততটুকু দেখিতে পায়। চক্ষু থাকিলেই যে সমস্ত দেখা যায়, তাহা নহে; চক্ষুর আয়ত্তীভূত যতটুকু, ততটুকুই চক্ষু দেখিতে পায়। মন যতটুকু দেখিতে চায়, চক্ষু ততটুকু দেখিতে পায় না। মন চায় একবারে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড দেখিতে, চক্ষু তাহার একাংশও দেখিয়া উঠিতে পারে না। মন চায় মনের অগোচর পুরুষকে দেখিতে, চক্ষু ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত স্থানে

উলটি পালটি করিয়া খুঁজিলেও তাহা দেখিতে পায় না। এখন এ সকল দেখার কথা ছাড়িয়া দিই। সোজাসুজি চোখের দেখার কথা লইয়া আলোচনা করি। চক্ষু সকলের সমান নহে। লোকে বলে অন্ধকারে দেখা যায় না। আমি বলি, তুমি আমি দেখিতে না পাইলেও এমন অনেক কীট, পতঙ্গ, বিহঙ্গ আছে, যাহারা অন্ধকারেই ভাল দেখিতে পায়। তোমার আমার চক্ষু, সূর্য্যালোকেই বেশ দেখিতে পায়, কিন্তু অনেকের চক্ষু এমন আছে, যাহা সূর্য্যালোকে অন্ধীভূত হইয়া যায়। অতএব আলোকে দেখা যায়, অন্ধকারে দেখা যায় না, ইহা সমীচীন সিদ্ধান্ত বলিয়া পরিগণিত নহে। পদার্থ নিজ গুণে চক্ষুর গোচরীভূত হয়, অথবা চক্ষুর নিজ গুণে পদার্থের সত্তা প্রতীয়মান হয়, কিম্বা পদার্থ ও চক্ষু উভয়ের সন্নিকর্ষ-সম্বন্ধে পদার্থ-জ্ঞান জন্মে, ইহা এ পর্য্যন্ত বিজ্ঞান-জগতে সুচারুরূপে মীমাংসিত হয় নাই। সুতরাং দর্শনরূপ ক্রিয়া পদার্থ বা চক্ষুর স্বতন্ত্র গুণ সাপেক্ষ, তাহা কে বলিতে পারে? সত্য বটে, পদার্থ না থাকিলে চক্ষু দেখিবে কি? এবং ইহাও সত্য বটে, পদার্থ সত্ত্বেও যদি চক্ষু না থাকিল, তাহা হইলেই বা দেখিবে কি? সাধারণের সিদ্ধান্ত এই যে, পদার্থ আছে বলিয়াই চক্ষু তাহা দেখিতে পায়, কিন্তু বেদান্তের তত্ত্বজ্ঞান-বিচারে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"— "ন কিঞ্চিদাসীৎ" ইত্যাকার ভৈরব হুঙ্কারের তাড়নায় পদার্থের অস্তিত্ব দেখিতে পাই কৈ? একবার ভাবি চক্ষু দ্বারাই দর্শন-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, আবার দেখি, মনের প্রেরণা-স্বরূপ, অর্থাৎ মনের যখন যে অবস্থা থাকে, পদার্থের রূপ

চক্ষু দ্বারা তখন সেইভাবে পরিগৃহীত হইয়া থাকে। মনের স্বচ্ছন্দ অবস্থায় চক্ষু শত্রুকেও মিত্র বলিয়া দেখে, আবার মনের বিকৃত অবস্থায় সেই চক্ষু মিত্রকে শত্রু বলিয়া অবলোকন করে। লোকে দেখার প্রমাণকে প্রবল ও প্রসিদ্ধ বলিয়া মনে করিয়া থাকে, কিন্তু আমি সহজ দেখাকে সুসিদ্ধ বলিয়া মনে করিতে পারি না। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, দেখার মত দেখিতে না জানিলে, সে দেখা অসিদ্ধ। আমি চক্ষুর দ্বারা চিরকাল দেখিয়া আসিয়াছি, সূর্য্য একখানি রৌপ্য থালের মত, কিন্তু জ্যোতিশ্চক্র যে রীতিতে দেখিতে হয়, সেই রীতিতে দেখিলাম, উহা পৃথিবী অপেক্ষাও প্রকাণ্ড। আমি চিরকাল চক্ষুর দ্বারা দেখিয়া আসিয়াছি, আকাশমার্গ শূন্যগর্ভ, কিন্তু অনুবীক্ষণ সাহায্যে দেখিলাম উহা কীটাণুকীটে পরিপূর্ণ, এবং যে রীতিতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্ব অবগত হইতে হয়, সেই পদ্ধতিতে বিচার করিয়া দেখিলাম, উহা অনন্ত শক্তি-রাশির বিচিত্র লীলাভূমি। আমি চিরদিন নির্ম্মল জানিয়া যে জল উপাদেয় বোধে প্রত্যহ পান করিয়া থাকি, তাহাই যন্ত্রযোগে, অর্থাৎ যে রীতিতে সূক্ষ্ম দৃষ্টি করিতে হয়, সেই রীতিতে দেখিলাম, আমার সেই মনঃপূত নির্ম্মল জলে কত কীট ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে। অতএব চক্ষুর দেখা, সমুচিত দেখা বলিয়া সুসিদ্ধ হইল কৈ? বাল্য, কৈশোর, যৌবনে পুস্তকের যে অক্ষরটীকে মানব যে আকারের দেখিয়া থাকে, চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমের পরে চক্ষু সে অক্ষরটীকে সে আকারে দেখিতে পায় না। চসমার সাহায্যে, কাচের বৈচিত্র্য-গুণে সেই অক্ষরগুলি

কখনও দূরে বড়, নিকটে ছোট, কখনও দূরে ছোট, নিকটে বড় দেখায়। অনাবৃত নেত্রে পুস্তকের সমস্ত পত্র গুলি যেন কালি-মাখা হিজিবিজি রেখা বলিয়া বোধ হয়। অতএব চক্ষু বাল্য, কৈশোর, যৌবনে যাহা দেখিল, তাহাই কি অক্ষরের স্বরূপ? অথবা চল্লিশ বৎসরের পরে যেরূপ দেখা গেল, তাহাই তাহাদের স্বরূপ? কিম্বা চসমায় যাহা ভিন্ন ভিন্নরূপ দর্শন হইল, তাহাই তাহাদের স্বরূপ? কিম্বা বৃদ্ধ যাহা হিজি বিজি দেখিলেন, তাহাই তাহাদের স্বরূপ? বালক বা যুবার চক্ষু প্রকৃতিস্থ, অথবা বয়োবৃদ্ধের চক্ষু প্রকৃতিস্থ, এ কথার মীমাংসা হওয়া কঠিন। শারীর প্রকৃতির তরুণ ও উন্নত অবস্থায় পদার্থের স্বরূপ দৃষ্ট হয়, অথবা প্রকৃতির পরিপাকাবস্থায় পদার্থের প্রকৃত রূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে, এ কথার সিদ্ধান্ত করিবে কে? তোমার আমার মনের মত হইলেই আমরা তাহাকে ঠিক ও স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকি সত্য; কিন্তু পদার্থ-তত্ত্ব যে তাহাতে নিরূপিত হইল, এ কথা স্বীকার করিব কিরূপে? শাস্ত্রীয় বিচারে পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও যখন পদ পদার্থের অনেক গণ্ডগোল, তখন পদার্থের তত্ত্ব-নিরূপণ যে সুকঠিন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আবার যখন পদার্থের অস্তিত্ব লইয়া মায়াবাদের বিচার-তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হয়, তখন পদার্থের আকৃতি প্রকৃতির কথা দূরে থাক, তাহার অস্তিত্ব লইয়াই টানাটানি পড়িয়া যায়। সুতরাং চক্ষুর দেখা যে স্বরূপ-দেখা, ইহা আমরা সহসা স্বীকার করিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ প্রকৃতির উৎপত্তি, গতি, ও পরিণতির মহাচক্রের বিঘূর্ণনের

দিকে দৃষ্টিপাত করিলে পদার্থ-তত্ত্বের নিরূপণের আশা একেবারে ঘুচিয়া যায়। পৃথিব্যাদি গ্রহনক্ষত্রের বিঘূর্ণন-গতি অতি দ্রুত হইলেও মনুষ্য তাহার সীমা করিতে সমর্থ হয়; কিন্তু প্রকৃতির যে অদৃশ্য অতি বেগবতী শক্তির দ্বারা পদার্থ-রাশি পরিণতির দিকে ছুটিতেছে, তাহার গতি-সীমা নিরূপণ করা মনুষ্য-বুদ্ধির অনায়ত্ত। পদার্থ মাত্রেরই মুহুর্মুহুঃ পরিণাম হইতেছে। মুহুর্মুহুঃ পদার্থে বিকার ও বৈষম্য আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। অনবরত সংযোগ, বিয়োগ, ক্ষয়, অপচয় আদি অবস্থা-বিকার দ্বারা পদার্থ-পুঞ্জ সর্ব্বদাই নূতন আকার ধারণ করিতেছে। প্রাকৃতিক কোন বস্তুই ক্ষণার্দ্ধাদপি ক্ষণকালও এক অবস্থায় স্থির থাকিতে সমর্থ নহে। পরিণাম-চক্রের প্রবল গতিতে উহা যে নিমেষ মাত্রে কত শত অবস্থা অতিক্রম করিয়া কোন্ স্থানে গিয়া দণ্ডায়মান হয়, তাহা মনুষ্য-বুদ্ধি কখনই কল্পনা করিতেও সমর্থ নয়। মানব চক্ষু দেখিতে দেখিতে, পদার্থ-বিচারে প্রবৃত্ত হইতে না হইতে, পদার্থের কত শত অবস্থা-বিপর্য্যয় হইয়া গেল, তাহা গণনা করিতে পারা যায় না। মানব যে অবস্থাটীকে ধরিয়া বিচার করিবে মনে করিতেছে, তাহা ধরিতে না ধরিতে, অধীর ধারায় বেগ-রাশি সেই অবস্থাকে কোথায় লইয়া গিয়া ফেলিল, মন, বুদ্ধি কখনও তাহার পশ্চাতে গিয়া ধরিতে পারে না। এই যাহা ছিল দেখিলাম, দেখিতে দেখিতে অমনি তাহা অবস্থান্তরিত হইয়াগেল। যাহাই দেখিতে যাই, তাহাই চলিয়া যায়, যাহাকে ধরিতে যাই, সেই পলায়ন করে। সুতরাং কোন বস্তুই দেখিবার মত দেখা মনুষ্যের ভাগ্যে

ঘটিয়া উঠে না। এই যাহা দেখিলাম, তাহাই যদি দেখিতে দেখিতে অন্যরূপ হইয়া গেল, তবে আর দেখা হইল কৈ? অনবরত নূতন অবস্থা আসিয়া পদার্থকে আশ্রয় করিতেছে, সুতরাং দর্শন-শক্তি কোন অবস্থাকেই ভাল করিয়া পরিপাক করিতে পারিতেছে না। অতএব মানবের চক্ষু বাহ্য জগৎকে দেখিতে ইচ্ছা করিলেও অবস্থার অবিরল পরিবর্ত্তনে তাহা আদৌ দেখাই হইতে পারে না। এই যাহাকে দেখিলাম, পরক্ষণে আর তাহাকে পাইলাম না। ভোজ বাজীর ন্যায়, বিদ্যুৎ-বিকাশের ন্যায়, আসিল আর চলিয়া গেল, জন্মিতে না জন্মিতেই মরিয়া গেল, দেখিতে না দেখিতেই লুক্কায়িত হইল। অতএব চক্ষু কোন বস্তুকেই এক অবস্থায় দেখিতে পায় কৈ? এই ত গেল বস্তুশক্তির পরিণামাভিমুখী গতির অনিবার্য্য প্রকৃতি। আবার চক্ষু যে দর্শন-শক্তিকে আশ্রয় করিয়া পদার্থকে দেখিবে, তাহারও অবস্থা ত অচলা নহে। এই শরীরও পদার্থ মধ্যে গণ্য। অবিরাম পরিণামের দিকে ধাবিত হওয়া ইহারও স্বভাব। সুতরাং পূর্ব্বক্ষণে দর্শন করিবার সময় চক্ষুর যে অবস্থা ছিল, পরক্ষণে দর্শন করিবার সময় চক্ষুর অবস্থা স্বতন্ত্র হইয়া গেল। চক্ষু এই মাত্র যাহা দেখিল, পলক পালটিয়া আর তাহা দেখিতে পাইল না। তাহাতে আবার মনের অবস্থাভেদে চক্ষুর দর্শন-শক্তি পরিচালিত হয় বলিয়া, চক্ষু ইতিপূর্ব্বে যে বস্তুকে যে ভাবে দেখিয়াছিল, পরক্ষণে মনের অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুর দর্শন-শক্তির অবস্থাও পরিবর্ত্তিত হইল। সুতরাং পদার্থের প্রতি দৃষ্টিও স্বতন্ত্র

আকার ধারণ করিল। চক্ষু যাহাকে বালককালে সুন্দর দেখিয়াছিল, যৌবনে তাহা বিপরীত দেখিল। বালককালে চক্ষু যাহাকে বিরস বোধ করিয়াছিল, যৌবনে তাহা রস-মাধুর্য্য-পরিপূর্ণ দেখিল। মনের অমার্জ্জিত অবস্থায় চক্ষু যাহাকে না দেখিয়া ক্ষণমাত্রও থাকিতে পারিত না, মনের বিশুদ্ধ অবস্থায় চক্ষু তাহার দিকে আর ফিরিয়াও চাহিল না। প্রকৃতির নানা তরঙ্গে, নানা উচ্ছ্বাসে, সকল বস্তুই কখনও ভাল, কখনও মন্দ বলিয়া চক্ষুর সম্মুখে প্রতীত হইয়া থাকে। প্রকৃতির সম্পূর্ণ শুদ্ধি না হইলে, বস্তুর প্রকৃত প্রতি-বিম্ব চক্ষুর সম্মুখে ভাসিত হয় না। চঞ্চল জলে অখণ্ড চন্দ্র-মণ্ডল যেমন খণ্ড খণ্ড বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ চিত্ত চঞ্চল থাকিতে বস্তুর প্রকৃত ছবি নয়নে প্রতিবিম্বিত হইতে পায় না। এতাবৎ বিচারের দ্বারা নিঃসংশয়রূপে প্রতীত হইতেছে যে, নানা কারণে মানবের চক্ষু বস্তুর যাথার্থ্য-দর্শনে অপটু। যাহা যেরূপ, তাহা যদি তুমি সেইরূপই দেখিতে না পাইলে, তাহা হইলে চক্ষু থাকিতেও তোমাকে চক্ষুষ্মান্ বলিতে পারি না। তুমি যদি একটী বিড়াল দেখিয়া তাহাকে হস্তী মনে কর, তবে তুমি যে দৃষ্টি-শক্তি-বিহীন হও নাই, তাহা কে বলিল? তুমি যদি সৎকে অসৎ, বস্তুকে অবস্তু বলিয়া দেখিলে, তবে তুমি যে অন্ধ নও, তাহা কে স্বীকার করিবে? যে ব্যক্তি স্বরূপ-দর্শনে অসমর্থ, আমি তাহাকেই অন্ধ বলিয়া বিশ্বাস করি। তোমার সহস্র চক্ষু থাকুক না কেন, তুমি যদি যথাযথ বস্তুকে দেখিতে না পাইলে, তাহা হইলে তুমি নিশ্চয়ই অন্ধ। অন্ধের দেখিবার সাধ মিটে না।

স্থিরভাবে একটী বস্তুকে চক্ষু সম্পূর্ণরূপ আয়ত্ত করিতে না পারিলে চক্ষুর দেখিবার সাধ মিটিবে কেন? দেখার তৃপ্তি না হইলে তাহাকে দেখা বলা যায় না। একটী গল্প শুনিয়াছিলাম যে, কোন এক নবাবের নিকট একজন উন্নতচেতা ফকীর আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। নবাব সেই মহাপুরুষের সৌম্যমূর্ত্তি-দর্শনে ও সাধু সম্ভাষণে বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে যথোচিত সম্মান দিবার জন্য আপনার সহিত একত্রে তাঁহার ভোজনের ব্যবস্থা করিলেন। চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, বহুমূল্যের বহুবিধ ভোজ্য সামগ্রী প্রস্তুত হইয়াছে। দীন দরিদ্রের মত একটী ব্যঞ্জন দিয়াই এক থাল ভাত খাইয়াফেলা আমীর নবাবগণের পদ্ধতি নহে। বাবুর্চি (পাচক) নানা সুগন্ধি, সুরস সামগ্রী উত্তমোত্তম পাত্রে সাজাইয়া একটী একটী করিয়া নবাব ও ফকীরের সম্মুখে ধরিতে লাগিল, তাহা হইতে এক গ্রাসের উপযুক্ত সামগ্রী মুখে তুলিয়া দিবামাত্র সেই পাত্রটী পাচক উঠাইয়া লইল, ও আর একটী নূতন সামগ্রীর পাত্র সম্মুখে ধরিয়া দিল, আবার সেইটী হইতে একগ্রাস-উপযোগী সামগ্রী মুখে দিবামাত্র সে পাত্রটীও উঠাইয়া লইল; এইরূপে প্রায় শতাধিক পাত্র ভোক্তাদ্বয়ের সম্মুখে পাচক ধরিল ও একবার খাইতে না খাইতে অমনি তাহা দূরে লইয়া গেল। নবাবের আহারীয় এত প্রকার সামগ্রী প্রস্তুত হইয়াছিল যে, সকলগুলি এক একবার চাখিতে চাখিতেই পেট ভরিয়া গেল। ভোজনান্তে নবাব সাহেব বাহাদুর নবাগত অতিথি ফকীরকে বিনয় সহ জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার সুখপূর্ব্বক আহার

হইয়াছে ত? ফকীর উত্তর করিলেন যে, আমি জন্মের মধ্যে কখনও এরূপ অসুখের আহার করি নাই। তোমার সমস্ত সামগ্রীই অতি সুরভিযুক্ত, সুরস, ও উপাদেয় হইয়াছিল। আমি যে সামগ্রীটীই মুখে দিই, সেইটীই সুখসেব্য জানিয়া যেই আর একবার খাইব মনে করি, অমনি তোমার পাচক তৎক্ষণাৎ সেই পাত্রটী উঠাইয়া লইয়া যায়। সুতরাং সাধ মিটাইয়া, প্রাণ ভরিয়া, কোন সামগ্রীই খাইতে পাই নাই। আমার পেট ভরিয়াছে, ক্ষুধা ভাঙ্গিয়াছে, কিন্তু খাইবার সাধ মিটে নাই, খাইয়া তৃপ্তি বোধ করি নাই, অথবা খাওয়া হয় নাই বলিলেও হয়। সাধুহৃদয় সভ্যমহোদয়গণ! অনাদ্যা শক্তির পরিণামাভিমুখী বিপুল বিঘূর্ণনে, ফকীরের ভোজনে অতৃপ্তির ন্যায়, চক্ষুর দর্শন-তৃপ্তি কোন কালেই হয় না, অথবা যথাযথ দেখাই হয় না বলিলেও হয়। অন্ধকারে আচ্ছন্ন স্থাণুকে দূর হইতে যেমন পিশাচবৎ দেখায়, তেমনি মায়া-কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন সমস্ত পদার্থই এককে আর বলিয়া বোধ হয়। বাজীকরের অঙ্গুলির উপর ঘূর্ণায়মান একখানি থাল অতি বিঘূর্ণিত হইলে, উহা যেমন একটা রেখা ব্যতীত আর কিছুই বলিয়া বোধ হয় না, সেইরূপ এই মায়াজাল বিস্তারকারী ব্রহ্মাণ্ডের বাহ্যাভ্যন্তরচারী বিরাট ঐন্দ্রজালিকের অঙ্গুলির অগ্রভাগে যে পরিণাম-চক্র বিপুলবেগে বিঘূর্ণিত হইতেছে, তাহাতে কোন বস্তুরই যথাযথ স্বরূপ কাহারও চক্ষুর গোচরীভূত হইতে পারে না। বিদ্যুতের ক্ষণবিকাশে যেমন চক্ষুর তৃপ্তি হয় না, সেইরূপ অনবরত পরিবর্ত্তন-বিপর্য্যয়গ্রস্ত পদার্থ-দর্শনেও নয়নের তৃপ্তি সাধিত হয় না।

১৭৯৯ শকাব্দার শেষ দিন মহাবিষুব সংক্রান্তিতে হরি-দ্বারের মহাকুম্ভ-মেলায় আমি যখন গমন করিয়াছিলাম, তখন পূজ্যপাদ শ্রীমদ্‌গুরুস্বামীজী মহারাজের অনুগত এক জন অবধূত মহাত্মার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি কথাপ্রসঙ্গচ্ছলে উপদেশ করিয়াছিলেন যে, দেখ, লোক-সমাজে একটা উল্টা কথা প্রচলিত আছে, অর্থাৎ লোকে যে বলে, চক্ষু উন্মীলন করিলে দেখা যায়, আর নেত্র নিমীলিত হইলে কিছুই দেখা যায় না, এ কথাটা অতি অসার ও অমূলক। আমরা যখন মাতৃগর্ভে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ঊর্দ্ধপদে অধোমস্তকে সংস্থিত ছিলাম, তখন যাহা দেখিতাম, ভুমিষ্ঠ হইয়া চক্ষু উন্মীলনপূর্ব্বক তাহা দেখিতে পাই কৈ? যাহা দেখিয়াছিলাম, সেই সংস্কারের বশীভূত হইয়া তাহাই দেখি-বার জন্য কত দিকে ছুটিয়া বেড়াই, কত দিকে তাকাইয়া দেখি, কিন্তু তাহা আর দেখিতে পাই কৈ? এখন বুঝিয়াছি, চক্ষু মেলিয়া থাকিলে দেখা যায় না, নেত্র নিমীলিত করি-লেই যাহা দেখিতে চাই, তাহা দেখিতে পাই, অতএব তোমার যদি কিছু দেখিবার ইচ্ছা থাকে, তবে চক্ষু বুজিতে শিক্ষাকর, চক্ষু খুলিয়া থাকিলে কিছু দেখিতে পাইবে না। চক্ষু বন্ধ করিয়া অন্ধ হও, সমস্ত দ্বন্দ্ব মিটিয়া যাইবে, নির্দ্বন্দ্ব সচ্চিদানন্দ অনুভব করিতে পারিবে। সভ্য মহোদয়গণ! অন্ধতা দোষ কি গুণ, তাহা নিজ নিজ বুদ্ধি-বিচারে সকলেই অবস্থানুসারে বুঝিয়া লইবেন। চক্ষুষ্মান্ ও অন্ধ, উভয়ই অবস্থা-বিশেষে সুখী ও স্বচ্ছন্দ, ও উভয়ই অবস্থা-বিশেষে দুঃখী ও দুস্থ। যাঁহারা চক্ষুষ্মান্, প্রকৃত চক্ষু যাঁহাদিগের আছে,

যাঁহারা দেখিবার মত দেখিতে জানেন, তাঁহাদিগের কথা আজ আমার আলোচ্য নহে। যাহাদের দেখিবার মত চক্ষু নাই, দেখাইলেও যাহারা দেখিতে পায় না, দেখিতে আসিয়াও যাহারা দেখিতে পারিল না, সেই অন্ধতমসাচ্ছন্ন অন্ধ-গণেরই অবস্থা আজ আমরা চিন্তা করিব।

যাহারা চক্ষু-বিহীন, তাহারা যদি অন্ধ হয়, তবে আমরা সকলেই অন্ধ। শাস্ত্রে কথিত আছে—

"সৎসঙ্গশ্চ বিবেকশ্চ নির্ম্মলং নয়নদ্বয়ং।
যস্য নাস্তি নরঃ সোঽন্ধঃ কথং নাপদমার্গগঃ॥"

সৎসঙ্গ ও বিবেক, এই দুইটী মানবের নির্ম্মল চক্ষু। যাহার এই দুইটী চক্ষু নাই, সে ব্যক্তি অন্ধ; সে কেন না কুপথে গমন করিবে? যাহা সুপথ, অন্ধ তাহা স্বয়ং দেখিতে পায় না, সুতরাং কুপথে যাওয়া তাহার স্বভাব-সিদ্ধ। সৎসঙ্গ ও বিবেক, এই দুইটীর মধ্যে একটী চক্ষুও যাহার থাকে, সেও পথ দেখিতে পায়; কিন্তু যাহার একটী চক্ষুও নাই, সে সুপথে যাইবে কিরূপে? বিবেক-লাভ করা ত জন্ম-জন্মান্তরীণ সুকৃতি-সাধ্য। চেষ্টা করিলে সৎসঙ্গ সুলভ হইতে পারে। সৎসঙ্গের দ্বারা জীব অনায়াসেই আবার বিবেকলাভ করিয়া থাকে। কলির কলুষিত জীব আমরা, সৎসঙ্গও আমাদের পক্ষে দুর্ঘট হইয়া উঠিয়াছে। সাধুর অভাব হইয়াছে বলিয়া যে সাধুসঙ্গ হয় না, তাহা নহে; সাধু শত শত থাকিলেও আমাদের চক্ষুর দোষে আমরা যে সাধু দেখিতে পাই না, তাহার উপায় কি? আমার মনের দোষে, আমার চক্ষুর

দোষে আমি যে সাধুকেও অসাধু বলিয়া বুঝি! আবার ভ্রমে পড়িয়া কখনও অসাধুকেও সাধু বলিয়া বুঝি! ইহার উপায় কি? প্রকৃত সাধুকে চিনিয়া লওয়া নিতান্ত সহজ নহে। যাঁহারা বিদ্যাভিমানী, তাঁহারা, সন্ন্যাসী বিদ্যাবান্ কি না, এই পরীক্ষার দ্বারা সাধু চিনিতে চাহেন; যাঁহারা তার্কিক, তাঁহাদের তর্কজালে সাধু যদি পরাস্ত হন, তবে তাঁহাকে তাঁহারা সাধু বলিতে চাহেন না, অথবা সাধু তর্ক করিতে অসম্মত হইলে, তার্কিক তাঁহাকে সাধু বলিয়া স্বীকার করিলেন না। কাহারও মতে গৈরিক বসন পরিলে, কাহারও মতে ভস্মাচ্ছাদিতকলেবর ও জটামণ্ডল-মণ্ডিতমস্তক হইলে সাধু হওয়া হয়; কাহারও মতে দিগম্বর থাকিলে ও কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা না কহিলে সাধু হওয়া হয়; কাহারও মতে যিনি ভোজন করেন না, মলমূত্র ত্যাগ করেন না, নিদ্রা যান না, তিনিই সাধু; কাহারও মতে যিনি বন্ধ্যার পুত্র হইবার ঔষধ দেন, ও লোককে নানা যন্ত্রমন্ত্রর দ্বারা মারণ, উচাটন, বশীকরণ আদির ব্যবস্থা করিয়া দেন, তিনিই সাধু। এইরূপে নানা লোকে নিজ নিজ কল্পনা-প্রসূত লক্ষণের দ্বারা সাধুর পরিচয় লইতে চান। কিন্তু সভ্য মহোদয়গণ! ইহা নিশ্চয় জানিবেন, যেমন স্বয়ং সুপণ্ডিত না হইলে কোন পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য-পরীক্ষা করা যায় না, সেইরূপ স্বয়ং সাধুপ্রকৃতি না হইলে সাধুর সাধুতা বুঝিতে পারা যায় না। সাধুর নিকটে গিয়া কি লক্ষণের দ্বারা সাধু বুঝিতে হয়, তাহা সাধু ভিন্ন আর কেহ বলিয়া দিতে পারেন না। সাধুর রক্ত-মাংসময়

শরীর দেখিয়া, বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতার পরীক্ষা করিয়া সাধু চিনিতে পারা যায় না। সাধনাই সাধুতার মূল। সাধন-বিহীন তুমি আমি তাহা কিরূপে বুঝিব! সাধু কতটুকু সাধনায় অগ্রসর হইয়াছেন, কতটুকু সাধন-সিদ্ধির লক্ষণ তাঁহাতে পরিস্ফুট হইয়াছে, সাধন-ক্ষেত্রের কোন্ গূঢ় গর্ভে নিভৃত রত্নভাণ্ডারের অধিকার সাধু লাভ করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া লওয়া অসাধকের সামর্থ্য-বহির্ভূত। কেবল গোটা কতক লম্বা চওড়া জ্ঞানের কথা ছাঁটিলেই সাধু হওয়া যায় না। সাধুত্ব ফল্গুনদীর প্রবাহের ন্যায় হৃদয়ের ভিতর দিয়া লোক-লোচনের অতীত স্থান দিয়া প্রবাহিত হইয়া থাকে। যাঁহার হৃদয় সাধু, তিনিই প্রকৃত সাধু। আজ-কালের একজন বিখ্যাতনামা কলিকাতাস্থ পণ্ডিতকে কাশী-বাসী জনৈক ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, মহাশয়, সাধু কে, তাহা কেমন করিয়া বুঝিব? তাহাতে তিনি নাকি উত্তর দিয়াছিলেন, যাঁহার কেহ কোন নিন্দা না করে, তিনিই সাধু। আমরা এই উত্তর শুনিয়া হাস্য না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কেন না, এমন কোন সাধু কোন দেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই, যাঁহার কেহ নিন্দা বা নির্যাতন করে নাই। স্বয়ং ভগবান্‌ও অবতীর্ণ হইয়া লোক-নিন্দার হস্ত হইতে নিস্তার পান নাই। সাধু সাধুতা-যুক্ত হইলেও আমার বুদ্ধি ও বিচার-দোষে আমি তাঁহাকে অসাধু বলিয়া বুঝিলাম, নিন্দা করিলাম। আমি নিন্দা করিলাম বলিয়া কি সাধু অসাধু হইয়া যাইবেন? যাঁহার কেহ নিন্দা করে না, তিনি সাধু, ইহা অপসিদ্ধান্ত; কিন্তু যিনি কাহারও নিন্দা

করেন না, পর-নিন্দা শুনিলে যাঁহার হৃদয় ব্যথিত হয়, তিনিই সাধু।

"সচ্ছিদ্রঃ ছিদ্রয়ত্যন্যং সূচীব খলদুর্ম্মুখং।
পশ্চাচ্চ সূত্রবৎ সাধুঃ পরছিদ্রং বিলুম্পতি॥"

ছুঁচ স্বয়ং সছিদ্র, তাই কাপড় শেলাই করিবার সময় যে যে স্থান দিয়া গমন করে, সকল স্থানকেই ছিদ্রযুক্ত করিয়া যায়, সেইরূপ খল ও দুর্ম্মুখগণ অছিদ্র-যুক্ত সাধুর নামকেও ছিদ্র-যুক্ত করিয়া দেয়; কিন্তু সূচী-সংলগ্ন সূত্র যেমন সূচীকৃত ছিদ্ররাশিকে পরে বিলুপ্ত করিয়া আসে, সেইরূপ সাধুগণ নিন্দুকের পরিকল্পিত অন্যের নিন্দারাশি বিলোপ করিয়া দেন। হৃদয় ভরিয়া সাধুকে ভালবাসিতে না পারিলে সাধু-সঙ্গের সুমধুর ফল পাওয়া যায় না।

সাধু চিনিতে পারিলেই যে আমরা সাধুসঙ্গ করিতে সমর্থ হই, তাহা নহে। যিনি সাধুকে ভালবাসিতে জানেন, এবং সাধু যাঁহার প্রতি কৃপা করেন, তাঁহারই প্রকৃত সাধুসঙ্গ হইয়া থাকে। সাধুর কথাবার্ত্তা শ্রবণ করাই সাধুসঙ্গ নহে। সাধুর সেবা করা ও সাধুর আজ্ঞা প্রতিপালন করাই সাধুসঙ্গ। সাধুর অনুরক্ত ভক্ত যখন সেবানুরাগী হইয়া সাধুর সমীপে বাস করেন, তখনই সাধুর পবিত্র শক্তিরাশি পুষ্পের সুগন্ধ-প্রবাহের ন্যায় তাঁহার হৃদয়ে প্রবাহিত হইয়া থাকে। যেমন নিদাঘকালীন আতপ-তাপে শরীর অতিশয় সন্তপ্ত হইলে, ও মশক দংশকাদির দংশনে নিতান্ত জ্বালায়াতন হইলে মহিষগণ জলাশয়ে গিয়া গাত্র নিমজ্জন করিয়া থাকে, সেইরূপ বিষয়-সেবার বিপুল সন্তাপে

নিতান্ত কাতর হইলে মানবগণ প্রাণ শীতল করিবার জন্য সাধুদিগের সঙ্গ-লাভে কৃতার্থ হইতে যায়। মহিষগণের মধ্যে কতকগুলি ক্ষণকাল জলে ডুবিয়া শরীর শীতল হইলে সিক্তকলেবরে উঠিয়া আসে, আবার গায়ের জল শুকাইলে, তপন-তাপে ও মশক-দংশকের উৎপীড়নে কাতর হইলে, পুনর্ব্বার জলে গিয়া প্রবেশ করে; এইরূপে সমস্ত দিন জলে স্থলে তাহাদিগকে দৌড়াদৌড়ি করিতে হয়। কতক গুলি মহিষ এরূপ আছে যে, স্থলে উঠিলেই ক্লিষ্ট হইতে হয় বলিয়া, তাহারা সমস্ত দিন জলে গাত্র ডুবাইয়া শীতলতা ভোগ করে; কিন্তু আহারাভাবে তাহাদিগের শরীর শীর্ণ হইতে থাকে। আবার কতকগুলি এরূপ সুচতুর মহিষ আছে যে, তাহারা পঙ্কিল পল্বল মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাতে লুটাপুটি খায়, এবং ক্ষণকাল পরে পঙ্কলিপ্তকলেবরে উঠিয়া আসে, এবং ভোজনাদিপূর্ব্বক বিচরণ করিয়া থাকে; শরীর-সংলগ্ন পঙ্কের আবরণ ভেদ করিয়া তাপ বা মশক-দংশকাদি তাহাদিগকে কোন ক্লেশ দিতে পারে না। ভক্ত মহাত্মাগণ! সাধু-সেবা-পরায়ণ ব্যক্তিগণও এইরূপ ত্রিবিধ ত্রিতাপ-জ্বালায় সন্তপ্ত হইয়া অনেকে শান্তিলাভ করিবার জন্য সাধুদিগের নিকটে উপস্থিত হন, যতক্ষণ সাধুর নিকট বসিয়া তাঁহার বৈরাগ্য-পূর্ণ উপদেশ শ্রবণ এবং তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি দর্শন করেন, ততক্ষণ তাঁহার মনঃপ্রাণ জুড়াইয়া যায় সত্য; কিন্তু গৃহে ফিরিয়া আসিলেই আবার পূর্ব্ববৎ জ্বালামালায় হৃদয় বিদগ্ধ হইতে থাকে। আর কতকগুলি লোক সংসারকে সম্পূর্ণ ক্লেশের হেতু

জানিয়া সর্ব্বদাই সাধুদিগের নিকটে থাকেন, গৃহ কলত্রাদি-সেবনে মনোযোগ দিতে পারেন না, সাধু-সেবায় তাঁহাদের চিত্ত শান্ত হয় সত্য ; কিন্তু পরিবারাদির কথা-স্মরণ হইয়া তাঁহাদিগের সময়ে সময়ে চিত্ত-বিক্ষেপ উপস্থিত হয়। আর যাঁহারা অতি সুচতুর, তাঁহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সাধু-সেবা করিয়া সাধুসঙ্গ-সরোবরে অবগাহনপূর্ব্বক সাধন-শক্তির কর্দ্দম হৃদয়ে মাখিয়া, যথাযথরূপে যথাতথা গৃহে ও বাহিরে বিচরণ করিয়া পরমানন্দ ভোগ করিয়া থাকেন।

সাধু যে স্থানে বাস করেন, তথাকার স্থানীয় প্রকৃতি অতীব নির্ম্মল, আকাশ-মণ্ডল দিব্যতেজে পরিপূর্ণ, সেখানকার মৃদু মন্দ মারুত-হিল্লোলে মন সুশীতল হয়, প্রাণ জুড়াইয়া যায়। সাধুর কাছে উপদেশ না লইলেও ভক্তি-পূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার নিকটে থাকিলেই তাঁহার তপস্তেজের রত্নরেণু-রাশি হৃদয় মধ্যে মুক্তা-মালার ন্যায় আপনি গ্রথিত হইয়া যায়। মাধাই মহাপাষণ্ড হইলেও কেবল সাধুর সঙ্গগুণে সে স্বর্গীয়শক্তি লাভ করিয়াছিল। মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন—

"আয় রে মাধাই! কাছে আয়, হরিনামের বাতাস লাগুক গায়।"

জলীয় বাতাসে যেমন জল-কণিকা প্রবাহিত হয়, সেইরূপ সাধুর গায়ের বাতাসে ভাগবতী শক্তি ও ভগবদ্ভক্তিরূপ সুধাসিন্ধুর বিন্দু-রাশি প্রবাহিত হইতে থাকে। যখন নিদাঘের নিদারুণ সন্তাপে বৃক্ষগুলি জীবনমৃতবৎ হইয়া যায়, এমন সময়ে বর্ষার বিপুল বারিধারা তাহাদিগকে নাহাইয়া, ধোয়াইয়া নির্ম্মল ও সবল করে, ও মূলদেশে রসের সঞ্চার

করিয়া থাকে। ত্রিতাপতপ্ত জীব, তুমিও মস্তক অবনত করিয়া সাধুসঙ্গরূপ নিস্তরঙ্গ নির্ম্মল-নীর-সরোবরে অবগাহন করিয়া লও, তোমার হৃদয়-তরুর গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে, সন্ধিতে সন্ধিতে, নবীন সুধারসের সঞ্চার হইবে, সাধুসঙ্গের অমৃতময় ফললাভ করিবে।

সাধুহৃদয় মহোদয়গণ! সাধুসঙ্গের আশ্চর্য্য প্রভাবের একটী প্রকৃত ঘটনার দৃষ্টান্ত বলিতেছি। রেওঁয়া রাজ্যের পূর্ব্বতন রাজার একজন সুপণ্ডিত কুলগুরু ছিলেন। তাঁহার পুত্র শাস্ত্র-সুশিক্ষা লাভ করিবার জন্য রাজকীয় ব্যবস্থায় কাশীতে সমাগত হয়েন। বুদ্ধিমান্ বিদ্যার্থী অল্প দিনের মধ্যেই ব্যাকরণ, কাব্য, কোষ, দর্শন-শাস্ত্রাদি পাঠ সমাপ্ত করিয়া রেওঁয়ায় উপস্থিত হইলেন। রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, আপনার ব্যবস্থায় আমি কৃতবিদ্য হইয়া আসিয়াছি, রাজ-সভার পণ্ডিত-মণ্ডলীর সহিত আমি শাস্ত্রার্থ-বিচার করিব, আপনি আমার শাস্ত্র-শিক্ষার পরিচয় গ্রহণ করুন। রাজা বলিলেন, তুমি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ করিয়া আসিয়াছ কি? গুরুপুত্র উত্তর করিলেন যে, আমি ব্যাকরণ, সাহিত্য, ও দর্শনাদিতে সুপণ্ডিত হইয়াছি, গীতা স্বতন্ত্ররূপে পাঠ করিবার প্রয়োজন হয় নাই, আমি এমনই উহার অর্থ করিতে পারিব। রাজা বলিলেন, শাস্ত্র-শিক্ষা গুরুমুখী না হইলে, উহা অসিদ্ধ, তুমি পুনর্ব্বার কাশীতে গিয়া গীতা পড়িয়া আইস। বিদ্যার্থী কাশীতে আসিয়া জনৈক পণ্ডিতের নিকট ভাষ্য টীকা সহিত গীতা পড়িয়া পুনর্ব্বার রেওঁয়ায় গমন করিলেন,

এবং রাজ-সমীপে পণ্ডিত-মণ্ডলীর সহিত শাস্ত্রার্থ করিবার অনুমতি চাহিলেন। তাহাতে রাজা বলিলেন, তুমি কি গীতা কোন সন্ন্যাসী সাধুর নিকট পাঠ করিয়াছ? এবং যখন শুনিলেন যে, তিনি গীতা কোন পণ্ডিতের নিকট পড়িয়াছেন, সাধুর নিকট পড়েন নাই, তখন বলিলেন যে, তুমি পুনর্ব্বার কাশী যাও, ও কোন ভগবদ্ভক্ত সাধু সন্ন্যাসীর নিকট গীতা পুনর্ব্বার পাঠ করিয়া আইস। পণ্ডিতগণ প্রায়ই পাণ্ডিত্যের অভিমানে অহম্মন্যতায় উন্মাদিত হইয়া কাহাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিতে চাহেন না। রাজ-গুরুপুত্র যখন সেইরূপ পণ্ডিতের কাছে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন, তখন তাঁহার হৃদয়ে অহম্মন্যতার অন্ধতামসী শক্তি সঞ্চারিত হইবে না কেন? তাই রাজার কথায় একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন যে, আমি যেরূপ গীতা পড়িয়াছি, তাহা অপেক্ষা সন্ন্যাসী সাধু আর কি নূতনরূপ পড়াইবেন? রাজা তথাচ তাঁহাকে কাশীতে পাঠাইয়া দিলেন। বিদ্যার্থী কাশীতে পুনরাগত হইয়া একজন ভক্তিমান্ বৈরাগ্যবান্ সাধুর নিকট গীতা পুনরধ্যয়ন করিলেন। পাঠ সমাপ্ত হইলে গুরুকে অভিবাদনপূর্ব্বক গুরুর আজ্ঞা ও আশীর্ব্বাদ লইয়া রেওঁয়ায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন; কিন্তু সেবার তিনি আর রাজ-সভায় গমন করিলেন না। রাজা গুরুপুত্রের পুনরাগমন-সংবাদ পাইয়া গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এবার আপনার পুত্র রাজ-সভায় আসিলেন না কেন? গুরু উত্তর করিলেন, তাহা আমি জানি না, সে সর্ব্বদাই গীতা লইয়া পাঠ ও পূজায় ব্যস্ত থাকে, অন্য কোন কার্য্যে

তাহাকে অভিনিবিষ্ট হইতে দেখিতে পাই না। রাজা মনে মনে ভাবিলেন, এইবার ফলে রং ধরিয়াছে। রাজা এক দিন প্রাতঃকালে গুরু-গৃহে গিয়া দেখিলেন, গুরু-পুত্র অতি প্রীতি সহ নিবিষ্টচিত্তে পূজার আসনে বসিয়া গীতা পাঠ করিতেছেন। পাঠ সমাপ্ত হইলে রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এবার আপনি শাস্ত্রার্থ-বিচার জন্য রাজ-সভায় যান নাই কেন? গুরুপুত্র উত্তর করিলেন, মহারাজ! এবার আমি সাধুর নিকট গীতা পড়িয়া আসিয়াছি। জিগীষা বুদ্ধি বিদূরিত হইয়াছে, সাধু-সহবাসে অহম্মন্যতা-বুদ্ধি বিমর্দ্দিত ও বিচূর্ণিত হইয়াছে। বিষয়-সেবা অপেক্ষা ভগবৎ-সেবাই প্রধান বলিয়া উপলব্ধি হইয়াছে, তাই আর বৃথা তর্ক বিতর্ক করিতে, তাই আর সভাবিজয়ী হইতে ইচ্ছা নাই। ভগবদ্গীতার ভাব-রসে ডুবিয়া থাকিতে সদাই অভিলাষ। মহারাজ! সভায় যাইতে আর আমাকে অনুরোধ করিবেন না। রাজা গুরুকুলে মহাপুরুষ দর্শন করিয়া আনন্দিত হইলেন, এবং তাঁহার দর্শন-দক্ষিণার স্বরূপ তাঁহার স্বচ্ছন্দে জীবিকা-নির্ব্বাহের উপযুক্ত একটী ভূ-সম্পত্তি তাঁহাকে দান করিলেন। শুশ্রূষু মহোদয়গণ! ব্রাহ্মণ বালক যে সাধু-সহবাস করিয়াছিলেন, সাধুর সুধা-মাখা যে উপদেশ পাইয়াছিলেন, সাধু-সমীপে শাস্ত্র-শিক্ষা করিবার সময় যে সাধু-শক্তি তাঁহাতে সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাই তাঁহাতে সাধুসঙ্গের ফল ফলিয়াছিল।

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পদার্থ সুন্দর ও সম্পূর্ণরূপে দেখিতে হইলে সৎসঙ্গই দিব্য চক্ষু। সহজ চক্ষে যাহা দেখা যায়,

দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণের সাহায্যে সেই পদার্থ যেমন আরও নিগূঢ়রূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ সৎসঙ্গ ও বিবেকরূপ নয়নদ্বয়ের সাহায্যে পদার্থের স্বরূপ উত্তমরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমাদের দুর্ভাগ্য-দোষে ও অভিমানের উত্তাপে আমরা দুইটী চক্ষুই হারাইয়া বসিয়াছি। সাধ করিয়া অন্ধ হইয়া সকল অন্ধকার দেখিতেছি। সংবাদ-পত্রে পাঠ করিয়াছি, বিলাতের একজন মাতাল অতিরিক্ত মদ্যপানের দোষে নেত্রের দৃষ্টি-শক্তি হারাইয়াছিল। অনেক দিন চিকিৎসা হইলে পর যখন কিছুতেই পীড়া আরোগ্য হইল না, তখন ডাক্তার বলিলেন, তোমাকে আর কোন ঔষধই সেবন করিতে হইবে না; কেবল যে মহাবিষরূপ সুরা সেবন করিতেছ, তাহাই ছাড়িতে হইবে; মদ্য ত্যাগ করিলেই তোমার ব্যাধির শান্তি হইবে। মাতাল বলিল, ইহা ব্যতীত কি রোগ-শান্তির অন্য উপায় নাই? ডাক্তার বলিলেন—না। তখন মাতাল বলিয়া উঠিল, প্রাণত্যাগ করিতে পারিব, কিন্তু মদ্যত্যাগ করিতে পারিব না; যদি মদ না ছাড়িলে চক্ষু ভাল না হয়, Then good-by to my eyes (চক্ষু-দ্বয়! তবে তোমাদিগের নিকট হইতে বিদায় হইলাম), এই বলিয়া ক্ষান্ত হইল। মাতাল আপনার দোষে আপনার চক্ষুদুটী জন্মের মত হারাইল। আমরাও সেইরূপ মোহমদিরা-পানে প্রমত্ত হইয়া চক্ষুদুটী (সৎসঙ্গ ও বিবেক) হারাইয়াছি।

"পীত্বা মোহময়ীং প্রমাদমদিরাং উন্মত্তভূতং জগৎ॥"

সাধারণ মাতালেরা দুই দশ বৎসর মদ খাইয়াই অন্ধতা

প্রাপ্ত হয়; কিন্তু আমরা জন্ম-জন্মান্তর হইতে এই মোহ-সুরা পান করিয়া আসিতেছি, আমরা যে অন্ধ হইয়া পড়িব, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? বিষয়-পিপাসায় কাতর হইয়া আমরা সুধা-বোধে যে সুরা পান করিয়াছি, তাহাতেই আমরা জন্মান্ধ। জন্মান্ধ কখনই কিছু দেখে নাই। চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি যদি কখনও কিছু অন্ধকে দেখাইয়া দেন, অন্ধ তাহা দেখিতে পাইবে কেন? শুনিয়া শিখিয়া কি দেখার সাধ মিটিয়া থাকে। অন্ধের দেখিবার আকাঙ্ক্ষা আছে, কিন্তু দেখিতে পায় না। অন্ধ চক্ষুষ্মানের উপদেশ-মতে পথ চলিয়া থাকে, আহার ব্যবহার করিয়া থাকে; বলিতে কি, অন্ধ নিজ জীবনের সমস্ত কার্য্যই পরের উপদেশে সম্পন্ন করিয়া থাকে। অন্ধের সমস্তই প্রয়োজন, কিন্তু নিজে কিছুই করিয়া লইতে পারে না। ভাত খাইতে পারে, কিন্তু রাঁধিয়া লইতে জানে না। অন্ধ রান্না ভাত পাইলে খাইয়া তৃপ্ত হয় মাত্র। অন্ধ বড় গরীব ও পথের ভিখারী। চক্ষুষ্মানের কৃপা না হইলে অন্ধের কোন কর্ম্মই সিদ্ধ হয় না। যিনি দীনদয়াল, তিনি অন্ধ-শালা নির্ম্মাণ করিয়া দেন; তিনিই অন্ধের জন্য অন্ন-সত্র খুলিয়া সংকীর্ত্তি-রক্ষা করিয়া থাকেন।

জগতের যত অন্ধকে দেখিতে পাই, সকলেই এক একগাছি যষ্টি অবলম্বন করিয়া পথ চলিয়া থাকে। খাইবার স্থানে, শুইবার স্থানে, বসিবার স্থানে, অথবা যে কোন স্থানে যাউক না কেন, অন্ধ আপনার যষ্টি ছাড়িয়া যায় না। যষ্টিই অন্ধের পরমাবলম্বন ও পরমোপকারী বন্ধু। অন্ধের পিতা

মাতা মরিয়া গেলেও চলিতে পারে, কিন্তু যষ্টি-হারা হইলে অন্ধ আর এক পাও চলিতে পারে না। যষ্টি হয়ত হস্তিদন্তে বিনির্ম্মিত, মণিমুক্তা-বিজড়িত, স্বর্ণখচিত না হইতে পারে। উহা অল্প মূল্যের বংশ-খণ্ড হইলেও উহা অন্ধের পক্ষে অমূল্য জিনিষ। আমরা অন্ধ, স্বরূপ-দর্শনে অপটু, সুতরাং জীবনের পথে চলিতে হইলে আমরাই বা যষ্টি অবলম্বন না করিয়া কিরূপে যাইতে পারি। সাধারণ অন্ধত যষ্টিকে অবলম্বন করিয়া গন্তব্য পথে ধীরে ধীরে গমন করিয়া থাকে। আমরা যে অজানিত পথে যষ্টি না লইয়া যাইতে পারিব, ইহা ত সম্ভব নয়। আমাদিগকে যে পথে যাইতে হইবে, তাহা আমরা স্বয়ং জানি না, কেহ বলিয়া দিলেও তাহা শুনি না, কেহ বুঝাইয়া দিলেও তাহা বুঝি না। যেখানে যাইতে হইবে, সেখানে না যাইলেও নয়। পথহারা পথিক আমরা, সেই পথে কিরূপে যাইব, তাহাই ভাবিতেছি। সাধারণ অন্ধ, তাহার গন্তব্য স্থান স্বয়ং বুঝিয়া লয়, সে আপনার মতে আপনার পথে যষ্টি ধরিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া যায়; কিন্তু আমাদের মত অন্ধের সেরূপ হইলেও ত চলিবে না; কেননা আমাদিগের গন্তব্য স্থানও জানি না, পথও জানি না। সুতরাং, সাধারণ যষ্টি লইয়া আমাদিগের কোন ফল হইবে না। যষ্টি লইয়া আমরা যাইব না; কিন্তু যষ্টি আমাদিগকে লইয়া যাইবে। আমরা কলের যষ্টি চাই,—মন্ত্রপূত যষ্টি চাই। অপথ, কি কুপথ, কি সুপথ, আমরা কিছুই জানি না। আমরা এমন যষ্টি চাই, যে যষ্টি স্বয়ং আমাদিগকে সুপথে

লইয়া যাইবে। যাইতে যাইতে সম্মুখে অপথ কি কুপথ পড়িলে, কলের যষ্টি আপনিই আমাদিগকে সুপথের দিকে ঘুরাইয়া দিবে। যে দিকে মহানরকের মহান্ গর্ত্তরাশি, যষ্টি সে দিকে যাইতে আমাদিগকে বাধা দিবে। আমি জানি, আর নাই জানি, আমার যেখানে যাইতে হইবে, সেই চিরবিশ্রাম-নিকেতনের দিকে যষ্টি আমাকে আপনিই লইয়া যাইবে।

"যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধামপরমম্মম।"

ইন্দ্রজালীর মন্ত্রপূত সেই কলের যষ্টি যে অন্ধ অবলম্বন করিতে পারিয়াছে, সেই অন্ধই নিত্য নিকেতনে পৌঁছিতে সমর্থ হইয়াছে। এই যষ্টি ভক্তগণের দরবারে সিদ্ধগণের প্রেমবাজারে বিনামূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। যষ্টি—

হরিনাম।

আমাদিগের ন্যায় বিষয়ান্ধ জীবের হরিনামই পরমা-বলম্বন। যোগ, জ্ঞান, বিজ্ঞানরূপ মণিমুক্তাখচিত স্বর্ণ যষ্টি হাতে থাকিলে চোরে (ষড়রিপু) চুরি করিয়া লইতে পারে, অন্ধকে মারিয়া কাড়িয়া লইতে পারে; কিন্তু এত সহজ সাধনের হরিনামরূপ যষ্টি ধারণে কোনরূপ বিঘ্ন বিপত্তি নাই, তাই নিঃসহায় অন্ধের পক্ষে হরিনাম পরম বন্ধু। বেদরূপ সুগভীর অরণ্য মধ্যে এই যষ্টি জন্মিয়াছে। অন্ধের প্রতি—কলির জীবের প্রতি দয়া করিয়া এই সুঠাম হরিনামরূপ যষ্টি সংসারে কে আনিল? তাঁহাকে বারংবার নমস্কার করি। মূর্খ আমি, জ্ঞানলাভ করিব কোথায়? চঞ্চলচিত্ত আমি, যোগাভ্যাস করিব কিরূপে? পাষাণ-

হৃদয় আমি, অহঙ্কারে উন্মত্ত আমি, ভক্তি পাইব কোথায় ? তাই আজ কাঙ্গালের ধন, দরিদ্রের সম্পত্তি—অন্ধের যষ্টি, অন্ধ আমি অনায়াসে পাইয়া প্রাণ ভরিয়া বলিতেছি, হরিবোল ! সকলে বলুন, হরি হরিবোল ! পাপতাপ কাটিয়া যাইবে, জন্মজীবন সার্থক হইবে। অধিকারী হইতে হয়, নাম আপনিই আমাকে উপযুক্ত অধিকারী করিয়া লইবে। অসমর্থ আমি, অন্ধ আমি, আমাকে স্বয়ং কিছু দেখিয়া, শুনিয়া, করিয়া, কর্ম্মিয়া লইতে হইবে না ; নামের গুণে সকলই হইবে।

দানবেন্দ্র হিরণ্যকশিপু কঠোর তপস্যা করিয়া এই বর লইয়াছিলেন যে, জলে স্থলে, নিশি বা দিবায়, দেব দানব বা মানবে, অস্ত্রে বা শস্ত্রে, কিছুতেই তাঁহার মৃত্যু হইবে না। এই বর পাইয়া মহামায়াবী দানবেন্দ্র ভাবিয়াছিলেন, তিনি অমর হইলেন। কিন্তু চতুর-চূড়ামণি ভগবান্ ! দিবায় নয়, নিশিতে নয়—সন্ধ্যাকালে ; দেব নয়, দানব নয়—অৰ্দ্ধপশু অর্দ্ধমনুষ্যাকারে ; অস্ত্র নয়, শস্ত্রে নয়—প্রখর নখরাঘাতে ; জলে নয়, স্থলে নয়—নিজ জঙ্ঘার উপরে রাখিয়া ভগবান্ দানবেন্দ্রকে বধ করিলেন। দনুজাধীশ এই অভিনব, অপরূপ, আশ্চর্য্য ব্যবস্থা কখন স্বপ্নেও ভাবেন নাই। হিরণ্যকশিপুর অমর থাকিবার সকল ব্যবস্থা থাকিলেও যেমন ভগবানের মায়া কৌশলে তাহার মৃত্যু হইল, কলি-কলুষ-নাশনেও সেইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর অতীত হইলে কলিযুগ যখন রাজ্যাভিষিক্ত হয়েন, তখন কলি ভগবান্‌কে বলিয়াছিলেন, প্রভো !

আমি তবেই রাজ্য করিব, যদি আপনার আজ্ঞা পাই যে, জ্ঞান, ধ্যান, যোগ, সমাধি, কোন কিছুই আমার রাজ্য-কালে জীবের পরমপদলাভে কার্য্যকরী হইবে না। ভগবান্ কলিকে তথাস্তু বলিয়া আশ্বস্ত করিলেন। মহাচক্রী-চূড়ামণি কলিকে ভুলাইলেন বটে; কিন্তু জীবের প্রতি দয়া করিয়া আবার সদ্ব্যবস্থাও করিলেন। কলির কথনানুসারে যোগ, ধ্যান, জ্ঞান সকলই বিফল হইতে লাগিল সত্য; কিন্তু কাঙ্গা-লের সখা জীব তরাইবার জন্য নিজ পবিত্র নামে শক্তি-সঞ্চার করিলেন। হরিনাম ধ্যান নয়, জ্ঞান নয়, যোগ নয়; ইহা এক অপূর্ব্ব ঐন্দ্রজালিক যষ্টি (magic rod); ইহাতে যাহা মনে করিবে, তাহাই সিদ্ধ হইবে। হরিনাম কলি-কথিত সাধন-মার্গের অতীত, নূতন জিনিষ। হিরণ্যকশিপুর সম্মুখে নর-সিংহমূর্ত্তি যেমন অপরূপ, কলির সম্মুখে এই কলি-কলুষ-নাশন হরিনাম এক অপূর্ব্ব যষ্টি। এই যষ্টির তাড়নায় কলি ভীত হইয়াছেন। পাপ, তাপ, ও দূতগণ সহ স্বয়ং যমরাজও চকিত ও চমকিত হইয়াছেন। নামের মহিমা অপার। শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু জ্ঞানের অনন্ত জ্বলন্ত প্রকাণ্ড কুণ্ডে ঘনীভূত প্রেমের ক্ষীরে পরমান্ন পাক করিয়া, অন্নপূর্ণার ন্যায় স্থালী-হস্তে, অন্ধ পথহারা পথিককে ডাকিয়া বলিতেছেন—

নাম সুধারস কে নিবি রে আয়!
এ যে দেবের দুর্লভ হরিনাম, নামে ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে যায়,
নামের গুণে বোবায় বলে, পঙ্গু চলে, অন্ধ চোখে দেখ্‌তে পায়।"

নাম-সুধারস যে একবার পান করিয়াছে, নামের মাধুরী ধারায় যে একবার অবগাহন করিয়াছে, তাহার সুখের নদী

উছলিয়া উঠিয়াছে। যেমন বড় মানুষের অনেক টাকা থাকি-লেও তাঁহার দ্বারে একজন দরিদ্র উপস্থিত হইলে, এবং চীৎ-কার করিয়া প্রার্থনা করিলে, তাহার প্রার্থনা পরিপূর্ণ হওয়া দূরে থাক্, সে দ্বারবান্ কর্ত্তৃক তিরস্কৃত ও তাড়িত হইয়া থাকে ; সেইরূপ আমার ন্যায় অন্ধ জীব যোগৈশ্বর্য্য দেখিয়া যোগীর দ্বারে উপস্থিত হইলে যোগী আমাকে অনধিকারী—অন্ধ বলিয়া দ্বার হইতেই তাড়াইয়া দিবেন। আমি অন্ধ, সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন নয় বলিয়া জ্ঞানী হয়ত আমাকে সম্মুখে বসিতেই দিবেন না। কিন্তু দয়ায় হৃদয় বিগলিত যাঁর, দুঃখীর জন্য প্রাণ কাঁদে যাঁর, তিনি কি অন্ধ আতুরকে দেখিয়া নীরব থাকিতে পারেন ? তাই অনাথ ও অনাশ্রিতের পরমহিতৈষী পুরাণ-রচয়িতাগণ জ্ঞানের অনন্ত গুহ্য ভাণ্ডার—বেদের গভীর গর্ভ হইতে এই নামের যষ্টি বাহির করিয়া অন্ধের সদ্গতি বিধান করিয়াছেন। যে কেহ অন্ধ থাক, এই অনাথবন্ধু—অন্ধের যষ্টি গ্রহণ কর ; এমন অদ্ভুত যষ্টি আর কোথাও নাই। নিরা-শ্রয়ের এমন অবলম্বনও আর কোথাও নাই। যাহার কেহ কোথাও নাই, নামের মত এমন বন্ধু সে আর পাইবে না। তোমার জপ, তপ, ব্রত অনুষ্ঠান করা না থাকিলেও এই যষ্টি আপনা আপনি তোমাকে সকল ফলের কল্পতরু-তলে লইয়া যাইবে। তোমার অন্ধকার ঘরে অনন্তকোটীসূর্য্য-বিজয়ী পরমতেজ দেখিতে পাইবে। তোমার কুটীল পথকে সরল করিয়া, বাঁকাচোরা পথের মোড় বাঁকাইয়া যষ্টি আপনিই তোমাকে তোমার লক্ষ্য নিবাসে পৌঁছাইয়া দিবে। তুমি পাতকী বা পাষণ্ড হও, চিন্তা কি ? হরিনামের যষ্টি তোমার

পাপ পাষণ্ডতা চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া, বন্ধুর পথ সমতল করিয়া, ধীরে ধীরে তোমাকে পরিপূর্ণ পুণ্য রাজ্যে, জ্ঞানীর ব্রহ্মানন্দ-নিকেতনে, যোগীর যোগানন্দ-ভবনে, ও ভক্তের প্রেমনিকুঞ্জ-কাননে লইয়া যাইবে। প্রভাসখণ্ডে লিখিত আছে—

মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাম্।
সকলনিগমবল্লীসৎফলং চিৎস্বরূপম্॥
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা।
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥

অবহেলাপূর্ব্বকই হউক, আর শ্রদ্ধার সহিতই হউক, মানব যদি অল্পমাত্র বা একবার মাত্রও ভগবানের নাম গান করে, তবে পাপতাপ সকল যাতনা হইতে সেই নাম জীবকে উদ্ধার করিয়া থাকে। এই নাম মধুর হইতেও সুমধুর, এবং সমস্ত মঙ্গলের মঙ্গল-স্বরূপ, এই মধুর নাম হইতেই বেদাদি শাস্ত্র ও সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের বিকাশ হইয়া থাকে। তুমি জন্মজন্মান্তরের বহু দুষ্কৃতি-ভার বহন করিয়া কাতর হইয়াছ কেন? তুমি পাপের ভয়ে ভীত হইয়াছ কেন? ব্রহ্মবৈবর্ত্তে লিখিত আছে, তাহা কি শুন নাই?

"সর্ব্বপাপপ্রশমনং সর্ব্বোপদ্রবনাশনম্।
সর্ব্বদুঃখক্ষয়করং হরিনামানুকীর্ত্তনম্॥"

পাপ, অতিপাপ, ও মহাপাপ, ব্যাধি, মহাব্যাধি, ও অতিব্যাধি, তাপত্রয়, ষড়দুঃখ ও দুঃস্বপ্ন, এবং আরও যত প্রকার জীবের বিঘ্ন, বিপত্তি, উপদ্রব, উপসর্গ থাকুক না কেন, হরিনামকীর্ত্তন করিলে জীব সমস্ত যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া থাকে। সাধু-হৃদয় শ্রোতৃমহোদয়গণ! কেন আপনাকে অন্ধ বোধে কাতর

প্রাণে পাপতাপ-কলুষ-বিনাশ-কামনায় চিন্তিত হইয়াছেন? বৃহন্নারদীয় পুরাণে উক্ত আছে—

"নরাণাং বিষয়ান্ধানাং মমতাকুলচেতসাম্।
একএব হরের্নাম সর্ব্বপাপবিনাশনম্॥"

অহং মমতায় অভিভুত, বিষম বিষয়ান্ধকারে অন্ধীভুত মানব-গণের যত পাপই থাকুক না কেন, একমাত্র হরিনামের প্রভাবে সমস্তই বিনষ্ট হইয়া যায়। মুমুক্ষু মানব! এমন জীব সংসারে কে আছে, যে জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ কোন না কোনরূপ পাপ বা অপরাধ না করিয়াছে? করিয়াছে বলিয়াই বা তাহার এত ভাবনা কেন? বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে কথিত আছে—

"নাম্নোঽস্য যাবতী শক্তিঃ পাপনির্হরণে হরেঃ।
তাবৎ কর্ত্তুং নশক্নোতি পাতকং পাতকী জনঃ॥"

হরিনামে এত পাপহরণ করিবার শক্তি আছে যে, অতি মহা-পাতকীও তত পাপ করিয়া উঠিতে পারে না।

"প্রাণপ্রয়াণপাথেয়ং সংসারব্যাধিভেষজম্।
দুঃখশোকপরিত্রাণং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্॥"

হে জীব! মরণের পর কোথায় যাইতে হইবে, কোন্ দুর্গম ও দুর্জ্ঞেয় স্থানে উপস্থিত হইবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই। লোকে সামান্য দূর যাইতে হইলেও পাথেয় সঙ্গে লয়; এই অজানিত পথে যাইতে হইলে হরিনামই পথের সম্বল, সংসার-ব্যাধির হরিনামই মহৌষধ, দুঃখ-শোক-পরিত্রাণের জন্য হরি এই অক্ষরদ্বয়ই উপযুক্ত বিধি। বৃহন্নারদীয়ে উক্ত হইয়াছে—

"হরির্হরতি পাপানি দুষ্টচিত্তৈরপিস্মৃতঃ।
অনিচ্ছয়াপি সংস্পৃষ্টো দহত্যেব হি পাবকঃ॥"

অভক্তিপূর্ব্বকও যদি কোন ব্যক্তি ভগবানের নাম গ্রহণ করে, তথাপি তাহার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়, অনিচ্ছাপূর্ব্বকও যদি কেহ জ্বলন্ত অনলে হস্ত প্রদান করে, তবে কি তাহার হস্ত দগ্ধ হয় না?

সাধু মহোদয়গণ! কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান, ভক্তি আদির যেমন অধিকারী অনধিকারীর বিচার আছে, হরিনাম-সাধনে সেরূপ বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। ক্ষুধার্ত্ত যে ব্যক্তি, পিপাসা অনুভব হইয়াছে যাহার, দৌড়িয়া আসিয়া হরিনাম-সুধারস পান কর, চিরপরিতৃপ্তি লাভ করিবে। আমরা পাপী পাষণ্ড বলিয়া, জ্ঞান যোগাদির অধিকারী নই বলিয়া, নিরাশ হইবার প্রয়োজন নাই, এই পাষণ্ডদলন হরিনাম প্রাণ ভরিয়া উচ্চারণ কর, দেবদুর্লভ নিকেতন নিকট হইয়া আসিবে। জন্মজন্মান্তরে বিষম বিষয়-বিষ-পান করিয়া অন্ধ হইয়াছি আমরা, হরিনামের ঐন্দ্রজালিক যষ্টি আমাদের অবলম্বন। হরিনামে পাপীর যেমন অধিকার, হরিনামে পাপীর যেমন আনন্দ ও লাভ, এমন আর কাহারও নাই। পাতকী ভিন্ন পেট ভরিয়া হরিনাম-সুধা আর পান করিতে পারে কে? যাঁহারা ভক্ত ও ভক্তির অবতার, তাঁহারাই ত প্রাণ পুরিয়া, পেয়ালা ভরিয়া নাম-সুধারস মনের সুখে পান করিতে পারিয়াছেন। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু 'হ' এই অক্ষরটী উচ্চারণ করিতে না করিতেই প্রেমের আবেশে বিহ্বল হইয়া পড়িতেন, কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইত, 'রি' এই অক্ষরটী উচ্চারণ করিবার সামর্থ্য থাকিত না। তিনি জীবনে কয় বারই বা হরিনাম উচ্চারণ করিতে পারিয়াছেন? যবন হরিদাস যেমন দৈনিক লক্ষ হরিনাম জপ করিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য

করিতে করিতে জগতে বজ্র-নিনাদে হরিনামের জয়ধ্বনি গাহিয়াছেন, পাপী জগাই মাধাই যেমন নাম-সুধাপানে মত্ত হইয়া ভৈরব হুঙ্কারে 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলিয়া দেশকে জাগ্রত করিয়াছেন, তেমন আর কে করিতে পারিয়াছে? আমাদের ন্যায় অভক্ত না হইলে, আমাদের ন্যায় অপরাধী না হইলে, আমাদের ন্যায় কলি-কবলিত না হইলে, আমাদিগের ন্যায় পতিত পাতকী না হইলে, ভগবান্ দয়া করিয়া হরিনামের স্বর্গীয় সুধা তবে কাহার জন্য পাঠাইয়াছেন? সমস্ত ভয় ভাবনা তুচ্ছ করিয়া, অধিকার অনধিকার বিস্মৃত হইয়া, সাধের মানব জন্মকে সফল করিবার জন্য আসুন, সকলে একবার বদন ভরিয়া বলি 'হরিবোল' পুনর্ব্বার বলি 'হরি হরিবোল,' আবার সকলে বলি 'হরি হরিবোল'।

কি জানি মহতোমহীয়ান্ ভগবান্ চিকণচিকুর পাশে কিরূপে মত্ত হস্তীকে বাঁধিয়া রাখেন, 'হরি' শব্দটী ছোট খাট হইলেও ভগবান্ অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তি ইহাতে সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছেন। নাম উচ্চারিত হইলেই দেহ, মন, আত্মা পবিত্র হইয়া যায়। এই মধুর শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিয়া বা মুখে উচ্চারিত হইয়া হৃদয়ের কোন্ তড়িৎ তন্ত্রীতে ঘাত-প্রতিঘাত করে, কিরূপে স্নায়বীয় প্রকৃতিকে বিকম্পিত করিয়া মস্তিষ্কের গূঢ় স্থান স্পর্শ করে, এই সুগভীর শব্দ-বিজ্ঞানের কথা লইয়া আজ সময় ক্ষেপ করিবার আমার অবকাশ নাই। তবে কেহ কেহ যে বলিয়া থাকেন—

"পণ্ডিত যো রাম বদে সো ঝুটা
রাম কহে জগৎ গতি পাওয়ে তো খাঁড় কহে মুখ মিঠা।"

হরি হরি মুখে বলিলে যদি লোকের সদ্‌গতি হইত, তবে চিনি চিনি করিলেও মুখ মিষ্ট হইত। হরি শব্দের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মসাক্ষাৎকার না করিলে, কেবল বাহিরে হরি হরি বলিলে কি হইবে? চিনি রহিল কোথায়, হরি রহিলেন কোথায়, তুমি কেবল মুখে নাম উচ্চারণ করিলে কি হইবে? সুবোধ সভ্য মহোদয়গণ! আমি সংক্ষেপে এই উত্তর করিব যে, দৃষ্টান্তের দ্বারা কোন বিষয় বুঝিতে পারা যায় না, কেবল বুঝিবার সুবিধা হয় মাত্র। পদার্থ-সাধনে যথাযথ যুক্তি ও উপযুক্ত প্রমাণ চাই। যদি উপযুক্ত যুক্তি ও প্রমাণ না দিয়া কেবল দৃষ্টান্তের কৌশলেই হরিনামের অসারতা প্রতিপাদিত হয়, তবে আমিও তাহার বিপরীত দৃষ্টান্তের দ্বারা নামের সারবত্তা বুঝাইতেছি। ঐ দেখুন, সম্মুখের তেঁতুল গাছে একটী বানর বসিয়া কাঁচা তেঁতুল ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া খাইতেছে, আপনি ত কিছু তেঁতুল খাইতেছেন না; কিন্তু একবার বানরের তেঁতুল চিবাইয়া খাইবার দিকে তাকাইয়া থাকুন, দেখিবেন, আপনার জিহ্বায় জল সরিবে, দন্তমূল্ শির্ শির্ করিয়া উঠিবে। কোথায় তেঁতুল, কোথায় আপনি, তবে তেঁতুল খাওয়ার ফল ফলিল কেন? যদি কেহ আপনার কাছে কুলের আচার, আমের আচারের কথা বারংবার গল্প করে, তবে আপনার মুখ সজল হইয়া আসে কেন? আপনি আচার না খাইলেও, আপনার মুখে আচার না থাকিলেও, নামের মধ্যে নামীর প্রতাপ কেমন করিয়া আসিল? তেঁতুল ও আচার আপনি কখনও আস্বাদ করিয়া থাকিবেন, তাই আজ তাহার স্মরণ, শ্রবণ,

দর্শন, বা নামোচ্চারণে আপনার অস্থিমজ্জার ভিতর হইতে মনের অভ্যন্তরতল ভেদ করিয়া পূর্ব্বসংস্কার জাগ্রত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিল; অমনি তৎক্ষণাৎ শক্তির সম্বেগে, স্নায়ুরাশির স্বভাবসূত্রে, কার্য্যকারণে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া ক্রিয়ার পর ক্রিয়া সাধিত হইতে লাগিল; তাই আপনার মুখে আজ জল আসিল। এই দৃষ্টান্তের দ্বারা বিরুদ্ধবাদি-দিগের মত খণ্ডবিখণ্ড করিতে পারি সত্য; কিন্তু মনের কথা, প্রকৃত কাজের কথা, বলা হইল কৈ? আপনি কখনও সিংহের গম্ভীর গর্জ্জন শ্রবণ করেন নাই, সুতরাং তৎসম্বন্ধীয় সংস্কারও আপনার নাই; কিন্তু অকস্মাৎ যদি গহন বনে বা গিরি-কন্দরে সেই ধ্বনি আপনার শ্রবণ-বিবরে প্রবেশ করে, তবে আপনি ভয়-বিহ্বল হইয়া—মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন কেন? সেই গর্জ্জনকারী সিংহকে মনে করিয়া কি? (না, আপনি ত কখনও সিংহ দেখেন নাই, সিংহের কথাও ত শ্রবণ করেন নাই।) অথবা শব্দের কোন অর্থ বুঝিয়া কি? (না, তাহাও ত নহে, কেন না তাহার কোন অর্থই নাই।) বস্তুতঃ, সিংহ-গর্জ্জনের স্বভাবগত শক্তির দ্বারাই আপনার শরীর ও মনের ধর্ম্ম, লক্ষণ, ও অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আপনি বুদ্ধির দ্বারা, বিদ্যার দ্বারা, এতাবৎ বুঝিতে পারুন, আর নাই পারুন; কিন্তু আপনার দেহ, মন প্রভৃতির তন্মাত্রগতির সহিত বাহ্য শব্দের প্রাকৃতিক গতির চির পরিচয় আছে। সেই-রূপ জানিবেন, 'হরি' এই সিদ্ধ শব্দটীর স্বভাবগত এইরূপ শক্তি আছে যে, উহা উচ্চারণ করিলেই শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত হয়, বিশুষ্ক তালু সরস হয়, তাপিত প্রাণে সুশীতল শান্তি-সলি-

লের ধারা বহিতে থাকে। কঠিন হইতেও কঠিনতর পাষাণ ভেদ করিয়া ঝর্ ঝর্ ধারায় সুধার নির্ঝরিণী খুলিয়া যায়। তাই সাধক নৃত্য করিতে করিতে গাহিয়াছেন—

"হরি নাম কি মধুর নাম !
নাম শুনে যে জুড়াল রে প্রাণ ॥
ও সে হরিনামের মোহন গুণে গ'লে যায় কঠিন পাষাণ।
আর বল্ব কি, সে নামের গুণে মরুভূমে ডাকে বান ॥"

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, ভক্তিপূর্ব্বক হরিনাম না করিলে কোনও ফল হয় না। আমরা এ সিদ্ধান্তকে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতে পারিলাম না। ভক্তি অতি দুরারাধ্য ও তপস্যাসাধ্য, তাহা হরিনামের সঙ্গে গোঁজামিলন দিতে হইবে কেন? যদি ভক্তিই আমার থাকিত, তবে আর ভাবনা কি? হরিনাম করিতে করিতে ভক্তির উদয় হইয়া থাকে; কেন না,—

"নাম্নাহি লভ্যতে ভক্তির্ভক্ত্যা প্রেমহি লভ্যতে।
প্রেম্না লভ্যতে গোবিন্দস্ততোনাম্নঃ পরং নহি ॥"

নাম করিতে করিতে শ্রদ্ধার উদয় হয়, শ্রদ্ধার পরিপাক হইলে ভগবদনুরাগের সঞ্চার হয়, এই অনুরাগের দ্বারাই গোবিন্দ-পদারবিন্দ-লাভ হইয়া থাকে; এই জন্য নামই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অতএব ভক্তি অভক্তির দিকে না তাকাইয়া জীব! হরিনাম করিতে থাকিবে, দেখিবে—

"নামের গুণে মরুভূমে ডাকে বান।"

হরি 'শব্দটী' ছোট খাট বলিয়া ইহার মহিমাকে ক্ষুদ্র বলিয়া মনে করিবেন না। ইহার প্রতাপে চতুরশীতি

যোনি-জনিত, চিরসঞ্চিত, পুঞ্জীকৃত, পাপতাপ-রাশি, অগ্নি-শিখা-স্পৃষ্ট তূলা-রাশির ন্যায়, ক্ষণার্দ্ধ মধ্যে ভস্মীভূত হইয়া যায়। রাত্রিকালে ঘরের মধ্যে নিবিড় অন্ধকার জমিলে, তাহা দূর করিবার জন্য যদি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্থূলাতিস্থূলকায় হস্তীযূথ নিযুক্ত করা যায়, তথাচ তাহার একাংশও দূরীভূত হয় না; কিন্তু একটী দীপ-শলাকা জ্বালিলেই দেখিতে পাইবে যে, তাহার সুদীপ্তি-প্রকাশে ঘরের অন্ধকার-স্তূপ কোথায় পলায়ন করিয়াছে। দীপ-শিখার আকার ক্ষুদ্র হইলেও তাহার প্রকাশ-শক্তি তীব্র, তেজস্বিনী; তাই তাহার প্রভাবে অন্ধকার-জাল ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। সেইরূপ জীবের জিহ্বায় হরি-নামরূপ দীপ-শিখার প্রকাশ হইলেই, পাপতাপ ও বিঘ্ন-বিপত্তিরূপ অন্ধকার আপনিই উড়িয়া যাইবে। হরি-নামের জ্বলন্ত অগ্নি-শিখায় পাপতাপ পুড়িয়া সব ছার-খার হইয়া যাইবে। পাপের বিশাল কায়া ও হরি-নামের ক্ষুদ্র অবয়ব দেখিয়া নামের পাপ-নাশিনী শক্তির প্রতি আমাদের সন্দেহ হইয়া থাকে। আমরা স্থূল-বুদ্ধি, তাই স্থূল উপায়ই ভালবাসি। স্থূল হইতেও সূক্ষ্মের যে অধিক শক্তি, তাহা স্থূলবুদ্ধি আমরা সর্ব্বদা বিচার করিয়া উঠিতে পারি না; তাই হরিনামের অপরিমেয় শক্তির প্রতি সহসা বিশ্বাস আমাদের হয় না। আয়ুর্ব্বেদীয় সূচিকাভরণ ও 'হোমিওপ্যাথিক গ্লোবিউল' (বটিকা) ক্ষুদ্র হইলেও তাহাতে যে মহারোগ-নিবারণের অমোঘ শক্তি আছে, তাহা আমরা সকল সময়ে বিশ্বাস

করিয়া উঠিতে পারি না। তাই 'এলোপ্যাথির' প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বোতল-ভরা ঔষধ তিক্ত হউক, বা অসুখ-সেব্য হউক, তাহাই আমরা 'গ্ল্যাসে গ্ল্যাসে' ঢক্ ঢক্ করিয়া খাইব ও ভাবিব, পীড়াও যেমন প্রকাণ্ড, ঔষধের বোতলও তেমনই প্রকাণ্ড, ঔষধের মাত্রাও তেমনি প্রকাণ্ড, বোতলের 'লেবেল'ও তেমনই প্রকাণ্ড, মূল্যটা আবার সকল অপেক্ষাও প্রকাণ্ড, ডাক্তার বাবুর ভিজিটও কম প্রকাণ্ড নহে। ইহার সকলই প্রকাণ্ড ও আড়ম্বর-যুক্ত ; তাই অনেকেরই ইহাঁর উপর বিশ্বাস ; তাই কবিরাজী মধু-মাখা বড়ি ছাড়িয়া আমরা ঐ ঔষধ গুলই গিলিতে ভালবাসি। জীব ! ভবরোগে জর্জ্জরিত আমরা, হরিনামের ক্ষুদ্র বটিকাই আমাদের পক্ষে সুখ-সেব্য ও উপযোগী। জ্ঞান, যোগ আদি 'এলোপ্যাথির' মত কৃচ্ছ্রসেব্য, তাহা উপকারী হইলেও যাহা সুখ-সাধ্য, সুখসেব্য, ও সুলভ, তাহা ছাড়িব কেন ?

মহোদয়গণ ! আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অর্থ বুঝি, আর না বুঝি, ভাবের মধ্যে প্রবেশ করি, আর নাই করি, শব্দের মধ্যে স্বভাবগত এমন সকল শক্তি আছে, যে তাহা স্বতঃ এবং মনের অজ্ঞাতসারে মনোমধ্যে ক্রিয়া করিয়া থাকে। মনকে মত্ত করিয়া, বিগলিত করিয়া, শব্দগত প্রকৃতির ছাঁচে মনকে ঢালিয়া, মনের প্রকৃতিকে সেই শব্দের প্রকৃতির অনুকূল করিয়া লয়। অর্থ-বিহীন শব্দেও এই স্বাভাবিক শক্তির পরিচয় আপনারাও অনেক সময়ে পাইয়াছেন। 'হাইল্যাণ্ডার' দলের মধ্যে

জাতীয় সঙ্গীত (National Anthem) গাইতে গাইতে যখন রণবাদ্য বাজিয়া উঠে, আপনি মহা 'দুর্ব্বল সিং' হউন না কেন, বাদ্যের গুণে, শব্দের গুণে, আপনার শিরায় শিরায় উষ্ণ রক্ত ছুটিতে থাকিবে, যুদ্ধার্থ চিত্ত উত্তেজিত হইবে। এই যুদ্ধোদ্যম রণবাদ্যের স্বভাবশক্তি-সাপেক্ষ। ভয়ঙ্কর বিষধর আপনাকে বেগে দংশন করিতে আসিতেছে, এমন সময় মোহন সুরে সাপুড়ের বাঁশি বাজিয়া উঠিল, সর্প স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল, তাহার হিংসার বেগ ক্ষণ জন্য বিনিবৃত্ত হইল। সভ্য মহোদয়গণ! বিষধর ত মিয়া তানসানের (তনুসেনের) প্রপৌত্র নহে যে, সে বংশীধ্বনির সুর, তাল, লয় বুঝিয়া বিমোহিত হইয়াছে। অর্থ বা ভাব সে বুঝিল না; কিন্তু শব্দের স্বভাবগত এমনই শক্তি যে, তাহাতেই সে বিমুগ্ধ ও আত্মহারা হইয়া গেল। সামান্য বংশী-রবে যদি মহাখল সর্পেরও হিংসাবৃত্তি উড়িতে পারে, তবে হরিনামের ভুবন-ভুলানো বংশী-ধ্বনি হইলে বিষয়ান্ধ জীবেরও দুষ্প্রবৃত্তি-রাশি বিদূরিত হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি! হরিনামের মধুর মোহিনী শক্তির গুণে পাষণ্ডকেও প্রেমে মাতাইয়া দেয়, পাষাণ হৃদয়কেও গলাইয়া দেয়, নির্জীব হৃদয়েও জীবনী শক্তির সঞ্চার করিয়া দেয়। 'হরি' এই কথাটী বাঁধা সুরে সুসিদ্ধ শব্দ! এই সুধামাখা নামটী কাঙ্গালের সর্ব্বস্বধন, অমূল্য নিধি, এবং আমাদিগের ন্যায় অন্ধতামসাচ্ছন্ন অন্ধগণের যষ্টি—একমাত্র অবলম্বন। সাধকগণ সিদ্ধ হইয়া যে নামের মহিমা বুঝিয়া হৃদয়ের সামগ্রী করিয়া রাখিয়াছেন, যোগী-

গণ বিজন বনে বসিয়া যে নামের গুপ্ত গুণধারা ধ্যান করিতে করিতে আত্মহারা হইয়া যাইতেন, যে নামের সুধা-পানে মাতোয়ারা হইয়া দেবর্ষি নারদ ত্রিলোকে ভ্রমণ করিতেন, যে নামের সুধা-সঙ্গীত-স্রোতে ত্রিতাপ-তপ্ত জীবগণের প্রাণ সুশীতল হইয়া যায়, সেই অমিয়-মাখা দীনের সখা হরিনাম আমাদিগের ন্যায় অন্ধের অবলম্বনের জন্য জগতে আসিয়াছে। জ্ঞানী! আমি তোমার কথা কিছু বলিতেছি না, তুমি জগদ্‌গুরু, তুমি উচ্চ আসনে বসিয়া থাক। 'যোগী! তুমি সিদ্ধি-সম্পন্ন, তুমি গুপ্তধনের অধিকারী, তুমি ঐশ্বর্য্যের 'সিংহাসনে উপবেশন কর। ভক্ত! তুমি দেবদুর্লভ জিনিষ পাইয়াছ, তুমি রত্ন-বেদীর মণিময় আসনে বিশ্রাম কর; তোমরা পথের সম্মুখে দাঁড়াইও না, পথ ছাড়িয়া দাও। ঐ যে ছিন্ন কন্থা সার করিয়া কাঙ্গালের বেশে দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিতেছে, ঐ যে দুনয়নে বারিধারা, মুখে হরিনাম ভরা, আপনার ভাবে আত্মহারা কে আসিতেছে, উহাকে অনাথবন্ধু, দীননাথের দরবারে আসিতে দাও। দীন-দয়ালের সদাব্রতে, অন্ধ-শালার অন্নসত্রে, প্রাণ ভরিয়া ক্ষীরান্ন খাইতে দাও, বাধা দিও না, বুদ্ধি-ভেদ করিও না, উহাকে মনের সাধে গাইতে দাও—

হরিবোল, হরি হরিবোল।

বুঝিলাম, ভগবানের সুমধুর নামই অন্ধের যষ্টি। এই কলের যষ্টি,—এই বিরাট্ ইন্দ্রজালীর জগৎ-ইন্দ্রজাল

ভাঙ্গিয়া দিবার মুনিমনোমোহন যষ্টির—মহিমা সেই ঐন্দ্রজালিক ব্যতীত আর কেহই বলিতে পারে না। যষ্টির গুণে বাঁকা পথ সোজা হইয়া আসে, অপথ কুপথ সুপথ হইয়া আসে, দূর নিকট হইয়া আসে, বিদেশ স্বদেশ হইয়া পড়ে। এই ঐন্দ্রজালিক যষ্টি ঘুমন্ত পথিককে জাগ্রত করে, দুর্ব্বল পথিককে সবল করিয়া দেয়, পথিক চলিতে না পারিলে তাহাকে চালাইয়া লয়, আর অন্ধ পথিকের সহস্র দিব্যচক্ষু ফুটাইয়া দেয়। যেমন গৃহ-পালিত সুশিক্ষিত ঘোড়ার উপর একটী শিশুকে বসাইয়া দিলে সে আপনা আপনিই, শিশু তাহাকে চালাইতে না জানিলেও, শিশুকে পৃষ্ঠাসনে লইয়া ধীরে ধীরে প্রভুর বাটীতে গিয়া পৌঁছে, সেইরূপ এই যষ্টিও অন্ধকে অলক্ষিত লক্ষ্য স্থানে উপস্থাপিত করে।

কঠোপনিষদে লিখিত আছে—

"এতদেবাক্ষর ব্রহ্ম এতদ্ধেবাক্ষরং পরং।
এতদেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥
এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরং।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥"

এই অক্ষরই (আদিনাম-বীজ) ব্রহ্ম, এই অক্ষরই শ্রেষ্ঠ, এই অক্ষরকে জানিয়া যে যাহা ইচ্ছা করে, তাহার তাহাই হয়। এই আলম্বনই শ্রেষ্ঠ, এই আলম্বনই প্রশস্ত, এই আলম্বনকে জানিতে পারিলে ব্রহ্মলোকে গতি ও ব্রহ্মরূপত্ব-লাভ হয়।

সাধুবুদ্ধি সভ্যমহোদয়গণ! বিহার ও পশ্চিমোত্তর

প্রদেশ প্রভৃতিতে আপনারা সুগভীর বড় বড় কূপ দেখিয়া থাকিবেন, সেই কূপ হইতে যখন শস্যক্ষেত্রে জল প্রবাহিত করিবার প্রয়োজন হয়, তখন ঐ কূপের তট হইতে ক্ষেত্র পর্য্যন্ত একটা পয়ঃপ্রণালী কাটা হইয়া থাকে। সেই প্রণালী দিয়া কূপোদ্ধৃত জলরাশি তর তর বেগে ক্ষেত্রাভি-মুখে ধাবিত হইতে থাকে। সেই জলরাশি ক্ষেত্রে পতিত হইয়া তথাকার শস্য-রাশির পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে সত্য; কিন্তু প্রণালী পথে বহিয়া যাইবার সময় প্রণালীর ধারে ধারে যে সকল তৃণ আদি থাকে, তাহাদেরও মূলে রস-সঞ্চার না করিয়া জলরাশি ক্ষেত্রে উপস্থিত হয় না। সেইরূপ মধু হইতেও সুমধুর রস-ভরা এই হরিনাম অন্ধ পথিককে বৃন্দারকবৃন্দ-বন্দিত হরি-পদার-বিন্দ-রূপ লক্ষ্য স্থানে লইয়া যাইবার সময় গন্তব্য পবিত্র পথের পার্শ্বে উৎপন্ন কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ আদি সাধনা-রূপ সুশোভিত তৃণ-রাশির পাদদেশে রস-সিঞ্চন করিতে উপেক্ষা করে না। যেমন পয়ঃপ্রণালী-প্রবাহিত জলের সাহায্যে নবীন নধর ভাবে তৃণগুলি প্রফুল্লিত হইয়া উঠে, সেইরূপ নাম-সাধনের শীতল জলের সংস্পর্শে জীবের হৃদয়ে নিষ্কাম ধর্ম্ম কর্ম্ম, বুদ্ধি জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি প্রভৃতি ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হইতে থাকে। সাধু মহাত্মাগণ যে সাধন-সিদ্ধির গুণে ত্রিলোকে সম্মানিত হইয়া থাকেন, তাহা সমস্তই নাম-সাধনে সুলভ হইয়া আইসে। নামের বল অতি প্রবল, নামের দ্বারাই বস্তু-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। বড় বড় লোকের নাম শুনিয়াই দীনদুঃখীগণ তাঁহার বাটীতে

গিয়া উপস্থিত হয়। নাম ধরিয়াই লোককে চিনিতে পারা যায়। মা জানকীর উদ্ধারকালে সাগর পার হইবার জন্য স্বয়ং রামচন্দ্রকে দুঃসাধ্য সাধন করিয়া সেতুবন্ধন করিতে হইয়াছিল; কিন্তু অনুরক্ত ভক্ত মহাবীর হনুমান্ সেতুর ভরসা না রাখিয়া মুখে, 'জয়রাম শ্রীরাম' বলিতে বলিতে, এই নামের গুণেই দুস্পার পারাবার পার হইয়াছিলেন। প্রভুর নাম প্রভু অপেক্ষাও প্রতাপী। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের তুলাদণ্ডে তুলসীপত্র-লিখিত কৃষ্ণের নামই কৃষ্ণ অপেক্ষা গুরুভার হইয়াছিল। নাম নামী অপেক্ষা অধিক ব্যাপক। বস্তুর নাম যতদূর ধাবিত হয়, বস্তু স্বয়ং ততদূর যাইতে সমর্থ নহে। এই দেহের তুচ্ছাতিতুচ্ছ নামটী লোক মুখে শুনিয়া ও সংবাদ-পত্রে পড়িয়া হয়ত অনেকেই এ দেহের পরিচয় জানেন; কিন্তু এই দীনাতিদীন ভগবদ্ভক্তজন-দাসকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কয় জন চেনেন? তাই বলি বস্তু হইতে বস্তুর নাম অধিক ব্যাপক। কাতর কণ্ঠে নাম ধরিয়া ডাকিতে পারিলে প্রভুর আসন টলিয়া যায়। নামের গুণেই গুহ্য গুহা-নিলয়-বাসীকেও বাহিরে টানিয়া আনে। নামের তেজেই ভগবান্ বৈকুণ্ঠপুরী ত্যাগ করিয়া মধ্যে মধ্যে ভক্ত-ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকেন। যাঁহার সহিত কখনও পরিচয় নাই, জানা শুনা নাই, কেবল নামের গুণগরিমার পরিচয় পাইয়াই সাধক ঊর্দ্ধশ্বাসে সেইদিকে দৌড়িয়াছেন। সংসারের আত্মীয় স্বজন, পুত্র কলত্র পরিত্যাগ করিয়া ঐ যে নামে নয়ননীরে ভাসিতে ভাসিতে, ঐ যে সাধক দিগ্‌বিদিক্ বুঝিতে না পারিয়া, চেনা নাই, শুনা নাই, দেখা নাই,

জানা নাই, মনের বেগে কোন্ দিকে ছুটিতেছে। সবদিকে যিনি আছেন, ভিতরে বাহিরে যিনি আছেন, তিনি কি ঐ শরণাগত, ঐ নামের অনুগত দুঃখীকে আশ্রয় দিবেন না? তাঁহাকে যে চায়, তিনিই তাঁহাকে পাইবার উপায় তাহাকে বলিয়া দেন। মায়াকুলিত অন্ধতামসাচ্ছন্ন এই সংসারে অন্ধ জীব আমাদের পক্ষে—মোহমদান্ধ আমাদের পক্ষে—অবিদ্যান্ধকারে দৃষ্টিহারা আমাদিগের পক্ষে নামের যষ্টিই—ভগবদ্দৃষ্টির একমাত্র উপায়। সাধকগণ! সুধীগণ! এই নামে ব্যয় নাই, পরিশ্রম নাই, সাধনে ক্লেশ নাই। দিন থাকিতে এই বেলা সাধের জিনিষ সাধন করিয়া লউন; ডাকিতে ডাকিতে প্রভু দীনের প্রতি দয়াদৃষ্টি করিবেন। কেমন করিয়া ডাকিলে তাঁহার উপযুক্ত ডাকা হয়, তাহা প্রভুর নাম করিতে করিতে তিনি আপনিই শিখাইয়া দিবেন। কি চাই, কি না চাই, নামের মহিমায় তাহার সমস্তই আপনিই ব্যবস্থা হইবে। একবার নাম-সুধারস-পানের পিয়ালা মুখে ধরিয়া প্রাণ ভরিয়া সকলে বলুন—

হরিবোল, হরি হরিবোল, হরি হরিবোল।

সাধুহৃদয় মহোদয়গণ! প্রাতঃস্মরণীয় সাধু বিল্বমঙ্গলের নাম আপনারা সকলেই শুনিয়া থাকিবেন। বিল্বমঙ্গল ব্রাহ্মণ কুলে জন্মিয়া পথহারা পথিকের ন্যায় বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কুপথগামী হইয়াছিল। চিন্তা নাম্নী বেশ্যার রূপ-লাবণ্যে মোহিত হইয়া কুল, মান, মর্য্যাদা

বিসর্জ্জন দিয়াছিল। চিন্তাই তাহার দিবারাত্রির চিন্তা হইয়া উঠিয়াছিল। চিন্তা বিল্বমঙ্গলের বাসভূমির নিকটে প্রবাহিত নদীর পরপারে বাস করিত। বিল্বমঙ্গলের পিতৃশ্রাদ্ধ উপস্থিত; সে সেদিন চিন্তার নিকট আসিতে পারিবে না, তাহা চিন্তাকে পূর্ব্ব দিন বলিয়া বিদায় লইয়া আসিয়াছিল। শ্রাদ্ধের সমস্ত আয়োজন, পুরোহিত মন্ত্র পড়িতেছেন, বিল্বমঙ্গল তাহাই প্রতিধ্বনি করিতেছে। কিয়ৎক্ষণ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে চিন্তার চিন্তা বিল্বমঙ্গলের হৃদয় বিলোড়িত করিয়া তুলিল। আর কোন কিছুই ভাল লাগে না; কোন ক্রমে শ্রাদ্ধ সমাপ্ত করিয়া তাড়াতাড়ি ব্রাহ্মণগণকে ও দীনদুঃখীকে ভোজন করাইয়া দিবাবসান হইতে না হইতে চিন্তাকুলিতপ্রাণ বিল্বমঙ্গল চিন্তার ভবনাভিমুখে দৌড়িল; কত লোকে বুঝাইল, শ্রাদ্ধ-বাসরে তথায় যাইতে নাই, কিন্তু একথা শুনে কে? চিন্তার চিন্তা বিল্বমঙ্গলের হৃদয় অধিকার করিয়াছে, এখন কি আর ধর্ম্ম, কর্ম্ম, ধ্যান, জ্ঞান বিল্বমঙ্গলের হৃদয়ে স্থান পায়? বিল্বমঙ্গল কাহারই কথা শুনিল না, কোন বাধাই মানিল না, মনের আবেগে দ্রুতবেগে নদীর পার-ঘাটের দিকে ছুটিল। নদী-তীরে বিল্বমঙ্গল উপস্থিত হইল; প্রবল বেগে ঝড় উঠিল; গগন-মণ্ডল ঘোর মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া গেল; বিদ্যুদ্-বিকাশে বজ্র-নির্ঘোষে শূন্য মণ্ডল আকুলিত হইল; প্রাণী মাত্রেই ত্রস্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিল; মুষল ধারায় বৃষ্টিতে আকাশ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল; তুফানে তরঙ্গে নদী বড় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। বিল্বমঙ্গল

এই ভয়ঙ্কর সময়েও তাহাকে পার করিয়া দিবার জন্য নাবিককে অনুরোধ করিল। অনুনয় বিনয় সহ বারংবার অনুরোধেও নাবিক স্বীকৃত হইল না। পারের বহুগুণ অতিরিক্ত মূল্য দিবার কথা বলিলেও নাবিক প্রাণ ভয়ে নৌকা ছাড়িল না; বলিল, তোমার জন্য কি প্রাণ দিব? বিল্বমঙ্গল নাবিকের নিকট নিরাশ হইয়া প্রাণ হইতেও অধিক চিন্তাকে দেখিবার জন্য আরও ব্যাকুল হইয়া উঠিল। অন্ধকারে কাছের মানুষ দেখা যায় না; নদীর তুফানে তৃণ দিলে দুই খানি হইয়া যায়; বিল্বমঙ্গল কোন দিকেই তাকাইতেছে না, কেবল ভাবিতেছে, প্রাণ যায় যাক্, প্রাণাধিকার নিকট যাইতেই হইবে। চিন্তাকুলিত-চিত্ত বিল্বমঙ্গল দিগ্বিদিক্জ্ঞান-শূন্য হইয়া আপনাকে ভুলিয়া গেল; চিন্তানল তাহার হৃদয়কে দগ্ধ করিতে লাগিল। বিল্বমঙ্গল অগ্রপশ্চাৎ ভাবিল না, সন্তরণে নদী পার হইবে ভাবিয়া নদীতে ঝাঁপ দিল; স্রোতের মুখে নিরবলম্বন বিল্বমঙ্গল হাবুডুবু খাইতে খাইতে একটা প্রবাহিত মৃত দেহকে কাঠ মনে করিয়া আশ্রয় করিল, এবং তাহাই অবলম্বনে সন্তরণ দিয়া, ভয় ভাবনা তুচ্ছ করিয়া, কোথায় কাপড়, কোথায় চাদর! দিগম্বর বিল্বমঙ্গল পর পারে গিয়া উঠিল। নদীর নিকটেই চিন্তার নিবাস; বিল্বমঙ্গল সে রাত্রিতে আসিবে না জানিয়া চিন্তা গৃহের দ্বারাবরোধ করিয়া নিদ্রিত হইয়াছিল। বিল্বমঙ্গল বাহির হইতে কত ডাক ডাকিল, ঝড় বৃষ্টির শব্দে তাহার কোন শব্দই নিদ্রিতা চিন্তার কর্ণে প্রবেশ করিল না। বিল্বমঙ্গল

নিরুপায় হইয়া এদিক্ ওদিক্ দেখিতে দেখিতে দেখিল, গৃহের প্রাচীরে একগাছি রজ্জুর ন্যায় কি ঝুলিতেছে। বিল্বমঙ্গল রজ্জু-বোধে তাহাই ধরিয়া প্রাচীর লঙ্ঘনপূর্ব্বক গৃহে প্রবেশ করিল; চিন্তাকে বারংবার ডাকিল; চিন্তা চকিত ও চমকিত হইয়া বিল্বমঙ্গলকে দ্বার খুলিয়া দিল। উলঙ্গ বিল্বমঙ্গলকে দেখিয়া চিন্তা জিজ্ঞাসা করিল, তুমি এই ভয়ঙ্কর সময়ে নদী পার হইলে কিরূপে? গৃহের দ্বার ত খোলা ছিল না, তুমি ভিতরে আসিলেই বা কিরূপে? বিল্বমঙ্গল প্রাচীরে রজ্জু, ও নদীতে কাষ্ঠ-ফলকের কথা বলিলেন; কিন্তু বিল্বমঙ্গলের গাত্রের দুর্গন্ধে চিন্তার সন্দেহ জন্মিল। একটু বৃষ্টি থামিলে চমৎকৃতচিত্তে চিন্তা বিল্ব-মঙ্গলের সহিত বাহিরে গিয়া দেখে, প্রাচীরে রজ্জু নহে, একটী গর্ত্তে মুখ দিয়া একটী কালসর্প ঝুলিতেছে; নদীতে কাষ্ঠ-ফলক নহে, একটা মৃতদেহ। চিন্তা অবাক্ হইল, গাত্র সিহরিয়া উঠিল; বিল্বমঙ্গলও চিন্তাকে পাইয়া সচে-তন হইয়াছিলেন, তিনিও স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। সেই কালরাত্রিতে চিন্তা বিল্বমঙ্গলকে আদর না করিয়া অতিশয় তিরস্কার করিল; বলিল, তুমি ব্রাহ্মণকুমার হইয়া একে ত বেশ্যাতে আসক্ত, তাহাতে যে অসম সাহসিক কার্য্য করিয়াছ, তাহাতে নিশ্চয়ই প্রাণ হারাইতে, ভগবানের কৃপায় বাঁচিয়া গিয়াছ; আমাকে তুমি যেরূপ ভালবাসিয়াছ, এই ভাল-বাসা যদি তোমার ভগবানের দিকে হইত, তাহা হইলে আজ তুমি শব-সাধক সিদ্ধপুরুষের ন্যায় ভগবানের চরণলাভ করিতে পারিতে; তোমাকে ধিক্! যে একটা সামান্যা

স্ত্রীলোকের জন্য তুমি পবিত্র ব্রাহ্মণের দেহ হারাইতে বসিয়াছিলে। কি জানি, কি লগ্নে চিন্তার তীব্র তিরস্কার বিল্বমঙ্গলের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল; তাঁহার হৃদয়-তন্ত্রীতে নূতন সুর বাজিয়া উঠিল। বিল্বমঙ্গল আর কোন কথা কহিলেন না; কি জানি, কি ভাবিতে লাগিলেন। জীবনের কত কথাই মনে পড়িতে লাগিল, বিবেকের জ্বলন্ত অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। নীরবে বসিয়া বিল্বমঙ্গল গুমুরে গুমুরে কাঁদিতে লাগিলেন। রাত্রি প্রভাত হইল—বিল্বমঙ্গলের চিরদিনের কালরাত্রি প্রভাত হইল। তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, আর এ পথে ফিরিব না, আর এ চিন্তা চিন্তা করিব না; জীবনের ত জলাঞ্জলি হইয়াইছিল; যাঁহার দয়ায় এই জীবন রক্ষিত হইয়াছে, আজ হইতে সেই জগচ্চিন্তামণির সুচারুচরণ-চিন্তায় জীবন অতিবাহিত করিব। চিন্তাকে কিছু বলিলেন না, মনে মনে চিন্তাকে গুরু বলিয়া প্রণাম করিলেন; আর যে দিকে চক্ষু যাইল, সেই দিকে ধাবিত হইলেন। পথহারা পথিক বিল্বমঙ্গল কোথায় যান, কি করেন, কোথায় খান, কোথায় শোন, কিছুরই ঠিকানা নাই; মাতৃহারা শিশুর মত, কেবল চিন্তামণির চিন্তা করিতে করিতে, ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। মনে প্রেমের উচ্ছ্বাস উঠিয়াছে, প্রেমময়কে দেখিবার জন্য বিল্বমঙ্গল পাগল হইয়াছেন; কিন্তু পূর্ব্বসংস্কার এখনও ত যায় নাই। এক দিন পথিমধ্যে একটী রূপলাবণ্যবতী যুবতীকে দর্শন করিলেন; তাঁহার অপরূপ রূপের ছটায় বিল্বমঙ্গলের চিত্ত আবার বিমোহিত হইল, যুবতীর পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন। যুবতী একজন ধনবান্ বণিকের পত্নী, স্নান

করিয়া আসিতেছিলেন, গৃহে প্রবেশ করিলেন। বিল্বমঙ্গল মণিহারা ফণীর মত উদাসচিত্তে দ্বারে বসিয়া পড়িলেন। বণিক গৃহদ্বারে একজন উদাস-চিত্ত অভ্যাগত ব্রাহ্মণকে দেখিয়া, তাঁহার আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আজ বিল্বমঙ্গল অকপটচিত্তে বলিলেন, তোমার সুন্দরী যুবতী ভার্য্যাকে একবার আমি প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইব, এই বড় সাধ হইয়াছে; তুমি তাঁহাকে সম্মুখে আনিয়া দাও। অতিথি-বৎসল বণিক ব্রাহ্মণের কথায় স্বীকার পাইয়া অন্তঃপুর হইতে রূপবতী ভার্য্যাকে আনিতে গেলেন, এই অবকাশে বিল্ব-মঙ্গলের অন্তর্জ্জগতে আর এক মহাপ্রলয় উপস্থিত হইল। দীনদয়াময় কাঙ্গালের হৃদয়সর্ব্বস্ব ভগবান্ অজ্ঞানান্ধ বিল্ব-মঙ্গলের দিব্যচক্ষু খুলিয়া দিলেন; অমনি বিল্বমঙ্গল দৌড়িয়া গিয়া, কি ভাবিতে ভাবিতে, দুইটী বেলের কাঁটা আনিলেন; বণিকের রূপবতী যুবতী পত্নী সম্মুখে আসিলেন; বিল্বমঙ্গল একবার প্রাণের পিপাসা চিরদিনের জন্য নিবারণ করিবার নিমিত্ত যুবতীর পদ-নখ হইতে কেশ পর্য্যন্ত অতুল রূপ-রাশি দর্শন করিয়া লইলেন, আর নিজের চক্ষুদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, চক্ষু! তোমরাই আমার কাল হইয়াছ, তোমরাই আমাকে মজাইয়াছ, তোমরাই আমাকে চিন্তার চিন্তায় জর্জ্জরিত করিয়াছিলে, তোমরাই আবার এই রূপসীর সৌন্দর্য্যে আমাকে বিমোহিত করিয়া সেই পরম সুন্দর জগন্মনোমোহন রূপ দেখিবার বাধা জন্মাইতেছ, দেখিবার জিনিষ না দেখিয়া বৃথা কি দেখিয়া বিমোহিত হইতেছ? বুঝিলাম, তোমরাই আমার সুপথের কণ্টক হইয়াছ, আর

কত কি দেখিবে, দেখার সাধ জন্মের মত মিটাইয়া লও, এই বলিয়া হস্তস্থ বেলের কাঁটা দুটীর দ্বারা নিজের দুই চক্ষু বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। কণ্টকাঘাতে অজস্র রুধির-ধারা এবং ভগবানের অদর্শন জন্য পরিতাপের অজস্র অশ্রুধারা, গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমের ন্যায়, বিল্বমঙ্গলের গণ্ড বহিয়া বক্ষঃ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। বণিক ও বণিক-পত্নী অবাক্ হইয়া কাতরে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অন্ধ বিল্বমঙ্গল কাঁদিতে কাঁদিতে, মধ্যে মধ্যে হরি হরি-ধ্বনির হুঙ্কার করিতে করিতে, চারিদিকে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অন্ধ অনাথ বিল্ব-মঙ্গলকে আজ যত্ন করে, এমন কোন লোক নাই। তিনি পথে পথে, গ্রামে গ্রামে, বনে বনে ঘুরিয়া বেড়ান; তাঁহার তত্ত্ব লয়, এমন একটী লোক নাই। লোকে তাঁহার দিকে তাকাইল না সত্য; কিন্তু তিনি যাঁহার জন্য ঘর বাড়ী ছাড়িয়াছেন, যাঁহার জন্য চারিদিকে ছুটিয়া বেড়াইতেছেন, যাঁহার জন্য তাঁহার নয়নে ধারা বহিতেছে, যাঁহার জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া আকুল হইয়াছে, যাঁহার জন্য আজ তিনি সাধ করিয়া অন্ধ হইয়াছেন, সেই দয়ার ঠাকুর অলক্ষিত স্থানে থাকিয়াও তাঁহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছেন। অন্ধ বিল্বমঙ্গল ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত শরীরে একদিন বিজন তরুতলে বসিয়া ক্ষুধায় কাতর, পিপাসায় আকুল হইয়া অনাথের নাথ জগচ্চিন্তামণির স্মরণ করিতেছেন, আর বলিতেছেন, প্রভো! একবার অন্ধকে দেখা দাও। দীনদয়াময় আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। বৈষ্ণবী মায়ায় বিল্বমঙ্গলকে অভিভূত করিয়া একটী বালকবেশে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন; বলি-

লেন, হে অন্ধ! তুমি বড় ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়াছ দেখিতেছি; এই লও মিষ্টান্ন, এই লও শীতল জল; খাইয়া শরীর শীতল কর। কাতর বিল্বমঙ্গল হাত পাতিয়া তাহা লইলেন; খাইয়া তাঁহার প্রাণ জুড়াইল; আহ্লাদিত হইয়া বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, বালক! তোমার বাড়ী কোথায়, তোমার নাম কি, তুমি কি করিয়া থাক? বালক বলিল, আমার বাড়ী অতি নিকটে; আমার নাম কোন একটা নিরূপিত নাই, যে যাহা বলিয়া ডাকে আমি তাহাতেই উত্তর দিই; আমি গোপ-বালক, গোরু চরাইতে রোজ এই বনে আসি; যে আমাকে ভালবাসে, আমি তাহাকে বড় ভালবাসি। বৈষ্ণবী মায়ায় বিমুগ্ধ বিল্বমঙ্গল এই বৃন্দারণ্য-বিহারী গোপ-বালককে চিনিতে পারিলেন না; বলিলেন, বালক! আবার তুমি কবে আসিবে? বালক বলিল, তুমি এই খানেই থাক, আমি তোমাকে রোজ খাইবার সামগ্রী আনিয়া দিব।

"তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।" গীতা।

বিল্বমঙ্গল সেই ভুবনমোহন বালকের সুমধুর কথা শুনিয়া মনে তাহাকে বড় ভালবাসিলেন, আর বলিলেন, বালক! তুমি প্রত্যহ আমার কাছে আসিও। সেই বালক বিল্বমঙ্গলের অন্তরে সর্ব্বদাই নৃত্য করিতে লাগিল; আবার মাঝে মাঝে মূর্ত্তিমান্ হইয়া, বিল্বমঙ্গলের নিকটে আসিয়া, কাছে বসিয়া, নানা মধুর আলাপ করিত ও প্রত্যহ খাইবার সামগ্রী দিত। বিল্বমঙ্গল কয়েক দিনের মধ্যে মধুর ভাবে মোহিত হইয়া বালকগতপ্রাণ হইয়া উঠিলেন।

বালক না আসিলে, বালক কাছে না বসিলে, বালকের কথা না শুনিলে বিল্বমঙ্গলের প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিত। বিচারবান্ বিল্বমঙ্গল একদিন মনে মনে ভাবিলেন, এ আবার কি হইল? সকলের মায়া কাটাইয়া অন্ধ হইয়া তরুতলে বসিলাম, আবার কেন এই রাখাল বালকের মায়ায় মোহিত হইলাম। সাধুহৃদয় শ্রোতৃমহোদয়গণ! সকল দিকের সকল ভালবাসা কুড়াইয়া যাঁহাকে ভালবাসিতে হয়, আজ বিল্বমঙ্গল যে তাঁহাকেই ভালবাসিয়াছেন, এই ভালবাসার জন্যই যে বিবেকী বিচারবান্ পুরুষগণ বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহা বিল্বমঙ্গল এখনও বুঝিতে পারেন নাই। বিল্বমঙ্গল এখনও জানেন না যে, এই বালককে ভালবাসিবার জন্যই তিনি সংসারের সমস্ত ভালবাসা ছাড়িয়াছেন। রাখাল বালক পরদিন বিল্বমঙ্গলের নিকটে আসিলে বিল্বমঙ্গল বালকের হাত ধরিয়া আদর করিতে গেলেন, বালক হাত ছাড়াইয়া হাসিতে হাসিতে দূরে গিয়া বসিল। এ বালক ধরা দিয়াও ধরা দিল না। 'পরিব্রাজকের সঙ্গীতে' উক্ত হইয়াছে—

> "সে যে অধর মানুষ দেয় না ধরা, ধরিতে মন হার মেনেছে।
> তারে ধরে ধরে ধর্‌তে নারে, মন আমার পাগল হ'য়েছে॥"

বালক হাত ছাড়াইয়া গেল; বিল্বমঙ্গলের মন পাগল হইয়া উঠিল; ঐ বালক ভিন্ন বিল্বমঙ্গলের আর কিছুই ভাল লাগে না। রাখাল বালক যখন দেখিল, বিল্বমঙ্গলের প্রেমের মাত্রা উছলিয়া উঠিয়াছে; তখন বালক বলিল, বিল্বমঙ্গল! তুমি বৃন্দাবনে যাইবে? শুনিয়া বিল্বমঙ্গলের হৃদয় কাঁদিয়া

উঠিল ; বলিলেন, বালক ! অন্ধ আমি, সে পবিত্র ধামে কিরূপে যাইব, কে আমাকে লইয়া যাইবে ? বালক হাসিয়া বলিল বিল্বমঙ্গল ! আমি তোমাকে লইয়া যাইব, ভাবনা কি ? বিল্বমঙ্গল বলিলেন, বালক ! তুমি কি সে স্থান চেন ? সেই সুদূর স্থানে কেমন করিয়া লইয়া যাইবে ? বালক আবার হাসিয়া বলিল, আমি ত সেখানে অনেক দিন ছিলাম, আমার বাপ মা সেখানে ছিলেন, আমি সেখানেও গোরু চরাইতাম। বিল্বমঙ্গল বলিলেন, তবে আমাকে কবে লইয়া যাইবে ? বালক বলিল এখনই চল। আপনার হস্তের যষ্টি গাছটীর অগ্রভাব বিল্বমঙ্গলের হস্তে দিয়া বলিল, এই ধর, এই যষ্টি ধরিয়া আমি তোমাকে বৃন্দাবন লইয়া যাইতেছি। মুহূর্ত্ত অতীত হইতে না হইতে বালক বলিল, বিল্বমঙ্গল ! এই ত বৃন্দাবনে আসিয়াছ, এই ত যমুনাতটে দাঁড়াইয়াছ। অন্ধ বিল্বমঙ্গল কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, কিছুই দেখিতে পাইলেন না, কাতরে প্রেমের স্বরে গাহিতে লাগিলেন—

যমুনে ! এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিণী।
ও তোর বিমল তটে, রূপের হাটে, বিকাতো নীলকান্তমণি ॥
কোথা সে ব্রজের শোভা, গোলক হ'তেও মনোলোভা,
কোথা শ্রীদাম, বলরাম, সুবোল, সুদাম ;—
কোথা সে সুনীলতনুর ধেনু, বেণু, মা যশোদা রোহিণী ॥
কোথা নন্দ উপানন্দ, মা যশোদার প্রাণ গোবিন্দ,
ধড়া-চূড়া-পরা কোথা ননী-চোরা ;—
কোথা সে বসন-চুরি, ব্রজ নারীর পূজিতা মা কাত্যায়নী ॥

কোথা চারু চন্দ্রাবলী, কোথা বা সে জলকেলী,
কোথা ললিতা সখী, সুহাসিনী ;—
কোথা সে বংশীধারী, রাসবিহারী, বামেতে রাই বিনোদিনী ॥
কোথা সে নূপুর-ধ্বনি, না বাজে কিঙ্কিনী,
মধুর হাঁসি, মধুর বাঁশি, নাহি শুনি ;—
ও যার মোহন সুরে উজান ভরে বইতে তুমি আপনি ॥
তোমারি তটে তটে, তোমারি ঘাটে ঘাটে,
তোমারি সন্নিকটে কই সে ধনী ;—
ও যার মানের লাগি মোহন চূড়া লুটাইল ধরণী।
দেখাইয়া দাও আমারে, যমুনে ! সেই বামারে,
অনাথের নাথ হৃদ্ মাঝারে, পা দুখানি ;—
(পরিব্রাজক বলে) চরণতলে লুটাই শির দিনযামিনী ॥

রাখাল বালক অন্ধ ভক্তকে কাতর দেখিয়া নিজ কর-কমল তাঁহার চক্ষুদ্বয়ে বুলাইয়া দিলেন, দিব্যচক্ষু অমনি প্রস্ফুটিত হইল। অন্ধ চক্ষুষ্মান্ হইলেন; দেখিলেন, ঐ রাখাল বালকই ব্রজ-বিপিন-বিহারী বংশীধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। সমস্ত গোলক-লীলা তাঁহার সম্মুখে সমুদ্ভাসিত হইল; আনন্দে গদ্গদচিত্ত বিল্বমঙ্গল প্রভুর চরণে প্রণত হইয়া নয়ন-জলে ভাসিতে লাগিলেন, কিছুই বলিতে পারিলেন না; কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। প্রভু বিল্বমঙ্গলকে বৃন্দাবনের পথে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া বলিলেন, দেখ বিল্বমঙ্গল! তুমি আমার অনুগত ভক্ত, তোমারই সঙ্গগুণে চিন্তা, বণিক, ও বণিক-পত্নী ভক্তি-গদ্গদ হৃদয়ে বৃন্দাবন-বাসে আসিয়াছে; ঐ দেখ ইহারাও আমাকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়া গেল।

আমরা অন্ধ বলিয়া কেহ নিরাশ হইবেন না। যিনি হরিনাম-রসামৃত-পানে অন্ধ বিল্বমঙ্গলের হস্তের যষ্টি ধরিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে বৃন্দাবনে লইয়া গিয়া নিজ নিত্য গোলক-ধামের অপরূপ লীলা দেখাইয়া ছিলেন, জীব! বিল্ব-মঙ্গলের ন্যায় তোমাকেও অন্ধ দেখিয়া,—তোমাকে অনাথ ও নিরাশ্রয় দেখিয়া—তিনিই ত কৃপা করিয়া নামের যষ্টি তোমার হস্তে দান করিয়াছেন। তুমি দেখিতে পাও আর নাই পাও, ঐ যষ্টি ধরিয়া থাক, তুমিও বিল্বমঙ্গলের ন্যায় নিত্য ধামে উপস্থিত হইবে। হরি বলিতে আলস্য করিও না; কাঙ্গালের সর্ব্বস্ব-নিধি হরিনাম প্রাণের স্বরে গাহিতে থাক; দীনের বন্ধু পতিত-পাবন দেখা দিবেন, জীবনের সাধ মিটাই-বেন। নামই **"অন্ধের যষ্টি"**। ইহা পরিত্যাগ করিও না, প্রাণ ভরিয়া বল **'হরিবোল'**, সাধ মিটাইয়া বল **'হরিবোল'**, বদন ভরিয়া বল **'হরিবোল'**, দুটী বাহু তুলিয়া বল **'হরিবোল'**, আনন্দে মাতিয়া বল **'হরি-বোল'**, ভক্তের চরণে লুটাইয়া বল **'হরিবোল'**, সকলে মিলিয়া একত্রে বল **'হরিবোল'**, বল **'হরি হরি-বোল'**, **'হরি হরি হরিবোল'**, **'হরিবোল'**।

ওঁ হরিঃ ওঁ।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
৩৪	১৪	বুদ্ধি	বুদ্ধি
৩৯	১৪	বষণ	বর্ষণ
৫৩	২৪	সমাচারজি জ্ঞাসা	সমাচার জিজ্ঞাসা
৫৪	১৯	বুদ্ধিমান	বুদ্ধিমান্
৯৫	৮	পঞ্চম.বর্ষীয়	পঞ্চম-বর্ষীয়া
৯৮	২২	ধর্ম্মাস্ত্রেতায়ং	ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং
১০২	১৭	খুজিয়া	খুঁজিয়া
১০৫	৫	মুবারে	মুরারে
১[illegible]	২৪	প্রবহমান	প্রবাহমান্
১৪২	৩	ইইলে	হইলে
২৬২	১৬	সচ্ছন্দ	স্বচ্ছন্দ
১৮৪	৪	পদাথ	পদার্থ
২০৭	২৪	সংস্পষ্টো	সংস্পৃষ্টো
২১৬	২৪	বিরাট্	বিরাট